

রাজ্য না হইয়াও রাজকায়ায় চলেন, যেমন অনেকে কালা বাঙ্গালি হইয়াও সাহেব সাজিবার সাধে কোট পেটেলুন আঁটেন, আমরাও তেমন ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা হইয়াও, দোর্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ শালী সম্বাদ পত্রের অধিকার গ্রহণ করিব ইচ্ছা করিয়াছি।

কিন্তু মনুষ্যজাতির এমনই দুরদৃষ্ট, যে যে যখন যে সাধ করে, তাহাব সেই সাধে তখন বিয় ঘটে। নূতন বৎসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা লিখিতেছি অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন! সর্বনাশ, এ যে রাম না হইতে রামায়ণ! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে বঙ্গদর্শন রচনাসম্বন্ধে কোন নিয়মই মানে না—অত্যন্ত স্বৈচ্ছাচারী। অতএব আমরা, মনের সাধ মনে না মিটাইয়া, সে সাধে বিবাদ ইত্যাদি অনুপ্রাসের লোভ সম্বরণ করিয়া, অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ শালের সমালোচন করিব। অতএব হে গতবর্ষ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচন করিব।

গতবৎসরে রাজকার্য্য কিরূপে নির্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, যে এই বৎসরে তিনশত পয়ষষ্টি দিবস ছিল, একদিনও কম হয় নাই। প্রতিদিবসে ২৪টি করিয়া ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল। কোনটির আমরা একটিও কম পাই নাই। রাজপুরুষগণ ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন

নাই। ইহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে। অনেকে বলেন যে এ বৎসরে গোটাকত দিন কমাইয়া দিলে ভাল হইত; আমরা এ কথা অস্বীকার করি না; দিন কমাইলে কেবল চাকুরিয়াদিগের বেতন লাভ, এবং সম্বাদপত্রলেখকদিগের শ্রমলাভ; সাধারণের কোন লাভ নাই; (আমরা মাসিক, ১২ মাসে বারখানি কেহ ছাড়িবে না।) তবে, গ্রীষ্মকালটি একেবারে উঠাইয়া দিলে, ভাল হয় বটে। আমরা কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বার মাসই শীতকাল থাকে এমন একটি আইন প্রচারের চেষ্টা দেখুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এবৎসর সকলেরই এক এক বৎসর পরমাণু চুরি গিয়াছে। কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমাদের ৭১ বৎসর বয়স ছিল, এ বৎসর ৭২ হইয়াছে। যদি পরমাণু চুরি গেল, তবে একবৎসর বাড়িল কি প্রকারে? নিশ্চয় সম্প্রদায়ই এমন অযথার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে।

এবৎসর যে সুবৎসর ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই, যে এ বৎসর অনেকেরই সম্ভান অগ্নিয়াছে। টিফিমেটেল ডিপার্টমেন্টের সূদক্ষ কর্মচারিগণ বিশেষ তদন্তে জানিয়াছেন, যে কাহারও ২ পুত্র হইয়াছে, কাহারও কন্যা হইয়াছে, এবং কাহার গর্ভপ্রাব হইয়া গিয়াছে। দুঃখের

বিষয় এই যে এবৎসর কতক গুলি মনুষ্য, অধিক নহে, রোগাদিতে মরিয়াছে। গুলিয়াছি যে এদেশীয় কোন মহাসভা পার্লামেন্টে আবেদন করিবেন, যে এই পুণ্যভূমি ভারতরাজ্যে, মনুষ্য না মরিতে পায়। তাঁহারা এই রূপ প্রস্তাব করেন, যে যদি কাহারও নিতান্ত মরা আবশ্যক হয়, তবে সে পুলিশে জানাইয়া অনুমতি লইয়া মরিবে।

এ বৎসরে ফাইন্যান্সিয়াল ডিপার্ট-মেন্টের কাণ্ড অতি বিচিত্র—আমরা শ্রুত হইয়াছি যে গবর্ণমেন্টের আয়ও হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে। ইহা বিস্ময়-কর হউক বা না হউক, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে ইহাতে গবর্ণমেন্টের টাকা, হয় কিছু উন্নত হইয়াছে, নয় কিছু অকুলান হইয়াছে, নয় ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। আগামী বৎসর (৭৬ শালে) টেক্স বসিবে কি না, তাহা এক্ষণে বলা যায় না, কিন্তু ভরসা করি ৭৭ শালের এপ্রিল মাসে আমরা একথা নিশ্চিত বলিতে পারিব।

এ বার বিচারালয় সকলের কার্যের আমরা বিশেষ স্মৃতি করিতে পারি-লাম না। সত্য বটে যে, যে নালিশ করি-য়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে, বা হইবে এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা না-লিশ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন বিচার হয় নাই। আমরা ইহা বৃদ্ধিতে পারি না; যেখানে সাধারণ বিচারালয়, সেখানে, নালিশ করুক বা না করুক, বিচার চাই। কেহ রোজ চাহুক, বা

না চাহুক সূর্য্যদেব সর্বত্র রোজ করিয়া থাকেন, কেহ বৃষ্টি চাহুক বা না চাহুক, মেঘ ক্ষেত্রে বৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং কেহ বিচার চাহুক বা না চাহুক, বিচারকের উচিত গৃহে ঢুকিয়া বিচার করিয়া আসেন। যদি কেহ বলেন, যে বিচারকগণ একরূপ বিচারার্থ গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে গৃহস্থগণের সম্মার্জনী সকল অকস্মৎ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য, যে গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ সম্মার্জনীকে তাদৃশ ভয় করেন না—সম্মার্জনীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হাকিম দিগের বিলক্ষণ পরিচয় আছে, এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হইয়া থাকে। যেমন ময়ূর সর্প-প্রিয় ইহারাও তেমনি সম্মার্জনী-প্রিয়—দেখিলেই প্রায় ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা এমনও গুলিয়াছি যে গবর্ণমেন্টের কোন অধস্তন কর্মচারী প্রস্তাব করিয়া-ছেন, যে যেমন উচ্চশ্রেণীর কর্মচারি-গণের পুরস্কারের জন্য “অর্ডার অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া” সংস্থাপিত করা হইয়াছে, সেইরূপ নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারিগণের জন্য “অর্ডার অব দি ক্রমস্টিক্” সংস্থাপিত করা হউক। এবং বিশেষ গুণবান্ ডিপুটি এবং সবজজপ্রভৃতিকে বাছিয়া লাকলাইনের দড়িতে এই মহারতটিকে বাধিয়া তাঁহাদিগের গলদেশে লম্বমান করিয়া দেওয়া হউক। তাঁহাদের চাপকান চেন চাদর বিভূষিত সদা কম্পবান্ বক্ষে ইহা অপূর্ণ শোভা ধারণ করিবে। রাজপ্রসাদ

স্বরূপ প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদরে গৃহীত হইবে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমাদের কেবল আশঙ্কা এই যে এত উমেদওয়ার ঘূটিবে যে ষাঁটাব সঙ্কলান করা ভাব হইবে।

গতবৎসর স্মৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সর্বত্র সমান হয় নাই। ইহা মেঘদিগের পক্ষপাত বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোকে গবর্ণমেন্টে এই মর্শ্ব আবেদন করিয়া ছেন, যে ভবিষ্যতে বাহাতে সর্বত্র সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভূত হউক। আমরাদিগের বিবেচনায় ইহাব সূচ্যায় নিরূপণ জন্য একটি কমিটি সংস্থাপিত করা উচিত। কোনও মান্য সহযোগী বলেন, যে যদি সরকার হইতে মেঘদিগের বাববরদারি বরাদ্দ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু আমরাদিগের বিবেচনায় ইহাতেও সুরিধা হইবেনা—কেননা বঙ্গদেশের মেঘ সকল অত্যন্ত সৌদামিনীপ্রিয়—সৌদামিনী গণকে ছাড়িয়া টাকাব লোভেও দেশ-দেশান্তরে যাউতে স্বীকার করিবে না। আমরা প্রস্তাব কবি যে মেঘ সকল এবালিশ কবিতা দিয়া, ভিত্তী বন্দোবস্ত কবা হউক। ক্ষেত্রে এক একজন চাপবাশী বা সুরোগ্য ডিপুটি এক একজন ভিত্তীকে দীর্ঘ বংশ খণ্ডে বাধিয়া উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া তুলিয়া ধরিলেক, ভিত্তী তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া পারে ত নামিয়া আসিবে। ভাল হয় না?

আমাদের দেশের কামিনীগণ যে দেশ হিতৈষিনী নন—নহিলে ভিত্তীর প্রয়োজন হইত না। তাহাবা যদি প্রাত্যহিক সাংসারিক কালাটা মাঠেগিয়া কাঁদিয়া আসেন, তাহা হইলে অনারাসেই কৃষি-

কার্যের সুরিধা হয়, ও মেঘ ডিপার্টমেন্ট এবালিশ করা যাইতে পারে। তবে আমরা লোকের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলার্থ বলি, যে আকাশবৃষ্টির পরিবর্তে নারীনয়নাক্ষর আদেশ করিতে গেলে, একটু পাকা রকম পুলিশের বন্দবস্ত করা চাই। মেঘের বিদ্ভূতে অধিক প্রাণী নাশ হয় না, কিন্তু রমণীনয়ন-মেঘের কটাক্ষ বিদ্ভূতে, মাঠের মাঙ্গুখানে, চাষা ভূষোর ছেলেদের কি হয় বলা যায় না—পুলিশ থাকা ভাল।

শুনিলাম শিক্ষাবিভাগে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক একটা কানমাপা কাটি প্রস্তুত করিয়াছে। তাহা দেব মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—তাহারা বলে, অধ্যাপকদিগের শ্রব-নেন্দ্রিয়গুলি মাপিয়া দেখিব—নহিলে তাহাদিগের নিকট পড়িব না। আমরা ভবসা করি মাপা কাটি ছোট পড়িবে, এমত সম্ভাবনা কোথাও নাই।

যাহা হউক, হুবৎসর হউক, সূবৎসর হউক, তিনটি নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা স্থির জানিতে পারিতেছি—তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

প্রথম, বৎসরটি চলিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মতান্তর নাই।

দ্বিতীয়, বৎসব গিয়াছে, আর ফিরিবে না। ফিরাইবার জন্য কেহ কোন উদ্যোগ পাঠবেন না। নিষ্ফল হইবে।

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক! আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না, আপনার ও আমার, পঁচাত্তরেও বাস জল, ছিয়াত্তরেও বাস জল। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি বাস জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

—০০০—

চীন, ভারতবর্ষ, কাল্‌ডীয়া, মিসর এবং গ্রীস দেশে খ্রীষ্টাব্দের বহুকাল পূর্বে হইতেই জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনার সূত্রপাত হয়। চীনেরা এই শাস্ত্র রাজনীতি এবং হিন্দু কাল্‌ডীয় ও মিসর জ্যোতিষ ধর্মনীতির ন্যায় অপরিবর্তন সহ বিবেচনা করিতেন। কিন্তু গ্রীসে রাজনীতি, ধর্মনীতি অথবা ফলিত জ্যোতিষের সহিত সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের কোনরূপ সংশ্লিষ্ট না থাকায় উক্ত দেশে জ্যোতির্বিদ্যার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। হিপার্কাস্ এবং টলেমি কর্তৃক যে জ্যোতির্বিদ্যার অমূল্য শীলন আরম্ভ হয়, নিউটন্ এবং লাপ্লাসের দ্বারা তাহারই পরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কোন সময়ে চীন, ভারতবর্ষ, কাল্‌ডীয়া এবং মিসর দেশে জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনার আরম্ভ হয় তাহা নিরূপণ করা স্কটিন; এবং আধুনিক কৃতবিদ্য মহোদয়গণ জ্যোতিষবিদ্যার গৌরব রক্ষার্থ যত্নবান্ হওয়াতে এই বিষয়ের মীমাংসা অতীব দুষ্কর হইয়াছে। যাহা হউক, কাল্‌ডীয়া এবং মিসর দেশের জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে প্রতীতি হইবে যে ভূতদেবে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের বহুকালব্যাপী অমূল্য শীলন হয় নাই।

চীন।

খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদিগের বিবরণ হইতেই চীন দেশীয় জ্যোতির্বিদগণের বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, চীনের সম্রাট ফোহির রাজত্ব সময়ে চীন দেশে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের আলোচনার সূত্রপাত হয়। কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছেন যে ফোহি এবং নোয়া ব্যক্তিবিশেষের নামান্তর মাত্র। ফোহি জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন, এবং গগনবিহারীদিগের আকৃতি নিরূপণেও বহুবিধ যত্ন করিয়াছিলেন। হোয়াংটির রাজত্ব সময়ে (প্রায় খৃঃ পূঃ ২৬৯৭ অব্দে) যুসি উপমের নক্ষত্র, এবং ইহার চতুর্দিকস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি অচল এবং সচল বৃত্ত সম্বলিত একটি গোলক নির্মাণ করেন, এবং চারিটি প্রধান দিকনিরূপণোপযোগী যন্ত্রের (যাহা কেহ দিগদর্শন যন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গাব্রিল সাহেব লিখিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দে চীনেরা অপমণ্ডলের তথ্যকতা এবং গ্রহণের প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিয়াছিলেন; এবং ইহার বহুকাল পূর্বে সৌর বৎসরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য এবং

জ্যোতিষ দ্বারা সৌর মাধ্যমিক উন্নতি অব-
ধারিত কবিয়া সূর্য্যোব ক্রান্তি নির্ণয়, এবং
মেকর উন্নতি প্রভৃতি নিরূপণের উপায়
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গনিত আরাও
নিখিয়াছেন যে খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে প্রণীত
চীন দেশীয় কতকগুলি জ্যোতিষিক গ্রন্থ
পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে চীনেরা
সূর্য্যোব এবং চন্দ্রের প্রাত্যহিক গতি, এবং
গ্রহগণের পরিভ্রমণকাল নিরূপণ করিয়া-
ছিলেন। ডিউহোও বলিয়াছেন যে চিউন
ক* নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ প্রায়
১০০০ বৎসর খৃঃ পূঃ নভোমণ্ডল পর্য্য-
বেক্ষণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পুঞ্জ নক্ষত্রগণকে
শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভাবতবর্ষীয়।

হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ নাক্ষত্রিক বর্ষের
দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিবস, ৬ ঘণ্টা, ১২ মিনিট,
৩০ সেকেন্ড; এবং সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য
৩৬৫ দিবস, ৫ ঘণ্টা, ৫০^২ মিনিট নিরূ-
পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গণ-
নাছুসাবে বিষুবস্থ্য প্রতিবৎসব ৫৪" পুরো-
গমন করে। তাঁহারা অপমণ্ডল নিরক্ষ-
বৃত্ত ছেদ কবিয়া যে কোণ উৎপন্ন করেন
তাহা ২৪° পরিমিত; চন্দ্রকক্ষও নিরক্ষ-
বৃত্ত পবম্পব ত্রিযাগ্ভাবে ছিন্ন করিয়া
যে কোণ উৎপাদন করেন তাহা ৪° ৩০'
পরিমিত; বুধ, শুক্র এবং শনির কক্ষাব-
নতি ১° মঙ্গলের কক্ষাবনতি ১° ৩০'
এবং বৃহস্পতির কক্ষাবনতি ১° পরিমিত
বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহারা কক্ষ-পরিধি

যোজন দ্বারা পরিমণে করিতেন। কোল্-
কক বলিয়াছেন যে আর্ঘ্যভট্ট পৃথিবীর
পরিধি, ৩৩০০ যোজন নিরূপণ করিয়া-
ছিলেন। ৩৩০০ যোজনে ২৫,০৮০ মাইল;
অথবা এক অংশে ৬৯.৭ মাইল গণিত
হয়। কোল্কক আরও বলিয়াছেন যে
গ্রহগণের পাতবিন্দু, নিকট বিন্দু, ও দূর
বিন্দুর গতি বিষয়ক হিন্দু সিদ্ধান্ত, চন্দ্রের
পাতবিন্দু, নিকট বিন্দু ও দূর বিন্দুর সা-
দৃশ্য হইতে অঙ্কমিত হইরাছে। টলেমি
প্রচারিত মতের যে অংশ হিপার্কসকর্তৃক
উদ্ভাবিত হয়, তাহাও হিন্দুদিগের অবি-
দিত ছিল না। ইহারা লঙ্কার যামোন্তর
বৃত্ত হইতে দ্রাঘিমা গণনা করিতেন।
সৌরবৎসর, চান্দ্রমাস এবং বিষুবতের
পুরোগমন এই তিন বিষয়ে হিন্দু জ্যোতি-
ষিক গণনা যে হিপার্কস অথবা টলেমির
গণনা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রাচীন
হিন্দু সা আপনাদিগের পর্য্যবেক্ষণ ফল
মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য
দশটি নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ যন্ত্রের
উল্লেখ করিয়াছেন; তদ্বাচা (১) গোল,
(২) নাড়ীবলয়, (৩) যষ্টি, (৪) শঙ্কু, (৫)
ঘটা, (৬) চক্র, (৭) চাপ, (৮) বৃত্তপাদ,
(৯) ফলক, (১০) ধীষজ্ঞ। * ইহা ব্যতীত
সূর্য্যসিদ্ধান্তে নবযন্ত্র † এবং সহজ রেণু-
গর্ভাখ্য ‡ যন্ত্রের উল্লেখ আছে।

* সিদ্ধান্ত শিরোমণি ১১ অ ২।

† সূ সি ১৩ অ ১৪

‡ সূ সি ১৩ অ ২২।

হিন্দুরা ৪৩২,০০০ বৎসরে একযুগ এবং দশযুগে অথবা ৪,৩২০,০০০ বৎসরে এক মহাযুগ, এবং এক সহস্র মহাযুগে এক কল্প অথবা ব্রহ্মার একদিবস গণনা করিতেন। এই সুদীর্ঘ কালের সহিত জ্যোতিষিক কালচক্রের সম্বন্ধ নিরূপণার্থ পণ্ডিতেরা নানাবিধ যত্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।*

হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থে বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্তের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। উজ্জয়িনী নগরী ব্রহ্মা-তিরীর্দগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে ব্রহ্ম-গুপ্ত ৬২৮খৃঃ অব্দে, এবং কোলব্রুক সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে তিনি খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী শেষে বর্তমান ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত “ব্রহ্মসুত সিন্ধাস্ত” অথবা “ব্রহ্ম-সিন্ধাস্ত” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। কোলব্রুক বলিয়াছেন যে এটি গ্রন্থে গ্রহগণের সমগতি ও তাহাদিগের প্রকৃত স্থান সন্নিবেশ নিরূপণ বিষয়ক গণনা, সাময়িক সম্পাদা, ভূপৃষ্ঠে স্থান নিরূপণের উপায়, সৌর এবং চান্দ্র গ্রহণ

গণনা, গ্রহগণের উদয়ান্ত কাল নির্ণয়, শঙ্কুদ্বারা উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ, গ্রহগণের পর-স্পর্শ এবং নক্ষত্রগণের সহিত সংযোগ, চান্দ্র এবং সৌর গ্রহণের কাবণ, এবং গোল প্রভৃতি নিরূপণের উপায়, বর্ণিত আছে।

এই সকল স্বীকৃত বিষয় হইতে কোল-ব্রুক এবং উজ্জয়িনীর জ্যোতির্বিদগণ অনুমান করিয়াছেন যে—বরাহমিহিব খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বরাহমিহিব ফ-লিত-জ্যোতিষ বিষয়ক একখানি গ্রন্থ সংকলন এবং “বৃহৎ সংহিতা” প্রণয়ন করেন। উজ্জয়িনীর জ্যোতির্বিদগণ খৃঃ ২০০ অব্দে অপর এক বরাহমিহিবের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ জনশ্রুতি আছে যে বরাহমিহির বাচা বিক্রমাদি-তোর সভার একটী রত্ন ছিলেন। তাহা হইলে তিনি খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দে জীবিত ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।†

আর্য্যভট্ট, (আরবেবা যাকাকে আর্য্য-বাহার বলে,) খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে জীবিত ছিলেন। আর্য্যভট্ট জ্যোতিষ এবং বীজগণিত বিষয়ক যাহা যাহা লিখি-য়াছিলেন, তাহা এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া সু-কঠিন।

পুলিষ এবং পবাসর প্রভৃতি জ্যোতি-রীর্দগণ আর্য্যভট্টের সময়ে অথবা তৎ-পূর্বে জীবিত ছিলেন। ইহাদিগের

† বিক্রমাদিত্যও অনেকগুলি ছিলেন।

বং সং

* এ বিষয়ে একটি কথা আম দিগের মনে হয়। বিয়ুদ্বয় প্রতিবৎসর ৫৪ পুরোগমন করে তাহা হইলে ৩৬০° [সম্পূর্ণ মণ্ডল] ২৪০০০ বৎসরে পুরোগমন করিতে পারে। ইহাবই অষ্টাদশ গুণ ৪৩২০০০। কিন্তু আমরা স্বীকার করি ইহাকে বলে, “গৌজা মিলন” প্রাচীন আর্য্যীকৃরেরা এইরূপ গৌজা মিলন দিয়াছিলেন কি না কে জানে?—বং সং

বিরচিত কোন গ্রন্থই এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভাস্করাচাৰ্য্য “লীলাবতী,” “বীজ-গণিত,” “সিদ্ধান্ত শিরোমণি” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষিক গ্রন্থ “সূর্য্য-সিদ্ধান্ত” কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহার নিশ্চয় নাই। অতি প্রাচীন গ্ৰন্থ সকলেও এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এক্ষণে যে গ্রন্থ “সূর্য্যসিদ্ধান্ত” নামে প্রসিদ্ধ, প্রাচীনকালে সেই গ্রন্থেরই নাম “সূর্য্যসিদ্ধান্ত” ছিল কি না তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। হিন্দুরা সনয়ে সনয়ে আপনাদিগের প্রাচীন গ্রন্থের ভ্রম সংশোধন করিতেন, কিন্তু গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করিতেন না। সম্ভবতঃ প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইয়াছে।

বেণ্টলী সাহেবের মতে বরাহমিহির “সূর্য্যসিদ্ধান্ত” প্রণেতা; কিন্তু কোলব্রুক এই মতের অপলাপ করিয়াছেন।

হিন্দু এবং ব্রহ্মদেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রা-নুসারে রাহু নামক গ্রহদ্বারা সূর্য্য এবং চন্দ্র গ্রন্থ হওয়াতে গ্রহণ হইয়া থাকে। গ্রহগণের গতি, অবস্থান, বক্রগমন প্রভৃতি পাতবিন্দু এবং সংযোগবিন্দু অধিষ্ঠিত দেবতাদিগের প্রভাবেই হইয়া থাকে। আৰ্য্যভট্ট গ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন; এবং পৃথিবীর আক্ষিক গতিও নির্ণয় করিয়াছিলেন;

এবং এই আক্ষিকগতির কারণ “প্রবাহ” নামক প্রবল বায়ু নির্দেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত এই মতের অপলাপ করিয়া বলিয়াছেন যে এইরূপ হইলে উপরিস্থিত সকল পদার্থই ভূপৃষ্ঠে পতিত হইত। খৃষ্টীয় ষাদশ শতাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের টীকার পৃথুদক স্বামী ব্রহ্মগুপ্তের এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন।

১৬২৭ খৃঃ অব্দে লোবেরী শ্যামরাজ্যে রাজদৌত্যে প্রেরিত হন। স্বদেশ প্রত্যাগমনকালে তিনি শ্যামদেশীয় কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা লইয়া যান। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে ডিউবাষ্প নামক খৃষ্টীয়ধর্ম প্রচারক কর্ণাট দেশস্থ কৃষ্ণ বোঁরাম বা কৃষ্ণ বোঁরাম নামক নগর হইতে ইউরোপ খণ্ডে কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা প্রেরণ করেন। এই সময়ে পাটোই-লেট নামক অপর একজন প্রচারক ও মসলিপস্তনের নিকটবর্তী নর্শপুঁর নামক স্থান হইতে অন্যান্য জ্যোতিষিক তালিকা সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে লা-জেন্টিস্ যিনি গুজ্র গ্রহের সূর্য্যতিক্রম পর্য্যবেক্ষণ মানসে ভাবতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, খ্রী-বেলোর হইতে কতকগুলি জ্যোতিষিক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে শ্যাম দেশীয় তালিকা খৃঃ ৬৭৮ অব্দে, কৃষ্ণ বোঁরামের তালিকা খৃষ্টীয় ১৪৯১ অব্দে, নর্শপুঁরের তালিকা খৃঃ ১৫৫৯ অব্দে, দ্বীভ্যালোরের তালিকা খৃঃ পূর্ব ৩১০২

অন্ধে, অর্থাৎ কলিযুগের প্রারম্ভে, প্রস্তুত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কালেই হিন্দু জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল, যেরূপে যার এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। লেসলী এই মতের অগলাপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোলক্ক লেসলি'র মত প্রামাণ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন খৃষ্টীয় ২০০০ বৎসর পূর্বে হিন্দুরা জ্যোতির্বিদ্যার সমাগালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডিলামত্ৰী গ্রীকদিগের জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে গ্রীকজাতিই সিদ্ধান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রণেতা।

হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, প্রথমতঃ যে সকল গ্রন্থ দেবদত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ যে সকল গ্রন্থ সুবিখ্যাত পুরাতন ঋষিদিগের দ্বারা প্রণীত; তৃতীয়তঃ যে সকল গ্রন্থ কোন অনির্দিষ্ট সময়ে প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক রচিত, চতুর্থতঃ যে সকল গ্রন্থের প্রণয়ন কাল এবং রচয়িতার নাম আমরা অবগত হইয়াছি।

ব্রহ্ম, সূর্য্য, সোম, বৃহস্পতি এবং নারদ সিদ্ধান্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত—ইহা “বিষ্ণুধর্মোত্তর” পুরাণের অন্তর্গত।

২। সূর্য্যসিদ্ধান্ত—কথিত আছে যে

সূর্য্যদেব ময় নামক দানবকে* কৃত + যুগাবসানে এই শাস্ত্রে উপদেশ দেন।† সূতবাং হিন্দু গণনামুসারে এই গ্রন্থ ২১৬৪৯৭৬ বৎসর* পূর্বে রচিত হইয়াছে। বেটলী সাহেব গণনা দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত খ্রী ১০৯১ অব্দে রচিত হয়; কিন্তু এই মত প্রামাণ্য, সূতবাং গ্রহণীয় নহে।

৩। সোমসিদ্ধান্ত—সোম (চন্দ্র) এই গ্রন্থ প্রণেতা। বেটলী সাহেব বলিয়াছেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতই এই গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে।

৪। বৃহস্পতি সিদ্ধান্ত—ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে এই গ্রন্থ অতি আদরণীয় ছিল।

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত—১ অধ্যায়—৪।৫।

† কৃত—কৃ-করা + ত।

‡ আবুব বেহান, মিনি গজনিপতি মামু-দেব সহিত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ১০৩১ খ অব্দে ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি “লাত” নামক ব্যক্তি বিশেষকে সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রণেতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ওয়েবাব সাহেব ব্রহ্মগুপ্ত বর্ণিত “লাধ” এবং “লাত” এক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র নাম মাত্র অনুমান করিয়াছেন।

* ত্রেতার (ত্র-রক্ষা-ইত-আ) বৎসর সংখ্যা—১২৯৬০০০ দ্বাপরের (দ্বি-পর)—বৎসর সংখ্যা—৮৬৪০০০ কলি (কল-গণনা—) অতীত বৎসর সংখ্যা—৪৯৭৬

৫। নারদসিদ্ধান্ত—ইহা দেবর্ষি নারদ প্রণীত।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। গর্গসিদ্ধান্ত—এই গ্রন্থ এক্ষণে অশ্রোপ্য হইয়াছে; কেবল হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থে কখন কখন গর্গসিদ্ধান্ত হইতে উদ্ধৃত অংশমাত্র দৃষ্ট হয়।

২। ব্যাস সিদ্ধান্ত।

৩। পবিশার সিদ্ধান্ত—বেটলী সাহেব বলেন যে আর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় অধ্যায় পরাশর প্রণীত সিদ্ধান্ত লিখিত গ্রন্থগণের সমগতি বিষয়ক প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪। পৌলিষ সিদ্ধান্ত—কোলকটক এবং বেটলী এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া ছেন। এই গ্রন্থ এবং আর্য্যসিদ্ধান্তের মত পরস্পর বিবোধী।

৫। পুলস্ত সিদ্ধান্ত।

৬। বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত—বেটলী এবং কোলকটক সাহেব বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বেটলী আরও বলিয়াছেন যে বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তে অনেক দোষাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। আর্য্যসিদ্ধান্ত—আর্গ্যভট্ট “আর্য্য-চুতক” এবং “দশগীতক” নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন। বেটলী সাহেব “আর্য্যসিদ্ধান্ত” এবং “লঘু-আর্য্যসিদ্ধান্ত” নামক যে দুইখানি গ্রন্থের

উল্লেখ কবিয়াছেন তাহা বোধ হয় উক্ত দুইখানি গ্রন্থেরই নামান্তর হইবেক।

২। বরাহসিদ্ধান্ত—বরাহমিহির ব্রহ্ম, সূর্য্য, পৌলিষ, বশিষ্ঠ এবং রোমক সিদ্ধান্তের সার সংগ্রহ করিয়া “পঞ্চ সিদ্ধান্ত” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৩। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত—ব্রহ্মগুপ্ত রচিত। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম “ব্রহ্ম-স্কট-সিদ্ধান্ত।” ভাস্করাচার্য্য এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া “সিদ্ধান্ত শিরোমণি” রচনা করেন।

৪। রোমকসিদ্ধান্ত—কৃষ্ণ বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বরাহমিহির প্রণীত সিদ্ধান্তে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

৫। ভোজসিদ্ধান্ত—খ্রীষ্টীয় দশ বা একাদশ শতাব্দে ধারবাজ ভোজদেবের রাজত্ব সময়ে এই জ্যোতিষিক গ্রন্থ রচিত হয়।

নিম্নলিখিত গ্রন্থ পাঁচ খানি চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে ভাস্করাচার্য্য “সিদ্ধান্ত শিরোমণি” নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভব ভাস্কর ১০৩৬ শকে* মহেন্দ্রের ঔবসে জন্মগ্রহণ

* “The years of the era of Sālivāhana are, accordingly to Warren, Solar years; their reckoning commences after the lapses of 2179 complete years of the Iron age, or early in April A. D. 78

** The years of this era are generally cited as Saka or Saka

করিয়া ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সহ পর্কত নিকট বর্তী কোন নগর ইহার ঠৈতৃক, বাসভূমি ছিল।†

২। খৃ ষোড়শ শতাব্দীর স্ত্রোজ্ঞানরাজ “সিদ্ধান্তসুন্দর,” ১৪৪২ শকে (১৫২০ খৃ অব্দে) গণেশ “গ্রহলাঘব” এবং ১৬২ খৃ অব্দে কমলাকর “তত্ত্ব-বিবেক বা “সিদ্ধান্ত-তত্ত্ববিবেক” রচনা করেন। সূর্যাসিদ্ধান্তের সুবিখ্যাত টীকাকার রঙ্গনাথের পুত্র মুনীন্দ্র “সিদ্ধান্তসার্কভৌম” নামক জ্যোতিষিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং সিদ্ধান্ত শিরোমণির একটি টীকাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ মধ্যে “সূর্যাসিদ্ধান্ত “সিদ্ধান্ত শিরোমণি” এবং “গ্রহলাঘব” মুদ্রিত হইয়াছে।

কালডীয়।

মাসিদনাধিপতি বিখ্যাত বীর আলেকজান্ডার খৃ পূঃ ৩৩২ অব্দে বাবিলন আক্রমণ করেন। কথিত আছে ইহার ১৯০৩ বৎসর পূর্বে বাবিলোনীয়দিগের কতকগুলি জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণ ফল ক্যালিস্ থেনিস কর্তৃক প্রসিদ্ধ নামা আরিষ্টটলের নিকট প্রেরিত হয়, সূত্রাং খ্রীষ্টীয় শকের ২২৩৪ বৎসর পূর্বে কালডীয় দেশে জ্যোতির্বিদ্যার অশুশীলন আরম্ভ

হইয়াছিল। কিন্তু টলেমী খৃ ৭৩০ বৎসর পূর্বে কালডীয় পর্যবেক্ষণের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। যদিও কালডীয়দিগেব গ্রহণ গণনা কীরবার প্রথা, যাহা টলেমী প্রণীত আলমাজেস্ট নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে, তাদৃশ উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, তথাচ এই প্রথা অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্য জাতিরা সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের বর্তমান উন্নতি করিয়াছেন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কালডীয় জাতি রাশিচক্র দ্বাদশ সমান অংশে, প্রত্যেক অংশ ৩০° এবং প্রত্যেক (১)৬০° বিভক্ত করিয়াছিল; এবং রাশিচক্রের বহিঃস্থ চতুর্বিংশতি নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানও নিক্ষেপণ করিয়াছিল। হেরোডোটস্ নামক জগদ্বিখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা লিখিয়াছেন যে কালডীয় জাতি শঙ্কু এবং পোলস্ নামক যন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে চীন দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শঙ্কু ব্যবহৃত হয়। পোলস্ যন্ত্রের দ্বারা বোধ হয় কালডীয়েরা অয়নবিন্দু নিকটবর্তী সূর্যের মাধ্যাত্মিক উন্নতির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিত। ঘটাই ইহাদিগের কালমাণ-যন্ত্রস্বরূপ ছিল।

আপলোনিয়স্ মিন্ডিয়স্ নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ক্যালডীয় আচার্য হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা কবিরাজি-লেন। আপলোনিয়স্ বলিয়াছেন যে ক্যালডীয় জাতি গ্রহগণ এবং ধূমকেতুগণ এক জাতীয় বলিয়া নির্দেশ করিত এবং

years.” Burgess's *Surya Sid-dhanta*, add. notes. 12

† সিদ্ধান্ত শিরোমণি—১৩ অ-৫৮৬১।

এই গগনবিহারীদিগের গতির নিয়মও মিল্লপণ করিয়াছিল। আপলেনিসের বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ক্যালডীয় জাতি যে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের সম্বন্ধিক অতুশীলন করিয়াছিল তাহা দ্বিগুণে অণু-মাত্র সন্দেহ থাকিবার নহে।

জেমিনস্ লিখিয়াছেন, কালডীয় জাতি যে জ্যোতির্বিদ্যার সমাগালোচনা করিয়াছিল তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে তাহাদিগের গণনানুসারে চন্দ্র ৬৫৮৫ ১/২ দিবসে সূর্য্য সম্বন্ধে ২২৩ বার, আপন কক্ষের নিকট বিন্দু ও দূরবিন্দু সম্বন্ধে ২৩৯ বার, এবং আপন পাতবিন্দু সম্বন্ধে ২৪১ বার আবর্তন করে। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে কালডীয় জাতি অতিশয় যত্ন সহকারে গ্রহগণ, বিশেষতঃ শনৈশ্চর গ্রহ, পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল।

মিসরীয়।

পূর্বকালে মিসরদেশ বাসীরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অতুশীলন দ্বারা সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ডীওডোরস্ সিকুলস্ বলিয়াছেন যে মিসরীয়েরা গ্রহণ গণনা করিতে পারিত; এবং ডীওজেনিস লেয়ার্সিউস্ মিসর দেশে পর্য্যবেক্ষিত ৩৭৩ মৌর এবং ৮৩২ চান্দ্র গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে যে কোনন্ (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) মিসরীয় সমস্ত সূর্য্যগ্রহণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং আরিসটটল্ লিখিয়াছেন যে কালডীয় এবং মিসরীয় জ্যোতির্বিদ-

গণ নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে সকল জ্যোতিষিক গণনা করিয়াছিলেন তাহাতে ভ্রম মাত্র নাই।

মিসরীয়েরা ৩৬৫ দিবসে বৎসর গণনা করিত বটে, কিন্তু ৩৬৫ ১/৪ দিবসে বৎসর গণনা যে অপেক্ষাকৃত সঙ্গত, তাহাও অতি প্রাচীন কাল হইতেই অবগত ছিল। ডাও ক্যাসিয়স্ বলিয়াছেন যে মিসরীয়েরা সপ্তাহ গণনা করিবার প্রথা প্রচলিত করে; এবং গ্রহগণের নামানুসারে সপ্তাহান্তর্গত দিবস সংখ্যার নাম নির্দেশ করে। হিন্দু পুরাণেও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, সুতরাং এই মত অত্যন্ত প্রাচীন বলিতে হইবেক।

মিসর জাতি পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র জ্ঞান করিত। তাহাদিগের ধারণা ছিল যে শুক্র এবং বুধ গ্রহ সূর্য্য পরিভ্রমণ করে, এবং সূর্য্য উক্ত পরিভ্রমণকারী গ্রহদ্বয়ের সহিত পৃথিবী পরিভ্রমণ করে। সুতরাং শুক্র এবং বুধ কখন বা সূর্য্যাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্তী, কখন বা তদপেক্ষা দূরবর্তী, হয়। ম্যাক্রোবিয়স এই মত বিস্তৃত মিসরীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কথিত আছে যে ২৫০০ খৃঃ পূঃ মিসরীয়েরা রাশিচক্র এবং দ্বাদশ রাশির নাম ও অবস্থান নির্দেশ করিয়াছিল। লাপলাস্ প্রভৃতি কতিপয় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতেরা এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

ত্রীণী:

সাং ভবানীপুর।

বাঙ্গালি কবি কেন?

ইউরোপীয়েরা কবিত্বের উপর অনেকটা হতাশ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ এবং যত্ন বিজ্ঞানাত্মকশীলনে নিযুক্ত। কাব্যের এইরূপ অগাধ অনাদর দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। সে দিবস একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিতেছিলেন,—বিজ্ঞানের অমুশীলন কর, তাহা বাঙ্গালীর; কিন্তু তাই বলিয়া জড়-প্রকৃতিকে সারসর্গস্ব করিয়া তুলিতেছ কেন? মনুষ্যের সর্বাত্মক উন্নতি জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সুতরাং যেমন বুদ্ধিবৃত্তির, তেমনি হৃদয়েরও অমুশীলন হওয়া কর্তব্য। ইউরোপে তাহা হইতেছে না।

আমাদিগের দেশেও তাহা হইতেছে না। ইউরোপ একদিকে ছুটিতেছে; আমরা তাহার বিপরীত দিকে যাইতেছি। প্রাচীন গ্রীসে যে কয়েকটি রস কাব্যের আধার বলিয়া পরিগণিত ছিল, আধুনিক ইউরোপেও তাহাই আছে; কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের পাঁচটি ভূতের স্থানে একশ্রেণী পয়ষটিটি দেখা দিয়াছে। আমাদের দেশে ঐকি ইহার বিপরীত। প্রাচীন ভারতে যে পাঁচটি ভূত ছিল, এখনও সেই ক্রিপাশ্রয়িত্বের আশ্রয় আছে, কিন্তু রসের ব্যাপার নাই ছড়াছড়ি। মূলরসের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না।

বটে, কেননা যাহা প্রাচীন এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, তাহার উপর কাব্য-ব্যয় করা হিন্দুসম্প্রদায়ের পক্ষে পক্ষ নহা-পাতক মধ্যে গণ্য; কিন্তু শাখা প্রশাখার বিশাল বিস্তার হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে নয়টি রস ছিল। শাস্তিরস তাহার মধ্যে একটি। সেই শাস্তিরসের একটি শাখা, ভক্তিরস। আনাদের দেশে এখন একা ভক্তিরসই চৌষট্টিবিধ।* ইউরোপীয়েরা প্রাচীন রসেই সন্তুষ্ট; যত কারিগরি, তাহা ভূতের উপর। আমরা প্রাচীন ভূতই সন্তুষ্ট; কারিগরি কেবল রস লইয়া। ইউরোপে কেবল বিজ্ঞান—কেবল অল্পজন, ডলজন, অব্যবহারজন; আনাদের দেশে কেবল রস, কেবল বঙ্গনা, কেবল কবিত্ব—কেবল নির্মল চন্দ্রিকা আর প্রকৃত মল্লিকা, কোকিলের কুঞ্জ আর ভ্রমরের শুভ্র, কবরীভূষণ আর কাঁচলিফণ, বিরহিণী বালা আর যৌবনের জালা।

কল্পনার এইরূপ অবস্থা অমুশীলন এবং বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ অবস্থা অনাদর দেখিয়া অনেকে ভীত। বিজ্ঞান বরিয়া অনেকে মাথা কপাল ভাঙ্গিয়া মরিতেছেন, তবু বিজ্ঞান হয় না। আবার ‘কল্পনা আর প্রয়োজন নাই, অল্প হুই করিয়া উঠি কর’ বলিয়া গলা ডাঙ্গিত

* হরিতত্ত্বসংগত সিদ্ধ দেখ।

ছেন, তবু কল্পনা জুয়ায় না—কাব্যের উপর কাব্য, নাটকের উপর নাটক, উপন্যাসের উপর উপন্যাস, তাহার উপর নবন্যাস—কল্পনাব ছড়াছড়ি। যে কেহ দুই একখানা পুস্তকের দুই এক পাতা উন্টাইয়াছেন কি না উন্টাইয়াছেন, অমনি সাহিত্যের আসরে নাগিয়া ‘সখিরে সখি’ করিতে বসেন।

কেহ না মনে করেন, যে আমরা কাব্যের নিন্দা করিতেছি। নিন্দা করা দুবে থাক, কাব্যের আমরা বিশেষ পক্ষপাতী এবং কবিদিগকে আমরা যাব পব নাই ভক্তি করিয়া থাকি। ইহা আমাদের বিশ্বাস আছে, যে হোমর এবং বর্জিল যত লোকের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইয়া থাকেন, এত আর কেহ না। দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্যকে পাপ হইতে বিরত রাখিতে, পুণ্যের পথে উৎসাহিত করিতে, ধর্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধনে, পশুভাবের সংযমনে, কবির ন্যায় রূতকার্য হইতে আর কেহই পারেন না। ধার্মিকের ধর্মোপদেশ প্রায় ভাসিয়া যায়—প্রায় এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া যায়; কিন্তু কবির কথা হৃদয় ভেদ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ কবে। ধার্মিক ব্যক্তি যদি উপদেশ দেন, যে ‘বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, নরকভোগ করিতে হইবে,’ তাহা হয় ত শুনিয়াও শুনি না, কেন না ধর্মোপদেশকের মুখে নরকটা কেবল কথার কথা মাত্র—নরকের ভাব মনোমধ্যে

স্পষ্টীকৃত করা ধর্মোপদেশকের সাধ্যা-
তীত। কিন্তু কবির উপদেশ সেরূপ
নহে। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে নরকে
যাইতে হইবে, এরূপ অকার্যকর অর্থ-
বিহীন বাক্য কথি প্রয়োগ করিলেন না;
সেই নরকের এক অপূর্ণ দৃশ্য দেখা-
ইলেন। আমরা বিশ্বয়বিস্কৃষ্ট নেক্রে,
ভীতিসংকুচিতচিত্তে দেখিলাম,—গভীর
নিশায়, পৃথিবীর লোক ঘুমাইতেছে, কিন্তু
কটলগের রাজ্যের চক্রে ঘুম থাকিয়াও
নাই; তেমন নিজার অপেক্ষা জাগরণ
ভাল। গভীর নিশায় জেড়ি ম্যাকবেথ
দীপ হস্তে করিয়া, চক্রে নিজা আঁচ
অপচ চলিয়া বেড়াইতেছেন, নিজার
ঐহার শাস্তি নাই, কেন না তিনি বিশ্ব-
স্তের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন,
নিদ্রিতকে জোর করিয়া চিরনিদ্রিত
করিয়াছেন। কবির সঙ্গে, পার্শ্ব দাঁড়া-
ইয়া, সেই হতভাগিনীর পাপ-আশীর্ষ
দংশিত মনের উদ্ভাস্ত অস্বস্ত প্রলাপ
শুনিলাম—ভীত হইলাম। পার্শ্ব চিকিৎ-
সক ছিলেন, তিনি দুঃখিত হইয়া বলি-
লেন, হায়! হায়! যাহা তুমি জানিয়াছ
তাহা তোমার জানা উচিত ছিল না,—
রোমাঞ্চ হইল। সামান্য পরিতাপিক,
সে উঠিয়া বলিল, “সমস্ত শরীরের গোর-
বের জন্যও আমি এমন হৃদয় কঙ্কর
ভিত্তর চাহি না”—দাসীর মুখের কথা
শুনিয়া হৃদয়ের ভিত্তর হৃদয় ডুবিয়া
গেল।* কবির নিকট বিদায় লইলাম,

* Macbeth. Act. v. sced I.

কিছু এ অপূর্ণ নগ্নকচিৎ হাড়ে হাড়ে
ধিধিরা রছিল। এমন জীবন্ত উপদেশ
ছাতি থাকিতে ফুলা যায় না। তাই
বলিতেছিলাম, পাপের কদর্যতা দেখা-
ইতে এবং পুণ্যের সৌন্দর্য্য প্রকাশ
করিতে, কবি অধিতীয়। কাব্য ভাল।

কাব্য ভাল, কিন্তু কথ্য কি ভাল, কোন
বিষয়েরই বেজায় বাড়াবাড়ি ভাল নহে।
সর্ব্বজনস্বগ্রহিতং। কাব্য ভাল, কাব্য
থাক, কিন্তু তাই বলিয়া আর কিছু না
থাকিবে কেন? সকলই কিছু কিছু চাই,
নতুবা সংসার চলে না। কেবল কোম-
লতা ভাল নহে—জীলোকের সংসারে
বাস্তবের ভব লহে না; কেবল কাঠি-
নাও ভাল নহে—পুরুষের সংসারে বিলি
বন্দহা থাকে না। জীলোকে পুরুষে যে
সংসার গঠিত তাহাই ভাল, তাহাই চলে।
সমাজেও তাই। জগতের একই নিয়ম:
যে নিয়মবলে ফলটি খসিয়া ভূপৃষ্ঠে
পতিত হয়, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু,
অখিল সংসার সেই নিয়ম জোরে বাঁধা।
যে নিয়ম ক্ষুদ্র পরিবারে, সেই নিয়ম
বৃহৎ সমাজেও। স্পাটা কেবল পুরু-
ষের সমাজ, কেন না স্পাটার জীলোকে-
রাও পুরুষ—স্পাটাম সমাজ চলিল না;
বিদ্যাতের নায়, ফলেকের জন্য জলিয়া
অমনি নিবিয়া গেল। বঙ্গদেশ কেবল
জীলোকের সমাজ, কেন না বঙ্গদেশের
পুরুষেরাও জীলোক, সুতরাং বাঙ্গালার
অন্যে কি আছে তাহা ভাবিতে গেলে
পেটের ভাত ঢাল হইয়া যায়। জী

লোকে পুরুষে গিলিয়া যেশমাজ গঠিত
হয়, সেই সমাজই চলে। কোমলে
কঠিনে মিলন হইলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইল।
সৌন্দর্য্যের সহিত বলের সামঞ্জস্যই প্রকৃ-
তির চরম উজ্জ্বল। যৌননির্বাচনের
সাহায্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন, প্রকৃতিকে
সেইদিকে লইয়া যাইতেছে। প্রাকৃতিক
নির্বাচনে সংসার বলীয়ান হইতেছে;
যৌননির্বাচন সংসারকে সুন্দর করি-
তেছে। যাহা সুন্দর এবং বলীয়ান,
তাহাই চলে, কেবল সুন্দর চলে না,
কেবল বলীয়ানও চলে না। কেবল
সৌন্দর্য্য লইয়া ইতালি মারা গিয়াছে—
কবির দুঃখ এই যে, ইতালি তুমি এত
সুন্দর হইয়াছিলে কেন? কেবল সৌন্দর্য্য
লইয়া ভারতবর্ষ মারা গিয়াছে—ভারতীয়
কবিও এই দুঃখ করিতে পাবেন। কেবল
সৌন্দর্য্য লইয়া ওয়াশিংটনের কাব্য
সকল মারা গিয়াছে—তাহাতে প্রচুর
সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু বল নাই, সুতরাং
সে সকলের বড় একটা আদর নাই।
আবার কেবল বল লইয়া স্পাটা মারা
গিয়াছে, কেবল বল লইয়া ক্ষত্রিয়েরা
মারা গিয়াছেন। কেবল বল লইয়া
কথিকরণ মারা গিয়াছেন। ছুই চাই।
ইহাই প্রকৃতির উপদেশ; এবং প্রকৃতির
উপদেশ লোকেরই গ্রহণ করা কর্তব্য;
নতুবা মঙ্গল নাই। আমরা প্রকৃতির
উপদেশ গ্রহণ করিতেছি না; যাহাতে
বল হইবে তাহার কোন অনুষ্ঠানই নাই,
সুতরাং আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু

গ্রহণ যে করিতেছি না, তাহার কি কোন কারণ নাট ? জগতে কিছুই নিষ্কারণ নহে ; আমাদের কবিত্বপ্রণয়তার কি কোন কারণ নাই ? অবশ্য আছে ; এবং সে কারণ কি, তাহা বলিতে চেষ্টা করি তেছি। কিন্তু তৎপূর্বে আর একটা কথাই মীমাংসা করা উচিত। কবি কাহাকে বলা যায় ?

কবিত্বের প্রধান উপকরণ, অমুভাব-কতা এবং কল্পনা। অমুভাবকতা সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে কেহ কোন ভাবের বেগ, ভাবের তরঙ্গ হৃদয়-মধ্যে অমুভব করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ ভাবনাসিয়াছেন অথবা স্থগা করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ এক দিন হুঃখ ভাবিগা ননেন বলিয়াছেন ‘আজিকার রজনী যেন আর পোহান না,’ যে কেহ সুখ ভাবিয়া একদিন ননেন মনে বসিয়াছেন, ‘স্বর্গদেব তোনার পায়ে পড়ি, একটু শীঘ্র পাটে গিয়ে বসো বাপু,’ তিনিই কবি। যে কেহ হাসিয়াছেন অথবা কাঁদিয়াছেন তিনিই কবি ; এবং এ সুখঃখের সংসারে কে হাসে নাই— কে কাঁদে নাই ? অতি পরিষ্কার আকাশেও কালো মেঘ দেখা যায়, আবার নিবিড় জলদের কোনেও সৌন্দর্যমণী হাসে ; তেমনি সহস্র সুখের মধ্যেও একটু হুঃখ থাকে, আবার সহস্র হুঃখের মধ্যেও একটু সুখ থাকে। সুতরাং অন্তরে অন্তরে কবি সকলেই। তা ঠিক ; তবে কি না যার হৃদয় কঠিন তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে

না—সে ব্যক্তি ভাব অমুভব করে বটে কিন্তু তার হৃদয়ে তরঙ্গ নাই, কেন না তরঙ্গ কাঠিন্যের ধর্ম নহে। আর যার হৃদয় কোমল, যার হৃদয় তরল, ভাবের বাতাস বহিলেই তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে, কেন না তরঙ্গ তরলতারই ধর্ম—তরল-তার ভঙ্গী বিশেষের নামই তরঙ্গ। এই তরঙ্গ যার উঠে এবং ইহার মূর্তি ভাবের বর্ণে যে আঁকিতে পারে, সেই প্রকাশ্যে কবি। যে পারে না, সে কবি হইরাও কবি নহে। সেই জন্য সকলে কবি নহে। বাঙ্গালির হৃদয় কোমল, বাঙ্গালি-হৃদয় তরল, এইজন্য বাঙ্গালি কবি। আবার অশিক্ষিতের উপর করনার এবা-ধিপত্য। বাঙ্গালি অশিক্ষিত, অপরি-মার্জিত-বুদ্ধি, কুসংস্কারাজ, সুতরাং বাঙ্গালির কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালি কবি। কিন্তু এ কল্পনা, এ অমুভাবকতা কোথা হইতে আসিবে ?

প্রাচীন আর্ঘ্যগণ ধর্মের বন্ধনে হিন্দু-সমাজকে অষ্টপুষ্ঠে লগাটে বাধিলেন। বুদ্ধিবৃত্তির কার্য স্বাধীন ভাবে হইতে থাকিলে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য থাকে না, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিকেও সেই বন্ধনে বা-ধিতে হইল। ধর্মশাস্ত্রের বিধি পাকা-উরাং বৃহৎ এক রজ্জু নির্মাণ করিলেন। তাহাতে ভাবতবর্ষকে বাধিয়া, রজ্জুর দুই মুখ স্বহস্তে ধরিয়া বসিলেন। যদি কেহ কখন বন্ধন মুক্ত হইবার উপক্রম করিল, অননি রজ্জু টানিয়া তাহাকে বাধিত করা হইল—তাহার মান গেল, কুল গেল,

সম্মত গেল, জাতি গেল, ইহলোক গেল, পরলোক গেল। অগত্যা সকলকে বন্ধন বীকার করিতে হইল। শাস্ত্রের উপর অর্থাৎ ব্রাহ্মণব্যাক্যের উপর বাক্যব্যয় করা পঞ্চমহাপাতক তুলা গণ্য হইল। যাহা কিছু শাস্ত্রে লেখা আছে তাহাই সত্য; তাহাতে শতসহস্র জাজ্ঞ্যমান ভ্রম থাকিলেও তাহা অত্রান্ত। দুইটি কথা, যাহা সরল বাক্যলাভায় বলিলে মূর্খও পরস্পর বিরোধী বলিয়া বুঝিতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকিলেই দুইটিই সত্য হইয়া দাঁড়াইল। সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে, নচেৎ নিরয়ে পড়িতে হইবে। যে সকল স্থল বুঝিতে পার না, তাহাও বিশ্বাস কর। বুঝিতে যে পার না, সে ভোমার বুদ্ধির দোষ; তদ্বিধকন শাস্ত্রের অগৌরব কেন করিবে? সব মিটিয়া গেল। বোল কলা সম্পূর্ণ হইল।

কালে বিশ্বাস আসিল, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহাই শাস্ত্রে আছে, এবং যাহা কিছু শাস্ত্রে আছে, তাহাই সত্য। যাহা শাস্ত্রে নাই তাহাই মিথ্যা। একপ বিশ্বাসে সুফল ফলে না। এইরূপ বিশ্বাসে আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার পুড়িয়াছিল।* আরিস্ততলের উপর এইরূপ অচলা ভক্তি ছিল বলিয়া স্কলমেন বিছুরিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভাবত-

* উক্ত পুস্তকাগার দাহের সত্যতা সম্বন্ধে আগাদেব সন্দেহ আছে। প্রচলিত বিশ্বাস এখানে প্রকটিত হইবে।

বর্ষে ব্রাহ্মণের জাতিরা বিদ্যাসাম্রাজ্য হইতে নির্বাসিত। কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্যাহুশীলন ছিল। কিন্তু নূতন সত্যের পথ বন্ধ, জ্ঞাতব্য সত্যের সংখ্যা নির্দিষ্ট; সুতরাং ব্রাহ্মণের বুদ্ধি প্রার্থ্যা কেবল কথার মারপেঁচে পরিণত হইল। বুদ্ধির প্রার্থ্যা যে ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু তাহাতে কার্য্য হইল না। তমাস্ আকুইনাস্, দন স্কোতস্ প্রভৃতি প্রথর বুদ্ধিশালী হইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। স্থির তীক্ষ্ণাগ্রভাগে কয়জন এঞ্জেল নাচিতে পারে?—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে এঞ্জেলেরা মধ্যবর্তী বিস্তৃতি পার না হইয়া যাইতে পারে কি না?—ঈশা যখন মেরির গর্ভে ছিলেন, তখন বসিয়াছিলেন, কি শুইয়া ছিলেন না দাঁড়াইয়াছিলেন? এইরূপ বৃথাকর্মে তাঁহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইল, কেন না আরিস্ততলের উপর বাক্যব্যয় করা মহাপাপ। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের বুদ্ধি এইরূপে নষ্ট করিলেন। পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগ হয়। যে শৃঙ্খল পরের জন্য নির্মাণ করিয়াছিলেন, কালে আপনারাও তাহাতে বাধা পড়িলেন। বুদ্ধির পথে কাঁটা পড়িল; কল্পনার পথ মুক্ত—সুতরাং মনের ঢাকলা সেই পথে নিযুক্ত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

কবির চক্ষে কিছুই নির্জীব নহে। পৌরাণিক অবস্থার (Mythological stage or volitional stage,) মিশ্রব্রজেন

লোকে প্রাকৃতিক কার্যমাত্রকেই ইচ্ছা-
 বিশিষ্ট কবীর কণ্ঠ্য বলিয়া বোধ
 করে। এইজন্য-সে সময়ে সকলেই
 কবি। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি সকল-
 কেই তাঁহার সজীব বলিয়া বিশ্বাস
 করিতেন। আমরা যেমন মনে করি,
 সূর্য্য উদয়াস্ত হইতে রাধা—আমাদের
 নীরস, শুষ্ক চিন্তায় যেমন সকলেই নি-
 রস, সকলেই নিম্নতি, তাঁহাদের তেমন
 ছিল না; সূত্রাৎ যখন পশ্চিম গগন
 সায়াহ্নের সৌখীন শোভায় শোভিত
 হইত, তখন বৈদিক আৰ্য্য অন্তঃগমনো-
 মুখ দিনমণিকে করজোড়ে বলিতেন,
 —আবার এসো হে; আমরাগকে ছা-
 ডিয়া চলিলে, আবার কখন দেখা পা-
 বে। এইরূপ বিশ্বাস ছিল বলিয়া, তাঁহার
 সকলেই কবি। যাহা মুখ দিয়া বাহির
 হইবাচে তাহাই কবিত্ব পরিপূর্ণ; যাহা
 কবিত্ব পরিপূর্ণ তাহাই মুখ দিয়া বাহির
 হইয়াছে। এই কারণে বালক মাত্রেই
 কবি, কেননা বালক সকলকেই সজীব
 বলিয়া বিশ্বাস করে। আমাদের ধর্ম্ম
 আমরাগকে বালক করিয়া রাখিয়াছে।
 চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, মেঘ, বিদ্যুৎ,
 বায়ু, অগ্নি, ক্ষিতি, অপ, বৃক্ষ, লতা
 সকলকেই সজীব মনে কবিত্তে আমরা
 বাধ্য, কেন না সকলেই আমাদের
 দেবতা। জননীর স্তনের সঙ্গে এই
 বিশ্বাস পান করিয়াছি, বাল্যকালে এই
 বিশ্বাসে দীক্ষিত হইয়াছি, শরীরের বুদ্ধির
 সঙ্গে ইহা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, মানসিক

বুদ্ধিনিচয়ের ক্ষুদ্রির সঙ্গে ইহা ক্ষুদ্রিপ্রাপ্ত
 হইয়াছে। পরিণত বয়সে বিজ্ঞানের
 সাহায্য পাই নাই;—মেষকে মেষরূপে
 বলিয়াই বোধ থাকিল, বায়ুশাশি প্রভে
 করিতে পারিলাম না; অগ্নিকে ত্রুণ
 বলিয়াই পূজা করিলাম, দ্বাদশমিকক্রিয়
 মাত্র মনে করিতে পারিলাম না; কণ-
 প্রত্যকে চিরকাল দেবেন্দ্রাহুততা পলায়-
 মানা দেবী মনে করিলাম, তড়িৎতা
 মনে করিতে পারিলাম না। সূত্রাৎ
 চিরকাল কল্পনার কার্য্য হইল। যে স্থলে
 কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ উপস্থিত
 হইল, সে স্থলে কল্পনা, শাস্ত্রের সাহায্য
 পাইল, ধর্ম্মের সাহায্য পাইল, বিজ্ঞানের
 সাহায্য পাইল, আর দশজন লোকের
 সাহায্য পাইল, সূত্রাৎ কল্পনার ঋণ চির-
 কাল হইল। প্রত্যেক কলেই জয়লাভ
 করিয়া কল্পনা বলশালিনী হইল; হারিয়া
 হারিয়া বুদ্ধি নিস্তেজ, ক্ষুদ্রিবিহীন, অবলম্বন,
 বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল। কবিত্বের প্রধান
 উপকরণ কল্পনা, সূত্রাৎ কবিত্ব বাড়িল
 অথবা বুদ্ধিপ্রবণতা পুষ্ট হইল।

সূত্রের শরৎ কালে শরৎসুন্দরী পূজা
 বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। কেবল
 শাক্ত, কেবল ভক্ত, বলিয়া নহে, বঙ্গদেশে
 এ উৎসব সর্ব্বজনীন; এক এ উৎসব
 কবিত্ব পরিপূর্ণ। এক প্রতিমাতেই কবি-
 ত্বের সীমা নাই। দশভূজা দশহস্তে
 দশ প্রহরণ ধরিয়া চণ্ডীমণ্ডপ আলো
 করিতেছেন, বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে বাণ-
 দেবী সূকুমার পঙ্কজের উপর তদধিক

সুহৃদমাক চরণসমোজ বিন্যস্ত করিয়া
 গাড়াইরা আছেন। উভয়ের পার্শ্বে কার্তি-
 কেশ এবং গজানন সুন্দরের—চরম
 এবং কৃৎসিতের চরম। নিরে মহাদৈত্য
 মহিষাসুর বীরদর্পে বিকট দশনে অধর
 দংশিয়া অসি উত্তীর্ণ করিতেছে—দুর্জয়
 সিংহ তাহাকে ভীম পরাক্রমে আক্রমণ
 করিতেছে। মন্তকোপরি দেবাসুরের
 অপূর্ণ যুদ্ধের অপূর্ণ চিত্র। অন্ধনে চাপ
 শৌণিকের ধারা; সেই শৌণিতে বিজু-
 যিত হইয়া ভক্তিভাবগরিম্মত ভক্ত নাচি-
 তেছে। এ অপূর্ণ দৃশ্য দেখিলে হৃদয়
 মধ্যে মহান্ ভাবের তরঙ্গ বহেনা, এমন
 নীরস, শুষ্ক হৃদয় কার আছে? এ উৎ-
 সবে যে এক বার মাত্তিরাছে—কোন
 বাঙ্গালিমস্তান মাতে নাই?—বিন্টন প-
 ডার কাজ তাহার হইয়া গিয়াছে। ইহার
 উপর আবার আত্মবলিক কবিত্ব আছে।
 বালটেরা মানাহার ভুলিয়া গিয়াছে, যুব-
 কেরা আনন্দে মাত্তিরাছেন; নববিকসিতা
 কুসুমরূপিনী বঙ্গকুলবধু সুন্দর অলঙ্কারে
 সুন্দর দেহ সুন্দর করিয়া সাজাইরা, বহু
 দিনের পর প্রিয়সম্মিলন হইবে এই
 আনন্দে চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন; প্রবাসী,
 এক বৎসরের দাসত্বযজ্ঞা ভুলিবার আ-
 শায় উজ্জ্বল পুহাতিমুখে ফুটিতেছেন।
 কুন্দের পর্ষন্ত বার্ককের উপব উৎসাহ
 চাপ দ্বিরা আবার বুঝাইয়া উঠিয়াছেন।
 কবির আনন্দের সীমা নাই; বিচিত্র
 অষ্টালিকার এবং পর্ণকূটরে রাজপথে
 এক অস্তঃপুরে, কেবল আনন্দধ্বনি

উঠিতেছে, কেবল হৃদয়স্বত্ব উৎসাহ
 তরঙ্গ খেলিতেছে। পিতার কাছে পুত্র
 আসিতেছে, পুত্রের কাছে পিতা আসি-
 তেছেন, প্রণয়িনীর কাছে প্রণয়ী আসি-
 তেছে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব একত্র
 সমবেত হইতেছে—আনন্দের সীমা কি?
 এক মাস পূর্ণ হইতে বঙ্গবাসী যে দিনের
 আশাপথ চাছিয়াছিল, সেই দিন আসি-
 য়াছে—এক মাস পূর্ণ হইতে যে ভাবের
 বহি ধিকি ধিকি জলিতেছিল, আজ তাহা
 একেবারে জলিয়া উঠিয়াছে। কেবল
 ভক্তের বলিয়া নহে, সমস্ত বঙ্গবাসীর
 হৃদয়সাগরে, ভাবের প্রবল বাতাসে উচ্চ
 তরঙ্গ উঠিতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে,
 যে কেহ যে কোন ভাবের বেগ হৃদয়ের
 মধ্যে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই কবি।
 দুর্গোৎসব বাঙ্গালিকে কবিত্বের পথে
 অনেকটা অগ্রসর করিয়াছে। বাঙ্গালির
 বারমাসে তের পর্ব আছে; দুর্গোৎসব
 সর্বপ্রধান বলিয়া কেবল ইহারই উল্লেখ
 করিলাম। বুদ্ধিমান পাঠককে আর অ-
 ধিক বলিবার আবশ্যক নাই। আমরা
 এক্ষণে বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা
 বলিব।

বৈষ্ণব ধর্ম বাঙ্গালিকে যতটা কোমল
 করিয়াছে এত বোধ হয় আর কিছুতেই
 নহে। এধর্ম কোমলতাপূর্ণ, প্রণয়পূর্ণ,
 মধুপূর্ণ—যশোদার বাৎসল্য, রাধিকার
 উগ্র অমুরাগ, কৃষ্ণের লীলা, ব্রজরাখাল-
 দিগের ভ্রাতৃত্বাব, গোপাঙ্গনাদিগের বি-
 লাস চেষ্টা, বৈষ্ণবদিগের যে অংশ দেখ

তাহাতেই মধু আছে। আর বৈষ্ণবধর্ম
বেসকল ভাব আছে, সে সকলই জীবন্ত
—তাহাতে তরঙ্গ আছে, বেগ আছে,
চাঞ্চল্য আছে। যশোদার বাৎসল্য জীবন্ত
বাৎসল্য, কেন না হাজার হইলেও কৃষ্ণ
নিজের পুত্র নহে। সুতরাং এ বাৎ-
সল্যের সঙ্গে আশঙ্কা আছে। যশোদা
পুত্রহীন। কৃষ্ণ তাঁহার বহু আরাধনার
ধন—বহু আরাধনার যাহা লাভ হয়
তাহার জন্য আশঙ্কাও অধিক। জন্মান্ত
যদি চক্ষু পায়, তাহার পক্ষে চক্ষু বড়
আদরের ধন। অন্ধকারের মধ্যে যে আ-
লোক পাইয়াছে, তাহার আলোক বড় অ-
মূল্য। গোপীজনাদিগের অমুরাগ জীবন্ত,
কেন না এ রস পরকীয়,* সুতরাং উগ্র,
তীব্র এবং বেগবান। রাধিকার ভাল-
বাসাও জীবন্ত, কেন না এ প্রণয়ের ভিত্তি
ভর আছে, লজ্জা আছে, বিপদ আছে,
কলঙ্ক আছে, লুকাচুরি আছে। বৈষ্ণব-
ধর্মের অন্তর্গত সকল ভাবই জীবন্ত।
বৈষ্ণবধর্ম প্রেমের ধর্ম, আগা গোড়া
সবই মধুর, সবই সুন্দর, সবই কোমল।
বঙ্গীয় কবিকুলতিলকগণ এই রসে মজি-
লেন; এষ্ট তরল ধর্মের উপর কবি-
শ্বেত তরলতা ঢালিলেন—যাহা মধুর,
সুন্দর, কোমল, তাহার উপর আরও

* পূর্বতন আলঙ্কারিকেরা স্বকীয়
নায়িকাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু
বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদিগের মতে পরকী-
র্যাই প্রধান স্থলাভিষিক্ত।

‘অলঙ্কারকৌজল’ দেখ।

মাধুর্য্য, আরও সৌন্দর্য্য, আরও কোমলতা
চাপাইলেন; চাপাইরা, কৃষ্ণরাধিকার
প্রণয়ে এক অপূর্ব মৌহিনীশক্তি দিলেন।
রাধিকার তু কথাই নাট, কৃষ্ণও এক
অপূর্ব জিনিষ হইয়া উঠিলেন। কখন
যোগী সাজিয়া রাধিকার কুঞ্জে প্রেমভিক্ষা
করিলেন, কখন রাধিকার মুখ রাধিবার
জন্য শাশা সাজিলেন, এবং স্বয়ং যোগী
হইয়া স্বয়ংই বৈরা হইলেন; আবার
কখন মনের বেগে পায়ে ধরিয়া কাঁদি-
লেন,—

তুমি মম জীবনঃ তুমি মম ভূষণঃ

তুমি মম ভবজলধিরত্নঃ।

রাধিকা কখন গুরুনানে মাতিয়া কৃষ্ণকে
ভৎসনা করিলেন,

হরি হরি! যাতি মাধব বাহি কেশব মা

বল কৈতববাদঃ

তামসুসর সরগীকহলোচন যা তব হরতি
বিবাদঃ।

কখন আবার প্রেমে বিভোর হইয়া
আদর করিলেন,

তুমি আমার

পরঃ অধিক, হিয়ার পুত্ৰগী,

এ ছুটি আঁখির তারা।

একজন কবি, অমূল্য মধুর-নিবর-
করিত কোকিল-কুজিত বৃঞ্জকূটীর সাজা-
ইলেন, তাহার চতুর্দিক সরস বস-
ন্তের শোভাপূর্ণ করিলেন, তাহার ভিতর
ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল মল্লর
সমীরকে মৃদু সঞ্চালিত করিলেন—
হরি এইখানে বসন্তোৎসব করিবেন।

ছরি বসন্তোৎসব করিলেন না, প্রণয়োৎসবে ভঙ্গ দিয়া দূবে গেলেন। কৃষ্ণপ্রেম পাগলিনী সেই কোমল মলয় স্রমীরে অধিক নৈরাশ্যকাতর স্বরে কাঁদিলেন—
কহত কহত সখি, বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশের
নাগরী পাইয়া, নাগর স্ত্রী ভেল,
হামারি বৃকে দিয়া শেল রে ॥

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ, প্রণয়িযুগলকে এইরূপে হাসাইয়া, এইরূপে কাঁদাইয়া, এইরূপ ভালবাসাইয়া বৈষ্ণব ধর্মকে এক অপূর্ব রস করিয়া রাখিলেন। সে রস যদিও দেবদেবী লইয়া, তবু তাহা সাধারণ লোকের সম্বন্ধকক্ষাতীত নহে, কেন না অমন স্তম্ভ, অমন হুঃখ, অমন হাসি, অমন কান্না সকলেরই আছে। দেব দেবীর নাম মাত্র, নতুবা বৈষ্ণব কবির মানব-হৃদয়ের ভঙ্গী সকল চিত্রিত করিয়াছেন। যে বেগ বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্যে, সে বেগ তোমার আমার হৃদয়েও আছে, তবে কি না আমরা তেমন করিয়া বলিতে জানি না। সকল হৃদয়ে আছে বলিয়া, সকলেই সে রস বুঝে, সকলের সঙ্গেই ইহার সম্বন্ধ আছে। চৈতন্যদেব আসিয়া সেই রসের তবঙ্গ তুলিলেন এবং সেই তরঙ্গে সমস্ত বঙ্গদেশকে নাচাইলেন। নগরে, গ্রামে, পল্লীতে, পাড়ায়, গৃহে, সেই রসের বিস্তার হইল। পৌত্তলিকতা মাত্রই কবির ধর্ম। যে দেশে

পৌত্তলিকতা আছে সেই দেশেরই লোক ক্রিয়ৎপরিমাণে কবি। যে দেশে পৌত্তলিকতার অন্নতা অথবা অভাব লক্ষিত হয়, সেই দেশেই পরিমাণমুখ্য কবিত্বের অন্নতা অথবা অভাব দেখা যায়। কোন মনুষ্যই একেবারে কবিত্বে বঞ্চিত হইতে পারে না; আজি পর্যন্ত সংসারে এমন কোন ধর্মও প্রচারিত হয় নাই, যাহার তিতর পৌত্তলিকতা নাই অথবা কালে পৌত্তলিকতায় পরিণত হয় নাই। বলিয়াছি ত, পৌত্তলিকতা কবির ধর্ম; তাহাতে বৈষ্ণব ধর্মের নাম কবিত্ব পরিপূর্ণ ধর্ম যে দেশে প্রচলিত, সে দেশের লোক যে ক্রিয়ৎপরিমাণে কবি হইবে তাহার বৈচিত্র্য কি?

আবার বৈষ্ণব ধর্ম অনুভাবকতামূলক, কেন না উহা ভক্তিপ্রধান। বঙ্গদেশের অন্যান্য সকল ধর্মই প্রায় জ্ঞানপ্রধান অথবা কর্মপ্রধান। চৈতন্যদেবকে ভক্তিমাছাঘোর উদ্ভাবন কর্তা বলিতেছি না; বোপদেব কৃত শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিপ্রধান ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যে রামানুজস্বামী এই রসের বিস্তার করিয়াছিলেন, তবে কি না চৈতন্যদেব ভক্তিরসকে ঘরে ঘরে চালাইলেন। চৈতন্যের বাহাদুরি এই পর্যন্ত। জ্ঞানকাণ্ড অথবা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অনুভাবকতাব সম্বন্ধ অল্প; কিন্তু ভক্তির সহিত উহার অতি নিকট সম্বন্ধ, কেন না ভক্তি অনুভাবকতারই মুর্ত্তিবিশেষ। অনুভাবকতার সঙ্গে কবিত্বের সম্বন্ধ অতি

নিকট; সুতরাং অল্পভাবকভাবে অশ্রুশী
লন যাহাতে হয়, তাহাতেই কবিস্বের
লাভ আছে। অতএব বাঙ্গালি যে কবি,

তাহার অনেকটা নিম্নাপ্রশংসার বৈধব্য
ধর্মের দাবি আছে।

ক্রমশঃ

চৈতন্য ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

বঙ্গদেশ দর্শন ।

১৪২৬ অথবা ২৭ শকে* উনবিংশ
বৎসব বয়ঃক্রম কালে চৈতন্য বঙ্গদেশ

* বৎসব গণনা বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ ও
যুক্তি উভয়ানুসরণ কবিয়া নির্ণীত হইল
চৈতন্য ২৩ বৎসব ১১ মাস বয়ঃক্রম
কালে গৃহত্যাগ কবেন।

চক্ৰিশ বর্ষের শেষে যেই মাঘ মাস
তবে শুক্ল পক্ষে প্রভু কৈলাস সন্ন্যাস।

তাহার জন্ম ১৪০৭ শকেব ফাল্গুন মাসে
হয় ১ম অং দেখ।

আবার চৈতন্য ভাগবতে ও চৈতন্য
চরিতামৃতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে,
চৈতন্য বঙ্গহইতে প্রত্যাগত হওয়াব
অবাবহিত পরেই গয়াধামে যাত্রা কবেন
এবং গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া চারি
বৎসবকাল গৃহে অবস্থান করেন। বঙ্গ
দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি আর
একটা কার্য্য কবেন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার
পাণিগ্রহণ। তীর্থযাত্রা ও বিবাহ নানা-
ধিক ১ বৎসর ও গৃহে অবস্থান চারি
বৎসব ২৩ বৎসর ১১ মাস হইতে বাদ
দিলে ১৮ বৎসর ও কয়েক মাস হয় এবং
তাহার জন্ম ১৪০৭ শকেব ফাল্গুন মাস।
এই জন্ম উক্তকাল ১৪২৬ অথবা ২৭।

গমন করিতে ইচ্ছা কবিলেন। গ্রীহটে
তাহার পূর্বপুরুষদিগের বাটী, (গ্রীহট
বঙ্গদেশেব অন্তঃপাতী) সুতরাং পৈতৃক
বাসস্থান দেখিতে কৌতূহল জন্মিবে তা-
হাতে আশ্চর্য্য কি? যদিও এযাত্রায়
গ্রীহট পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলেন না
তথাপি, বোধ হয়, পৈতৃক বাসস্থান
সন্দর্শনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

চৈতন্য বঙ্গদেশাভিমুখে পদব্রজে যাত্রা
করিয়া পদ্মাবতীতীরে উত্তীর্ণ হইলেন।
কিয়দবস অবস্থান কবিলেন। পদ্মাবতী
জঙ্গীপূর্বের ৬৭ ফ্রোশ উত্তর ছাপঘাটী
হইতে গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া ২২
কোদালী মোকামে ব্রহ্মপুত্রসহ মিলিত
হইয়াছে। ছাপঘাটী মুর্শিদাবাদ জিলাব
অন্তর্গত, ২২ কোদালী ঢাকা। এই বিস্তীর্ণ
পদ্মানদীতীর উপকূলের কোন স্থানে তিনি
অবস্থিত হইয়াছিলেন, চৈতন্য চরিতামৃত,
চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি
গ্রন্থে অথবা কোম নাটকাদিতে তাহার
নিদর্শন পাওয়া যায় না।

অন্যান্য প্রমাণাবলম্বন করিলে জানা যায়, অধুনা পদ্মাতীরে যত গ্রাম আছে তন্মধ্যে শাদিগাঁরদিয়াড়* ও তাহার নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম ও তাহার অপর পার্শ্বস্থিত মিরগঞ্জ† ও তাহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম সমধিক বৈষ্ণবপ্রধান এবং হয় ত শাদিগাঁরদিয়াড়েই তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রেমতলী এবং খেতরী সমধিক বৈষ্ণবপ্রধান স্থান বটে, কিন্তু অধুনা পদ্মার নিকটবর্তী হইলেও তৎকালে নিকটে ছিল না। যে হেতু বিগত ২০।২৫ বৎসর পূর্বেই প্রেমতলী হইতে পদ্মা ৩ ক্রোশের অধিক ব্যবধান ছিল, এবং প্রেমতলী পার হইয়া অপর পারে ক্রমাগত ৮।১০ ক্রোশ গমন করিলেও তাহা পদ্মার চর বোধ হয়। সুতরাং বোধ হয়, এককালে পদ্মা প্রেমতলী হইতে অনেক দূরে ছিল। বিশেষ প্রেমতলীর ২০০।৩০০ হস্ত পরেই, খেতরীর গ্রাম ক্রোশার্দ্ধ অগ্র হইতে ভুবীজ। পদ্মা ভুবীজের তাদৃশ নিকটস্থ থাকিতে পারে না। যেহেতু পদ্মার তীরের দিয়াড় এবং ভড় অতিক্রম করিলে ভুবীজ পাওয়া যায়। অপর প্রেমতলী নিকটে কুয়ারপুবে অদ্যাপি মুসলমান ও বঙ্গের প্রাচীন পালবংশীয় ভূপালদিগের যে সকল ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তদ্ব্যতীত নিশ্চয় অনুভূত হয় যে সে সকল পদ্মার তীরে গঠিত হয় নাই এবং তৎকালে পদ্মা কুমারপুর,

* জেলা মুরশিদাবাদে স্থিত।

† জেলা রাজসাহীস্থিত।

প্রেমতলী প্রভৃতি গ্রাম হইতে দূরে ছিল। তবে যে এককাল গ্রাম বৈষ্ণবপ্রধান তাহার কারণ, অম্মান ১০০বৎসর অতীত হইল গড়ের হাট পরগণায় রাজা বৈষ্ণব চূড়ামণি নরোত্তম অবস্থান করিতেন, এবং গোবিন্দ দাস কবিরাজ (কবি গোবিন্দ দাস) রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্তী বৈষ্ণবগণ (যাহারা পূর্ববর্তীদিগের অবতার বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন) তথায় অনেক সময় বাস করিতেন। নরোত্তম দাসের পূর্বে প্রেমতলী প্রভৃতি ঘোর শাক্তপ্রধান ছিল। সুতরাং চৈতন্যদেবের তথায় অবস্থান যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না, শাদিগাঁরদিয়াড় অথবা মিরগঞ্জই তাঁহার বঙ্গদেশে অবস্থানের স্থান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মিরগঞ্জে অদ্যাপি চৈত্রমাসে গঙ্গানানের দিবসে “দধি চিড়ার ফলার” করা বৈষ্ণবদিগের ও তৎপ্রদেশীয় সাধারণ লোকদিগের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বোধ আছে। সাধারণে বিশ্বাস চৈতন্য ঐ দিবসে তথায় “দধি চিড়ার ফলার” কবিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে পথিক লোকই “দধি চিড়ার ফলাব” কবিয়া থাকে, এজন্য মিরগঞ্জে চৈতন্য পথিক ও শাদিগাঁরদিয়াড়ে অবস্থিত হইয়াছিলেন ইহা অনুভূত হয়। তবে যদি কেহ কেহ এ আপত্তি কবেন শাদিগাঁরদিয়াড় উপগ্রাম হইতে ৪ ক্রোশ ব্যবধান। ইহার উত্তর স্থানে এই প্রস্তাব লেখক বলিতে পারেন, যে ১৮।১৯ বৎসর অতীত হইল তিনি

শাদিখারদিয়াড় হইতে পদ্মা ২ ক্রোশ
ব্যবধান দেখিয়াছিলেন, এই ১৮।১৯
বৎসর এপার ভাঙ্গিয়া অপর পারে ২
ক্রোশ চর প্রশস্ত হইয়াছে। সুতরাং
এককালে যে তাহা পদ্মাতীরস্থ ছিল
তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষ দিয়াড়
নামই তাহার অমোঘ প্রমাণ।

চৈতন্য বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয়া
মহানন্দে পদ্মাব জলে ক্রীড়া করিতে
লাগিলেন। পদ্মার শোভা গম্ভীর ও
ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মন
আরও প্রশস্ত হইল, কল্পনা উদ্দীপ্ত হইল,
ক্ষুতি দ্বিগুণিত হইল।

এদিকে, নবদ্বীপ হইতে একজন প-
ণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া তদেশীয়
বিদ্যা ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত ও বিদ্যা
ব্যবসায়ী বালকগণ, যাহারা বিদ্যোপার্জন
জন্য নবদ্বীপ বাইতে উদ্যত ছিল, তথায়
চৈতন্যের সহিত মিলিত হইল। বৈষ্ণব
গ্রন্থকারগণের মতে নিমাক্ষি পণ্ডিতের
নামে সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু
আমাদিগের বিবেচনায় নিমাক্ষি পণ্ডি-
তের নামে হউক বা না হউক নবদ্বীপের
পণ্ডিতের নামে বটে।

চৈতন্য বিদ্যা ও ধর্ম্ম যুগপৎ প্রচার
করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যা
বুদ্ধি ও সরল ধর্ম্মের ভাবে সকলেই মো-
হিত হইলেন। তাঁহার ছাত্র সংখ্যা
পূর্ক্সাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইল।

একদা একজন ব্রাহ্মণ পরমার্থ তত্ত্ব

জিজ্ঞাসু হইয়া তথায় আগমন করি-
লেন। চৈতন্য বলিলেন,

সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুঃ ত্রেতায়াং যযতে
মথৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যাম্মাং কলৌ তদ্ধরি-
কীর্ত্তনাং ॥

তথাহি—হবের্গাম হরের্গাম হরের্গামৈব
কেবলং।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্তথা ॥

অথমহামন্ত্র—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে
প্রেমের অঙ্কুর হয় এবং ঈশ্বরে প্রেমিক
হইলে পরম তত্ত্ব লাভ হইল। এইরূপে
কিছুকাল বঙ্গদেশে অবস্থান করিয়া চৈ-
তন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে লক্ষ্মীদেবী স্বামিবিহীনিত
ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া চৈতন্যের
বঙ্গে অবস্থান কালে প্রাণত্যাগ করি-
লেন। চৈতন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলে বন্ধু
বান্ধবগণ তাঁহারে দেখিতে আসিলেন।
চৈতন্য মাতার চরণবন্দনা করিতে যা-
ইয়া দেখেন, তিনি যারপর নাই বিষা-
দিতা ও তাঁহার মুখে বাক্যব্যয় নাই।
সুতরাং বুঝিলেন, নিশ্চিত বিশেষ অম-
ঙ্গল হইয়াছে। পরে শচী বলিলেন,
বধুমাতা পীড়িতা হইয়া প্রাণত্যাগ করি-
য়াছেন। চৈতন্য কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন
করিয়া জননীকে বলিলেন

কস্য কে পতি * * মোহ এবহি
কেবলং।

* * * * *

“ভবিতব্য যে আছে তাহা খণ্ডিবে
কেমনে।”

অতীত যে হইল দীক্ষব ইচ্ছায়।

সে হইল আর কি কার্য্য ছুখে তায় ॥

সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চৈতন্যের
এই প্রথম উক্তি। চৈতন্য ভবিষ্যাবাদী
ছিলেন, সুতরাং ইচ্ছা স্বাধীন বিশ্বাস
করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি দীক্ষব
ইচ্ছায় স্বীকার করিতেন, সাংখ্যদর্শন-
কারের জ্ঞায় উদাসীন বলিতেন না।

শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস।

নীতিকুসুমাজলি।

(এই শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন
নীতিজ্ঞ কবিকুলরচিত কবিতাকলাপ
অনুবাদিত হইবে। কোন গ্রন্থ বিশেষ
পর্যায়ানুক্রমে অনুবাদিত হইবে না—
শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণেতিহাস কাব্য প্রভৃ-
তিতে যখন যে মনোজ্ঞ-হিতকথা নয়ন-
পথে পতিত হইবে, তখন তাহারই মর্ম্মা-
নুবাদ সংকলন করা অভিপ্রায় মাত্র)

প্রথম অঞ্জলি।

১

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিষময়।
কিন্তু তাহে আছে সুধাসম ফলদয় ॥
তার এক কাব্যামৃত-রস-আস্বাদন।
অন্যতর সদালাপ সহিত সজ্জন ॥

২

ক্রমালয়, ভক্ষ্য ফল দল, পেয় জল।
তৃণনিচয়েতে শয্যা, বসন বস্ত্রল ॥

বনে ব্যাগ্র-গজ-সেবা বরং মঙ্গল।

এ ভবে বিভবহীন জীবন বিফল ॥

৩

মাণিক কুগ্রহফলে, লুঠায় চরণতলে,
কাঁচ যদি উঠে বা মাথায়।
মাণিক মাণিক রবে, কাঁচে লোক কাঁচ কবে,
থাক্ তারা যথায় তথায় ॥

৪

কাক কৃষ্ণবর্ণধর, কৃষ্ণবর্ণ পিকবর,
উভয়েই এক বর্ণ ধূক।
হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পরিচয়,
কেবা কাক কেবা পরভূত ॥

৫

ইতর পাপের ফলভোগের কারণ।
যেইরূপ ইচ্ছা তব কর নিয়োজন ॥
কিন্তু অরসিকে যেন কবিত্তে ভজনা।
লিখনা ললাটে ধাতা লিখনা লিখনা ॥

৬

ভয়ানক ভাবধর, করিরাজ কুস্তবর,
ভেদকারী কথা স্নানশচয়।

বায়ু চেয়ে বেগপতি, গিরিগৃহা গৃহপতি,
ভবু সিংহ পশু এই নয় ॥

৭

বায়সের যদি হয়, চণ্ডটি স্ববর্ণময়,
মানিকে মণ্ডিত পদময় ।

প্রতিপক্ষে গজমতি, প্রকাশে বিমলজ্যোতি,
তবু কাক রাজহংস নয় ॥

৮

কোকিল গর্জিত নহে চূতরস শিয়ে ।
ভেক মক্ মক্ করে কর্দম খাইয়ে ॥

৯

রোহিত রহিত দর্প গভীর পুরুবে ।
একাত্মল জলে পুঁঠা ছট্ ফট করে ॥

১০

মেঘাগমে স্তব্ধ যত পরভূতগণ ।
ভেক ভায়া যথা বক্তা, মোনই শোভন ॥

১১

শিখরেতে থাকে শিখী, গগনে নীবদ ।
লক্ষান্তরে দিনকর জলে কোকনদ ॥
কুমুদবান্ধব কত লক্ষান্তরে রয় ।
যে যাহার বন্ধু হয় কভু দূর নয় ॥

১২

মাতা নিন্দাপবায়ণ, পিতা প্রিয়বাদী নন,
সোদব না করে সম্ভাষণ ।

ভৃত্য রাগে কহে কত, পুত্র নহে অমুগত,
কাত্তা নাহি দেন আলিঙ্গন ॥

পাছে কিছু চাহে ধন, এই ভয়ে বন্ধুগণ,
কিছুমাত্র কথা নাহি কয় ।

ওরে ভাই একারণ, কর ধন উপার্জন,
ধনেতেই সব বশ হয় ॥

১৩

ধনেতেই অকুলীন, কুলীন কুমার ।
ধনেতেই পায় লোক আপদে নিস্তার ॥
ধন চেয়ে এসংসারে বন্ধু কেহ নয় ।
তাই ভাই কর কর ধনের সঞ্চয় ॥

১৪

ব্রহ্মহত্যা করি লোকে, পুজ্যপাদ হয় লোকে
যদি তার প্রচুর্বার্থ থাকে ।
শশিতুল্য স্নকুলীন, যদি হন ধনহীন,
কেবা বল গ্রাহ করে তাকে ॥

১৫

অতিশয় চলচিত্ত, চপল যে কিছু বিত্ত,
সুচঞ্চল জীবন যৌবন ।
সকলই চলাচল, যার আছে কীর্তিবল,
তার মাত্র অচল জীবন ॥

১৬

সেই জন সজীবন, সেইজন যশোধন,
সজীব যে জন কীর্তিমান ।
অশয় অকীর্তি যাব, জীবন কোথায় তার,
বৈচে থাকা মৃত্যব সমান ॥

১৭

কখন সঙ্কট, কখন বা রুট,
তুট রুট ক্ষণে ক্ষণে ।
হেন মতিচ্ছন্ন, হল্যোও প্রসন্ন
ভয়ঙ্কর মানি মনে ॥

১৮

গ্রন্থগত বিদ্যা, পবনস্তগত ধন ।
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হল্যো প্রয়োজন ।

১৯

উদ্যোগী পুরুষসিংহে লক্ষীর আশন ।
কাপুরুষে কহে দৈব ধনদাতা হন ॥

টদব দূর করে, আশ্ব-শক্তি কর সার।

যত্নে সিদ্ধ না হইলে দোষ বল কার ॥

২০

সম্পদে কর্কশ, খলের মানস,

আপদেই সুকোমল।

সুশীতল পয়,* সুকঠিন হয়,

কিছু মৃদু তপ্ত জল ॥

২১

গুণীর যে গুণ তাহা জানে গুণধর।

অন্যে কভু নাহি জানে সে গুণনিকর ॥

মালতী মল্লিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন।

নাসিকাই জানে কভু না জানে লোচন ॥

২২

ক্ষোভের যাতনা সহ্যে সাধুশীল নর।

সহিতে না পারে কভু ইতর পামর ॥

মহা শাণ বর্ষণেতে হীরাই সক্ষম।

চড়াইলে চূর্ণ হয় চামড়া অধম ॥

২৩

স্বজাতীয় বিনা বৈরি পরাভূত নয়।

হীরাতেই ছিদ্র করে মণি মুক্তা চয় ॥

২৪

অতিশয় ক্ষুদ্র নরে, যে হিত সাধনা করে,

মহতেও তাহা নাহি পারে।

পান করি কুপপয়, প্রায় তুষা শাস্ত হয়,

বারিধি কি পিপাসা নিবারে ?

২৫

এক ভূমি জাত, ঐক্য কাণ্ড আর দলে।

কেবা শালি, কেবা শ্যামা, পরিচয় ফলে ॥

২৬

মুখভরি অন্ন দিলে কে না বশ হন।

মৃদঙ্গে মধুর ধ্বনি অর্পিলে ক্ষীরণ ॥

* কর্কর প্রভৃতি।

২৭

রত্নাকরে আছে রত্ন তাহে কিবা হয়।

তাহে বা কি বিদ্যাচলে আছে করিচয় ॥

কি ফল মলয়াচলে চন্দন কানন।

পরের হিতেই শুদ্ধ সাধুজন-ধন ॥

২৮

বিকসিত বকুল মুকুলে যেই জন।

তুষাতেও না করিত চরণ চারণ ॥

আহা আহা হা বিধাতা সেই মধুকরী।

বিশদে পড়িয়া সার করিলা বদরী ॥

২৯

পিপাসায় গিয়ে আমি সিদ্ধ সন্নিধান।

শুদ্ধ এক গণ্ডুষ করিছু জল পান ॥

জলধির দোষমাত্র তাহে কিছু নাই।

আমারি কর্ণের ফল ফলিয়াছে ভাই ॥

৩০

কি ফল নির্ঝাণ দীপে তৈল দান করা।

চোর গতে সাবধান কিসে যায় ধরা ॥

কি ফল কামিনী-কেলি সমাগতে জরা।

কি ফল প্রবাহ-গতে আলী বন্ধ করা ॥

৩১

বরং অসিধারে কিম্বা তরুতলে বাস।

বরং ভিক্ষাকরা ভাল, কিম্বা উপবাস ॥

বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন।

তথাপি লয়োনো গর্বী জ্ঞাতির শরণ ॥

৩২

কুন্ডনের সেবা আর কুগ্রামে নিবাস।

কুভোজন, ক্রোধমুখী ভার্যা সহবাস ॥

*বিধবা ভ্রমরা আর বিদ্যাহীন স্ত্রী।

অনল বিরহে তহু করে ভস্মীভূত ॥

৩৩

পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর ।
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমল নিকর ॥
অচল সচল হয় অনল শীতল ।
তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল ।

৩৪

যথা নারিকেল ফল, গর্ভে সঞ্চরয়ে জল,
সে রূপ লক্ষ্মীর আগমন ।
গজভুক্ত কথবেল, সে রূপ লক্ষ্মীর খেল,
পলায়ন করেন যখন ॥

৩৫

অতি রমণীয় কার্যে পিশুন যোজন ।
সবিশেষ যত্নে করে দোষ অবেষণ ॥
যথা অতি রমণীয় চারু কলেবরে ।
ত্রণ অবেষণ করে মক্ষিকা নিকরে ॥

৩৬

সঙ্গুণীর যত গুণ, বর্ণনায় স্ননিপুণ,
যিনি হন সাধু সদাশয় ।
নব চূতাকুররস, পান করি হয়ে বশ,
কোকিল ললিত কুহরয় ॥

৩৭

সতের সদগুণ, দুর্জন পিশুন,
ক্ষণেকে দূষিত করে ।
যথা ধূম রাশি, বিমলতা নাশি,
মলিন করে অশ্বরে ॥

৩৮

যত্র দোষচয়, প্রকটিত হয়,
বিভাত না হয় গুণ ।
চক্রে মৃগরেখা, স্পষ্ট যায় দেখা,
প্রসন্নতা তাহে ন্যূন ॥

৩৯

কাম ক্রোধজাত দোষ বিবেকে বিলয় ।
ভাহুর কিরণে মাত্র নিশাতমঃ ক্ষয় ॥

৪০

উপদেশ উপযুক্ত পাত্র বুদ্ধিমান ।
বিফল নির্বোধ জড়ে উপদেশ দান ।
কুসুম সুরতি তিল করে আকর্ষণ ॥
যব তাহে ক্ষমবান্ নহে কদাচন ।

৪১

মরণেই সদগুণীর গুণের প্রচার ।
পুড়িলে চন্দন কাষ্ঠ সৌরভ বিস্তার ॥

৪২

দুষ্টের দৌর্জনা চয়, কখন কি গত হয়,
কি করে বা উত্তম আকরে ।
জনমিয়া রত্নাকরে, প্রাণিগণ প্রাণ হরে,
কালকূট বিষ ভয়ঙ্করে ।

৪৩

উদ্যোগ বিহনে ধন না হয় অর্জন ।
ক্ষীরোদ মথিয়া স্রুধা পিয়ে সুরগণ ॥

৪৪

আপদেও অবিকৃত স্বভাব সাধুর ।
পাবকে পড়িয়া গন্ধ বিতরে কপূর ॥

৪৫

আপং সময়ে সাধু আরো শোভাকর ।
রাহগ্রস্ত স্রুধাকর দ্বিগুণ স্নন্দর ॥

৪৬

যদি একগুণে কতু পদাশূন্য হয় ।
আবর্জনা পরিপূর্ণ হয় বিশ্বময় ॥
তবে কি মৃণাল ভোজী রাজহংস গণ ।
কুস্কৃটের প্রায় করে মল অবেষণ ॥

৪৭

মদ যুক্ত মাতঙ্গের মস্তক উপরে ।
সিংহ শিশু পড়ে গিয়া মহা ঘোর স্বরে ॥
প্রকৃতিতে জ্ঞাত এই স্বপ্ন মহাধন ।
বয়সের ধর্ম ইহা নহে ত কখন ॥

৪৮

সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি ।
দশবাহু, সপ্তসিংহ, তিন হস্তী সনে ।
অবহেলে পরাতুত করিয়াছি রণে ॥

তোমাতে আমাতে অদ্য হইবে সমর ।
দেখুন দেখুন আসি যতেক অমর ॥

শূকরের প্রতি সিংহের উক্তি ।
যা রে যা বিহিত দূরে শূকর নন্দন ।
সিংহজয়ী বলি বৃথা কর আশ্রয়ন ॥
সিংহ শূকরের বলে ভেদ কত দূর ।
ভালমতে জ্ঞাত যত পণ্ডিত ঠাকুর ॥
ক্রমশঃ

কৃষ্ণকান্তের উইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরিদ্রাগ্রামে একঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী; তাঁহার জমীদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জন করেন। উভয় ভ্রাতার পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কল্পনাকালে জন্মে নাই—যে তিনি অপর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্তভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল—তাঁহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে২ সন্দেহ হইল যে উভয়ের উপার্জিত বিষয়, একের নামে

আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাঁহার লেখাপড়া করা কর্তব্য। কেন না যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে কৃষ্ণকান্ত কখন প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অত্যাচারণ করার সম্ভাবনা নাই তথাচ কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে তাঁহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজন বশতঃ তালুক গেলে সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিনাষ করিতেন, যে ভ্রাতৃপুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে

আপম সংসারে আপন পুলদিগের সহিত সমান ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এবং উইল করিয়া, আপনাদিগের উপার্জিত সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ ত্রায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বায়েব দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল; কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যাব নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে তাহার পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা, সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্দাস্ত। পিতার অবাধ্য এবং দুর্মুখ। বাঙ্গালির উইল কখন গোপনে থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল, দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল,

“এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্ধেক ভাগ পাইল আর আমরা তিন আনা?”

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, “ইহা ন্যায্য হইয়াছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।”

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য টা কি? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে? আর মা বহিন কে আমরা প্রতিপালন করিব—তাহাদিগের বা একই আনা কেন? বরং তাহাদিগকে কেবল

গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া লিখিয়া যাম।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বাপু হরলাল! বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার বাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া যাইব।”

হর। আপনার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে—আপনাকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিব না।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিলেন,

“হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে আজি তোমাকে গুরুমহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।”

হর। আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের দাড়ি পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এ-দ্বন্দ্বেরে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর বিরক্তি করিলেন না। স্বহস্তে লিপিকৃত উইল খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্তে নূতন এক খানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কন্যা এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনামাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই।

“কলিকাতার পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

আমি মানস করিয়াছি যে একটা বিধবা বিবাহ করিব। আপনি যদিও উইল পরিবর্তন করিয়া আমাকে ১০ আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজিষ্টারি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব নচেৎ শীঘ্র একটা বিধবাবিবাহ করিব।”

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া উইল পরিবর্তন করিয়া হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন,

“তুমি আমার তাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট বাতীত ইচ্ছা হইবে না।”

ইহার কিছু পরেই হরলাল সম্বাদ পাঠাইলেন যে তিনি বিধবাবিবাহ করি যাছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইল খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল করিবেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে একজন নিরীহ ভাল মানুষ লোক বাস করিতেন। কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে একটু দূর সম্বন্ধ ছিল, এজন্য ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণকান্তকে জ্যেষ্ঠা মহাশয় বলিতেন। এবং তৎকর্তৃক অমুগ্ধীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রহ্মানন্দের হস্তাক্ষর উত্তম। এসকল

লেখা পড়া তাঁহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেই দিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, যে “আহারাদির পর এখানে আসিও। নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।”

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন “আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে?”

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, “এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।”

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তি নিই যেন অপরাধী। কিন্তু তাঁহার একটা পুত্র আছে—সে শিশু, নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে।

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।
বিনোদ। এক পাই বথরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বথরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কর্ত্তা কোন মতে মতান্তর করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মানন্দ স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, এমন সময়ে বিশ্বমাপন্ন হইয়া দেখিলেন, যে হরলাল রায়।

হরলাল আসিয়া তাঁহার শিওরে বসিলেন।

ব্রহ্মা। সে কি, বড় বাবু যে? কখন বাড়ী এলে?

হর। বাড়ী এখন যাই নাই।

ব্র। একেবারে এই খানেই? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছে?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। দুই দিন কোনস্থানে লুকাইয়াছিলাম। আবার নাকি নূতন উইল হইবে?

ব্র। এই রকম ত শুন্তেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শূন্য।

ব্র। কর্ত্তা এখন রাগ কর্যে তাই বলছেন কিন্তু সেটা থাকবেনা।

হর। আজি বিকালে লেখা পড়া হবে? তুমি লিখিবে?

ব্র। তা কি করব ভাই? কর্ত্তা বলিলে ত না বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি? এখন কিছু রোজগার করিবে?

ব্র। কিলটে চড়টা? তা ভাই মার না কেন?

হর। তা নয়; হাজার টাকা।

ব্র। বিধবা বিয়ে কর্যে নাকি?

হর। তাই।

ব্র। বয়স গেছে।

হর। তবে আর একটা কাজ বলি। এখনই আরম্ভ কর। আগামী কিছু গ্রহণ কর।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচ পত টাকা নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাইয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল। বলিল, “ইহা লইয়া আমি কি করিব?”

হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

হর। গোয়ালী কোয়ালার কোন এলেকা রাখি না। কিন্তু আমার করিতে হইবে কি?

হর। দুইটি কলম কাট। দুইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই—যা বল তাই শুনি।

এই বলিয়া ঘোষজ মহাশয় দুইটি নূতন কলম লইয়া ঠিক সমান করিয়া কাটিলেন। এবং লিখিয়া দেখিলেন যে দুইটিরই লেখা এক প্রকার দেখিতে হয়।

তখন হরলাল বলিলেন ইহাব একটি কলম বাস্তবে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখা পড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে?

ব্রহ্মানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিল,

“ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।”

ব্র। তোমাদিগের বাড়ীতে কি দোওয়াত কলম নাই যে আমি ঘাড়ে করিয়া নিয়া যাব?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে

—নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন?

ব্র। আমিও তাই ভাবিতেছি—বটে—
ভাল বলেছ ভাইরে।

হর। তুমি দোওয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে আলি এটা কেন? তুমি সরকারিকালি কলমকে গালি পাড়িও তাহা হইলেই শোধরাইবে।

ব্র। তা সরকারি কালি কলমকে শুধু কেন? সরকারকে শুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব।

হর। তত আবশ্যক নাই। এক্ষণে আসল কর্ম আরম্ভ কর।

তখন হরলাল দুইখানি জেনেরাল লেটার কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন,

“এয়ে সরকারি কাগজ দেখিতে পাই।”

“সরকারি নহে—কিন্তু উকীলের বাড়ীর লেখা পড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্ত্তাও এইরূপ কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি। এজন্যে এই কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। বাহা বলি তাহা এই কালি কলমে লেখ।”

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই। কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাঁহার নামে যত সম্পত্তি আছে তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা, বিনোদ

লাল তিন আনা, গোবিন্দলাল একপাই; গৃহিণী এক পাই; শৈলবতী এক পাই; হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বার আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, “এখন ত উইল লেখা হইল—দস্তখত করে কে?”

“আমি।” বলিয়া হরলাল ঐ উইল কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারিজন সাক্ষির দস্তখত করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, “ভাল, এত ভাল হইল।”

হর। এই সঁজা উইল হইল, বৈকালে যাহা লিখিবে সেই ভাল।

ব্র। কি সে?

হর। তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে তখন এই উইল খানি আপনার পিরানের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালি কলমে তাঁহার ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই; হুঁহুং দুই খানি উইলই দেখিতে একপ্রকার হইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনিও দস্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্য লইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইল খানি বদলাইয়া লইবে। এই খানি কর্ত্তাকে দিয়া কর্ত্তার উইল খানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল।

বলিল, “বলিলে কি হয়—বুদ্ধির খেলটা খেলোছ ভাল।”

হর। ভাবিতেছ কি?

ত্র। ইচ্ছা করে বটে কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু জ্বালের মধ্যে থাকিব না।

“টাকা দাও।” বলিয়া হরলাল হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিল। নোট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতে ছিল। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া বলিল,

“বলি ভায়া কি গেলে?”

“না” বলিয়া হরলাল ফিরিল।

ত্র। তুমি এখন পাঁচশত টাকা দিলে। আর কি দিবে?

হর। তুমি সে উইল খানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দিব।

ত্র। অনেকটা—টাকা—লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হইলে?

ত্র। রাজি না হইয়াই বা কি করি। কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে পাইবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লই-তেছি তুমি দেখ দেখি টের পাও কি না।

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্ত কৌশল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইল খানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া তাহাতে লিখিবার উপক্রম

করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কিপ্রকারে আসিল; ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ হরলালের হস্তকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, “এই কৌশলটি তোমাষ শিখাইয়া দিব।” এই বলিয়া হরলাল, সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

ছুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হরলাল কহিল যে আমি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব। বলিয়া সে বিদায় হইল।

হরলাল চলিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দের বিষম ভয়সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে তিনি যে কার্যে স্বীকৃত হইয়াছেন তাহা রাজদ্বারে মহাদণ্ডার্থ অপরাধ—কি জানি ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়? আবার বদলের সময়ে যদি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি একার্থ্য কেন করেন? না করিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতে নহ।

হায়! ফলাহার! কত দরিদ্রব্রাহ্মণকে তুমি মর্মান্তিক পীড়া দিয়াছ! এদিকে সংক্রামক জ্বর প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত! তখন, কাংস্তপাত্র বা কদলীপত্রে স্তম্ভোভিত, লুচি-সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ, প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন ক-

রিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে না আহা করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাঞ্জের নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এ কুট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না—এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া—অন্যমনে—পরদ্রব্য গুলি উদর সাৎ করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়েব ঠিক তাই হইল। হবলালের এটাকা হজম করা ভার—জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ কবাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বড় হজমের ভয়ও বড়! ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা কবিত্তে পারিল না। মীমাংসা কবিত্তে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাব পব ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কি হইল?”

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,

“মনে করি টান্দা ধরি হাতে দিই পেড়ে।

বালা গাছে হাত লেগে আঁচল গেল ছিঁড়ে।”

হর। পার নাই নাকি?

হর। তাই কেমন বাঁধে ঠেকিতে লাগিল।

হর। পার নাই?

হর। না ভাই—এই ভাই তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা নাও। এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাস্তব হইতে পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিবক্ষিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন,

“মুর্থ, অকর্ম্ম! জ্বীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না। আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও যদি তোমাহইতে এই কথার বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায় তবে তোমার জীবন সংশয়।”

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, “সে ভাবনা করিও না; কথা আমার নিকট প্রকাশ পাইবে না।”

এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটি জ্বীলোক তাঁহার সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কে ও?”

জ্বীলোকটা ছুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, “দাসী।”

হর। কে ও যোহিনী?

জ্বীলোকটা বলিল, “আজ্ঞে।”

যোহিনী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্যা। তাহাকে যুবতী বলিতে হইবে। তাহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়া-

ছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতিবৎসর মাত্র দেখাইত। রোহিনী পরমাসুন্দরী; সুন্দরী বলিয়া পল্লীতে তাহার খ্যাতি ছিল। সে অল্প বয়সে বিধবা হইরাছিল, কিন্তু বৈধবোর অল্পপযোগী অনেক গুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান খাইত, নির্জল একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে সে মাছও খাইত। মখন পাড়ায় বিধবাবিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাড় পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।

পক্ষান্তরে তাহার অনেক গুণও ছিল। রন্ধনে সে দ্রোণদী বিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অন্ন, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা, ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলপানা, খয়েরের গহনা, ফুলের থেলনা, হুচের কাজে, তুলনা রহিত। চুল বাধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। পল্লীর মেয়েরা যেখানে লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মজলিস করিত, রোহিনী সেখানে আখড়া ধারী—টপ্পা, শ্যামাবিষয়, কীর্তন, পাঁচালি, কবি, রোহিনীর কণ্ঠাগ্রে। শুনাগিয়াছে, রোহিনী “ছিটা ফোটা তত্ত্ব মত্ত্ব” অনেক আনিত। স্ততরাং মেয়েমহলে রোহিনীর পশারের সীমা ছিল না। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটতে থাকিত। ব্রহ্মানন্দের গৃহ শূন্য; রোহিনী তাহার ঘরের গৃহিণী ছিল।

দুই চারিটা মিষ্ট কথার পর রোহিনী ভিজ্ঞাসা করিল,

“কাকার কাছে যে অন্য আসিয়া ছিলেন, তাহার কি হইল?”

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন “কিজন্য আসিয়াছিলাম?”

রোহিনী হাসিয়া মুহূর্ত্ত শ্লোক বলিল,
যাওঁ আর কেলেসোনা, কাজ কি
সোহাগ বাড়িয়ে।
শুনেছি সব মনের কথা, বেড়ার গোড়ার
দাঁড়িয়ে ॥

হরলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,
“বটে! তোমার অসাধ্য কৰ্ম্ম নাই।
এখন কি একটা নূতন রোজগারের পস্থা
হইল?”

রো। হইল বই কি।
হর। কার কাছে—কর্ত্তার কাছে এ
কথা যাবে না কি?
রো। রোজগার বড় বাবুর কাছেই
হবে।

হর। কি রূপে?
রো। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা
দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া
দিব।

হরলাল বিস্মিত হইলেন; বলিলেন
“সে কি রোহিনি?” পরে কহিলেন,
“আশ্চর্য্যই বা কি? তোমার অসাধ্য
কৰ্ম্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল
বদলাইবে?”

রো। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে

নাহি বা বলিলাম। না পারি আপনার
টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন।

হর। ফেরৎ? তবে কি টাকা আগামী
দিতে হবে নাকি?

রো। সব।

হর। কেন, এত অবিশ্বাস কেন?

রো। আপনিই বা আমার অবিশ্বাস
করেন কেন?

হর। কবে এটা পারবে?

রো। আজকেই। রাত্র তৃতীয় প্রহবে
এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

হরলাল বলিলেন, “ভাল,” এই ব-
লিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার
টাকার নোট গণিয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঐ দিবস রাত্র চটার সময়ে কৃষ্ণকান্ত
রায় আপন শয়ন মন্দিরে পর্যাঙ্কে বসিয়া
উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া শটকায়
তামাক টানিতে ছিলেন, এবং সংসারে
একমাত্র ঔষধ!—মাদক মধ্যে শ্রেষ্ঠ!
অহিফেন ওবফে আফিমের নেসায় মিঠে
রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে
ঝিমাইতে থেয়াল দেখিতেছিলেন যেন
উইল খানি হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া
গিয়াছে। যেন হরলাল তিনটাকা তের
আনা ছকড়া ছক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমু-
দায় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার
যেন কে বলিয়া দিল, যে না এ দানপত্র
নহে, এ তমস্কক। তখনই যেন দেখি-

লেন যেন ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া
বৃষভাক্ষর মহাদেবের কাছে এক কোঁটা
আফিম কর্জ লইয়া এই দলিল লিখিয়া
দিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন
—মহাদেব গাঁজার খোঁকে ফোরকোজ
করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমত সময়ে,
রোহিণী ধীরেই সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ
করিয়া বলিল, “ঠাকুরদাদা কি ঘুমাই-
য়াছ?”

কৃষ্ণকান্ত রায় ঝিমাইতে ঝিমাইতে
কহিলেন, “কে নন্দী? ঠাকুরকে এই-
বেলা ফোরকোজ করিতে বল।”

রোহিণী বুঝিল, যে কৃষ্ণকান্তের আফি-
মের আমল আসিয়াছে। হাসিয়া বলিল,
“ঠাকুরদাদা, নন্দী কে?”

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন,
“হঁম্-ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনে গোয়াল
বাড়ী মাথম খেয়েছে—আজও তার কড়ি
দেয় নাই।”

রোহিণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া
উঠিল। তখন কৃষ্ণকান্তের চমক হইল,
মাথা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, “কে ও,
অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী?”

রোহিণী উত্তর করিল, “মৃগশিরা
আর্দ্রা পুনর্কস্তু পুষ্যা।”

কৃষ্ণ। অশ্লেষা মঘা পূর্বফল্গুনী।

রো। ঠাকুরদাদা আমি কি তোমার
কাছে ভ্রোয়ান্তি শিখতে এয়েছি!

কৃষ্ণ। তাইত! তবে কি মনে করিয়া?
আফিম চাই না ত?

রো। যে সামগ্রী প্রাপ্যদ্বয়ে দিতে

পারবে না, তার জন্যে কি আমি এসেছি! আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

ক। এই এই! তবে আকিঙ্গেরই জন্য!

রো। না, ঠাকুরদাদা, না। তোমাব দিয়া আকিঙ্গ চাই না। কাকা বল্লেন যে যে উইল আজ লেখা পড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয় নাই।

কৃষ্ণ। সে কি, আমার বেস মনে পড়িতেছে যে আমি দস্তখত করিয়াছি।

রো। না, কাকা কহিলেন যে তাঁহার যেন অরণ হচ্ছে তুমি তাতে দস্তখত কর নাই; ভাল, সন্দেহ রাখায় দরকার কি? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না।

কৃষ্ণ। বটে—তবে আলোটা ধব দেখি, বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানেব নিয় হইতে একটা চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাত বাস্ক খুলিয়া বিচিত্র একটি চাবি লইয়া পরে একটা চেষ্টা ডুয়ারের একটা দেয়াল খুলিলেন এবং অমূল্যমান করিয়া ঐ উইল বাহিব করিলেন। পরে বাস্ক হইতে চস্মা বাহির করিয়া, নাসিকার উপর সংস্থাপনের উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চস্মা লাগাইতেই দুইচারিবার আকিঙ্গের ঝিম-ঝিম আসিল—স্বতরাং তাহাতে কিছু কাল বিলম্ব হইল। পরিশেষে চস্মা স্থির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্র-

পাত করিয়া দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, “রোহিণী, আমি কি এতই বুড় হইয়াছি? এই দেখ আমার দস্তখত।”

রোহিণী বলিল, “বালাই বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতিমী বল বই ত না। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।”

রোহিণীর যে অভিপ্রায় তাহা সিদ্ধ হইল। কৃষ্ণকান্তের উইল কোথায় আছে, তাহা জানিয়া গেল। রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়ন মন্দির হইতে নিষ্কান্ত হইল।

* * * *

গভীর নিশাতে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতে-ছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন, যে তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জলিতেছে না। সচবাচর সমস্তরাত্র দীপ জলিত কিন্তু সে রাত্রি দীপ নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছে দেখিলেন। নিদ্রাভঙ্গকালে এমতও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমতও বোধ হইল যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। মানুষ তাহার পর্য্যবেক্ষণ শিবোদেশ পর্য্যন্ত আসিল—তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিসেব মেশায় বিভোর, না নিদ্রিত, না জাগরিত, বড় কিছু স্বদৃশ্য করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলোক নাই—তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখন অর্ধ নিদ্রিত—কখন অর্ধ সচেতন—সচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার

দৈবাৎ চক্ষু খুলিবার, কতকটা অন্ধকার বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন মনে করিতেছিলেন, যে তিনি হরিষ্যোষের মোকদ্দামায় জাল দলিল দাখিল করায়, জেলখানায় গিয়াছেন। জেলখানা ঘোরা-
ন্ধকার! কিছু পরে হঠাৎ যেন চাবি খোলার শব্দ অল্প কানে গেল—একি জেলের চাবি পড়িল? হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত শট্কা হাতড়াইলেন, পাইলেন না—অভ্যাস বশতঃ ডাকিলেন, “হরি।”

কৃষ্ণকান্ত অস্ত্রপূরে শয়ন করিতেন না—বহির্কোণেতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক একজন খানসামা তাঁহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, “হরি।”

হরি তখন মতি গোয়ালিনীর গৃহে সেই বহুবিলাসিনী স্ত্রন্দরীকে কেবল হরিমাত্র পরায়ণা মনে করিয়া তাহার সতীত্বের প্রশংসা করিতেছিলেন। সেও রোহিণীর কোশল! নহিলে দ্বার খোলা থাকে না। এদিকে কৃষ্ণকান্ত বারেক মাত্র হরিকে ডাকিয়া, আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল, তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবনবে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরি-
বর্তে স্থাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুপ্তা স্ত্রন্দরীর প্রথম নিদ্রাভঙ্গে নয়-
নোন্মীলনবৎ, পৃথিবী মণ্ডলে প্রভাতো-
দয় হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মানন্দ ঘো-
ষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত
হরলাল কথোপকথন কবিতেছিল—যেন
পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবর মধ্যে সর্প-
দম্পতী গরল উদগীর্ণ করিতেছিল। কৃষ্ণ-
কান্তের যথার্থ উইল রোহিণীর হস্তে।

হরলাল বলিল, “তারপর, আমাকে
উইল খানি দাও না।”

রোহিণী। সে কথা ত বলিয়াছি,
উইলখানি আমার নিকট থাকিবে।

হরলাল তর্জন গর্জন করিয়া বলিলেন,
“তোমার পুরস্কার তোমাকে দিয়াছি।
এখন ও উইল আমার।”

বো। আপনারই রহিল, কিন্তু আমার
কাছে থাকুক না কেন? আমি ত চির-
দিন আপনারই আশ্রয়কারী। ইহা আর
কাহারও হস্তে যাইবে না বা আর কেহ
দেখিতে পাইবে না।

হব। তুমি স্বীলোক—কোথায় রাখিবে
কাহার হাতে পড়িবে, উভয়েই মারা
যাইব।

রো। আমি উইল এমত স্থানে রা-
খিব, যে অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি
না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না।

হর। তোমার ইচ্ছা যে তুমি ইহার
দ্বারা আমাকে হস্তগত রাখ—না, কি
গোবিন্দনাথের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর।

যো। গোবিন্দলালের মুখে আগুন!
আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না।

হর। আর যদি কোন প্রকারে আমি
কর্তাকে জানাই যে রোহিণী তাঁহার স্বরে
চুরি করিয়াছে।

যো। আমি তাহা হইলে কর্তার
নিকট এই উইল খানি ফিরাইয়া দিব।
আর বলিব যে আমি এই উইল ব্যতীত
কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড় বাবুর
কথায় করিয়াছি। তাহাতে বড় বাবুর
উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপ-
নিই বিবেচনা করুন। স্মরণ করিয়া
দেখুন আসল উইলে আপনার শূন্য
ভাগ; আমাকে থানায় যাইতে হয়
আমি মহৎ সঙ্গে যাইব।

হরলাল ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া

রোহিণীর হস্তধারণ করিলেন। এবং
বলে উইল খানি কাড়িয়া লইবার
উদ্যোগ করিলেন। রোহিণী তখন
উইল তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিয়া
বলিলেন,

“ইচ্ছা হয় আপনি উইল লইয়া
বাউন। আমি কর্তার নিকট সম্বাদ
দিই যে তাঁহার উইল চুরি গিয়াছে—
তিনি নূতন উইল করুন।”

হরলাল পরাস্ত হইলেন। তিনি ক্রোধে
উইল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন,

“তবে অধঃপাতে যাও।”

এই বলিয়া হরলাল সেস্থান হইতে
প্রস্থান করিলেন। রোহিণী উইল লইয়া
নিজালয়ে প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ



শৈশবসহচরী।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নিশাচরহর।

একদা রাজি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে এক
ব্যক্তি দ্রুতপাদবিক্ষেপে স্বর্ণপুর গ্রামের
যে পল্লীতে হরিনাথ মুখো বাস করেন,
সেই পল্লীতে যাইতেছিলেন। মাঘ মাস,
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাজ অন্ধকার, কো-
লের মানুষ দেখা যায় না—অতি প্রবল
উত্তর বাতাসে পথিক শীতপীড়িত হইয়া
মধ্যে গাঢ় বসনধারা মুখের কিয়দংশ

আবরণ করিতেছিলেন। পথিক কিঞ্চিৎ
দূর যাইয়া রাজপথ ত্যাগ করিয়া একটি
অতি অপ্রশস্ত গলি পথ দিয়া চলিলেন।
পথ এমত অপ্রশস্ত যে পথিকের গাত্র-
বসন দুইপার্শ্বস্থিত বৃত্তি স্পর্শ করিতে
লাগিল। মধ্যে পথিপার্শ্বে বৃহৎ বৃক্ষ
থাকাতো সেই পথে অন্ধকার আরও গাঢ়-
তর বোধ হইতে লাগিল। অতি প্রবল
নৈশবায়ু মধ্যে পথিককে কাঁপাইতে
লাগিল, তজ্জন্য পথিক আরও দ্রুত চলি-

লেন। এক স্থানে একটি বাদাম বৃক্ষতলে গাঢ় অন্ধকারে অতি বেগে পথিকের মস্তকে একটি স্থির পদার্থ লাগিল। পথিক বস্ত্রাঘাত উঃ করিয়া উঠিলেন, স্থিরপদার্থও সঙ্গে সঙ্গে উঃ করিয়া উঠিল। পথিক পদার্থকে মনুষ্য বিবেচনা করিয়া, রাগা-স্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কে ও?” পদার্থও তদ্রূপস্বরে উত্তর করিল “তুমি কে?” পথিক স্বর চিনিতে পারিয়া বলিলেন “কে, দেবনাথ মুখুয্য মহাশয়! আপনি, তা আমি জানিতে পারি নাই—কি সম্বাদ?” দেবনাথ আশ্চর্য বস্ত্রাঘাত গাল দিয়া কাঁপিতে বলিল “আরে রেখে দেও তোমার সম্বাদ—আগেই সম্বাদ—আগে প্রাণ না আগে সম্বাদ—বাঁহার জন্য আমি এত রাত্রে এই শীতে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া—সেই আমার সর্বনাশ করিল।” রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঠক বন্ধিতে পারিয়াছেন যে পথিক রতিকান্ত ভিন্ন আর কেহ নহে) বলিল, “মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার আমি কি সর্বনাশ করিলাম?” দেবনাথ অতি জুঙ্গলস্বরে বলিল “মহুয্যের ইহা অপেক্ষা আর কি সর্বনাশ হইতে পারে, তুমি আমার সম্মুখের এই দাঁতটা ভাঙ্গিয়াছ।” এই বলিয়া দেবনাথ মুখো রোদনোন্মুখ হইলেন।

রতিকান্ত হাস্যেব বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মুহূঃ হাসিতে লাগিলেন। তাহাতে দেবনাথ আরও রাগান্বিত হইয়া বলিল, “রতিকান্ত বাবু তুমি আজ

আমার যে অনিষ্ট করিলে এ অনিষ্ট আমি মরিলেও ভুলিব না।” মুখোপাধ্যায়ের সেই সময়ে মনে পড়িতেছিল, যে তাঁহার বুনা নারিকেল দিয়া চাল ভাজা খাওয়ার সাধ ইহাঙ্গের মত ঘুচিল—ইক্ষু, কেতুর প্রভৃতি অশ্বাচ্ছ কল তাঁহার কাছে এখন হইতে গোমাংস তুল্য হইল—হায়! এখন কি হইবে? তাহুল চর্কণের জন্য কি এখন ব্রাহ্মণকে অশু-রোধ কবিত্তে হইবে? তা ত প্রাণ থাকিতে হইবে না—নথ নাড়া, নথের ভিতর হইতে বাঁকা হাসি, প্রাণ থাকিতে সহিবে না। নথের কথা মনে হইবা-মাত্র মুখোপাধ্যায় অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, “আজ হইতে তুমি আমার চিরশত্রু হইলে, আমি তো-মাব জন্য যে রজনীর সর্বনাশ করিতে বসিয়া ছিলাম সে আমার কখন কোন অনিষ্ট করে নাই; কিন্তু তুমি আজ আমার সর্বনাশ করিলে! হায় বুনা নারিকেল রে!—আমি তোমার সহিত মিত্রতা ক-রিতে যে ভৈরবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলাম, সে শপথ তাঁহাকে ফিরা-ইয়া দিলাম—হে মা কালি কোন অপ-রাধ লইও না—হায় বিলাতি কুল বাতরাজ আলু, শসা পিয়ারা বাদাম পেস্তা রে!” এই বলিয়া দেবনাথ চক্ষু মুদিত করিয়া একবার ধ্যান করিল। গণ্ড বহিয়া অশ্রু-জল ভাসিয়া পড়িতে লাগিল। ইহাতে রতিকান্তের হাস্য দ্বিগুণবর্দ্ধিত হইল কিন্তু অতি কষ্টে উহা সম্বরণ করিয়া অতি

বিনীতস্বরে বলিলেন, “মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি অতি বিজ্ঞ হইয়াও কেন এক্ষণ অন্যায় রার্থ করিতেছেন। আপনি আমার পরম স্কন্ধ, আপনাত সাহায্যে আমি কার্যোদ্ধার করিব, আমি কি জানিয়া শুনিয়া আপনার দাঁত ভাঙ্গিতে পারি? আর বিশেষতঃ আপনি কি জানেননা যে গো হাড়ের ন্যায় দুইটা দাঁতের পরিবর্তে কালই দুইটা সোণার দাঁত বসান যাইতে পারে? তাহাতে মুখের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়—এবং কুনা নারিকেল কি চাই, চকমকির পাতরও তাতে চিবানো যায়।”

মুখো। যার?

রতি। কলিকাতার মনোহর বাবু সোণার দাঁতে এক জোড়া লোহার হাতা বেড়ি চিবাইয়া খাইয়াছিলেন। কলাই আপনার সোণার দাঁত বসাইব—

দেব। কি বল্লে ভাই—হাতা বেড়ি? আমার সোণার দাঁত বসিয়ে দিবে?—তাকি হয়?

রতি। দিব। দুই দিনের মধ্যেই দিব। আপনি এখানে দাঁড়াইয়া কেন?

দেব। তোমারই অন্য, সেই উন্মাদিনীর সন্ধানে বেড়াইতেছি।

রতি। উন্মাদিনীর সন্ধানে এ অন্ধকারে বাদাম তলার দাঁড়াইয়া কেন?

দেবনাথ খুঁজিয়া উত্তর পাইল না। রতিকান্তও উত্তরের অপেক্ষায় নীরব হইয়া রহিলেন কিন্তু ক্ষণকাল উভয়েই নীরব, ইতিমধ্যে দেবনাথের পাশ্চাতে

একটা কুড়ঙ্গদল হইতে হঠাৎ মলের চুন চুন শব্দ রতিকান্তের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বিস্ময়াবিত হইয়া উহার অমু-সন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু দেবনাথ মুখো অগ্রসর হইয়া হস্ত ধরিলেন এবং বলিলেন “ভাই, জঙ্গলে কতরকম জন্ত আছে—কামড়াইতে পারে। ওখানে যাওয়া উচিত নহে।” রতিকান্ত দেবনাথ মুখোর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “কামড়াইতে পারে বটে। ওসকল ঘোড়ার কামড়—মেঘ না ডাকিলে ছাড়ে না—কার মাথায় হাত বুলাইলে?”

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন, “ভাই কথায় কাজ কি? সকলেরই শরীরে একটা না একটা দোষ আছে। দেখ ঐ দাঁতপড়ার কথাটা বলিতেছিলাম—ওটা তামাসা—দাঁত আমার যেমন তেমনই আছে।” এই বলিয়া মুখোপাধ্যায় ভগ্ন দস্তটি জঙ্গলে ফেলিয়া দিলেন। রতিকান্ত হাসিয়া বলিলেন, “তার লুকাচুরিতেই বা কাজ কি? তোমার সোণার দাঁত হলে তুমি ও চুনচুনে মল দুই গাছও চিবা-ইতে পারিবে।” এই বলিয়া, রতি-কান্ত সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন—কিন্তু দূর যাইয়া মৃত্তিকানিশ্চিত প্রাচীর বেষ্টিত একটা গৃহ দ্বারে মূহুৎ আঘাত ক-রিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়াতে গৃহপশ্চাতে একটা গবাক্ষে সেইরূপ আঘাত করিতে লাগিলেন। ভিতর হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল “কেও, রতি বাবু?” উত্তর “হাঁ আমি।

দ্বার খোল বড় শীত।” রতিকান্ত পুনরায় দ্বারদেশে আসিলেন। একটি প্রাচীনা আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল। প্রাচীনা পাঠক দিগের নিকট অপরিচিতা নহেন, ইনি সে দিবস প্রত্যয়ে গঙ্গাতীবে উদ্ভাদিনীর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। প্রাচীনা রতিকান্তকে শীতাক্ত দেখিয়া গৃহভ্যন্তরে আসিতে কহিল। রতিকান্ত গৃহমধ্যে একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া কহিলেন “কোন সন্ধান পাইলে কি?” প্রাচীনা উত্তর করিল “তাহার সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু কোন ফল দর্শন নাই।”

রতি। কেন?

প্রাচীনা। সন্ধান হইল না, সেস্থলে অনেক লোক তাঁহার পাগলামি দেখিতে ছিল।

রতি। কোথায় দেখিয়াছিলে?

প্রা। এই পাড়ায় সন্ধ্যাকালে বেড়াইতেছিল।

রতি। তবে বোধ হয় এরাই এই গ্রামেই আছে?

প্রা। আছে বই কি।

রতি। বোধ হয় গ্রাম অসুস্থকান করিলে তাঁহার দেখা পাইতে পারি?

প্রা। পারেন।

ইহার পর রতিকান্ত প্রাচীনার হস্তে পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা দিয়া উঠিলেন। প্রাচীনা জিজ্ঞাসা করিল “কোথা যাও?”

র। তাঁহার অসুস্থকানে।

প্রা। সে কি! এত দ্রুত তাহার কোথায় পাইবে?

র। যদি এই গ্রামে থাকে তবে পাশ বই কি।

প্রা। কাহার বাটীতে অসুস্থকান করিবে?

র। পাগলী কাহারো বাটীতে আশ্রয় লয় না—

এই বলিয়া রতিকান্ত অতিক্রান্ত প্রাচীনার বাটী ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল যে উদ্ভাদিনীকে মধ্যে মধ্যে গ্রামপ্রান্তে মাঠে এবং বাগানে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া ছিলেন। সুতরাং তাঁহার এক প্রকার প্রতীতি হইল যে পাগলীকে উহার মধ্যে কোন স্থানে না কোন স্থানে দেখিতে পাইবেন।—এমত বিবেচনা করিয়া রতিকান্ত চলিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশাচরীদ্বয়।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। হুঃ হুঃ করিয়া শীতল নৈশ বায়ু বহিতেছে। রতিকান্ত অন্ধকারে কাঁপিতে একাকী চলিলেন। কিয়দূর যাইয়া গ্রাম অতিক্রম করিয়া একটি বৃহৎ অন্ধকারময় আশ্রয়স্থানে আসিলেন। প্রবাদ ছিল যে এই কাননে ভূতবোণি বিরাজ করিত। কিন্তু রতিকান্ত যে হুঃসাহসিক শপথ করিয়া রজনীকান্তের সর্বস্বাপহারণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া-

ছিলেন, তদপেক্ষা নৃণ্যসের কাষ আর কি ছিল? রতিকান্ত অকুতোভয়ে আশ্রয় কাননে প্রবেশ করিলেন। কাননের মধ্যস্থলে একটি ইষ্টক নির্মিত ঘাট বিশিষ্ট সরোবর ছিল। বৃক্ষের বিচ্ছেদে নক্ষত্রালোকে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ঐ স্থান কিঞ্চিৎ আলোকময়। রতিকান্ত দেখিলেন যে ঐ ঘাটের একটি সোপানে কে এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। তাহাকে জ্ঞীলোক বলিয়া বোধ হইল। একবার রতিকান্তের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হঠাৎ দাঁড়াইলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার চলিলেন। তাঁহার পদশব্দজনিত শুষ্ক পত্রের মরমরশব্দে সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে দুই এক পদ অগ্রসর হইলে রতিকান্তও সম্মুখে আসিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞৎকম্প হইল। বাহ্যিক বহুকাল মৃত বিবেচনা করিয়াছিলেন, এবং বাহ্যিক এজ্ঞে কখন দেখিবার সম্ভব ছিল না, রতিকান্ত সেই অন্ধকারময় বিজন আশ্রয়কাননে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! ভয়ে তাঁহার মূর্ছা হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু অশ্রুকাননবিহারিণী জ্ঞীলোক আর এক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিল “রতিকান্ত ভয় নাই—আমি প্রেতিনী নহি। তোমরা শুনিয়াছিলে আমি মরিয়াছিলাম—কিন্তু সে মিথ্যা জনরব মাত্র।” রতিকান্তের একপাশে বাক্যক্ষুণ্ণ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি এখানে কেন?”

উত্তরে জ্ঞীলোক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এত রাজে এখানে কেন?”

র। ‘কোথায় যাইব?’

জ্ঞী। কেন, তোমার কি ঘর ঘর নাই?

র। আপনি কি জানেন না যে রজনীকান্ত আমার সর্কস্বাপহরণ করিয়াছে।

জ্ঞী। তোমার মিথ্যা কথা—বদি কেহ তোমার কিছু অপহরণ করিয়া থাকে, তবে সে তাহার পিতা রামকান্ত। অকারণে তুমি তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টায় বেড়াইতেছ।

র। আপনি কিরূপে আমার অভিপ্রায় জানিলেন?

জ্ঞী। তোমার অভিপ্রায় গোপন নাই—সকলেই এখন উহা জানিতে পারিয়াছে। বলিতে বলিতে জ্ঞীলোকটি মাতার হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার কি কিছু পীড়া আছে?” জ্ঞীলোকটি বলিল “আমি উৎকট রোগে পীড়িতা—আমার শেষদশা বলিয়া, তোমাদের দেখিতে আসিয়াছি।”

র। এখানে কোন গ্রামের ভিতরে চলুন। সেখানে কোম গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইবেন চলুন—এ পীড়িত অবস্থায় এখানে থাকা উচিত নহে—

জ্ঞী। গ্রামে কোন গ্রহস্থের বাটা আমি তিন দিবস ছিলাম। কিন্তু গৃহস্থের প্রীতিবাসী একজন চিনিতে পারিরা আ-

মায় প্রেস্তিনী বলিয়া সন্কেহ করিয়াছেন। আমি সেই জন্য সেস্তান তাগ করিয়া এই বাঁধা ঘাটে শয়ন করিয়া আছি।

র। একাকী এই রুগ্ন অবস্থায় কেমন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন—হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা হইতে পারে—

জী। আমি একাকী নহি; আমার একজন সমভিব্যাহারী আছে—আমি সে জন্য তোমায় ব্যস্ত করিব না।

র। আমাদের ব্যস্ত করিবেন না ত কাহাকে ব্যস্ত করিবেন; আমরা কি আপনার পর—

জী। তুমি আমার পর নহ কিন্তু তোমার যত্নে আমার তৃপ্তি হইবে না— এই কথোপকথন হইতে হইতে সেই গভীর তমিশ্র নৈশগগন ভেদ করিয়া আশ্রকানন কাঁপাইয়া সঙ্গীতধ্বনি হইল। রতিকান্তের শরীর কটকিত হইল। পীড়িতা রমণীও চমকিত হইলেন এবং কহিলেন “তুমি এস্তান হইতে যাও, আমার সঙ্গিনী আসিতেছে; তাহার চিত্ত স্থির নহে—তোমাকে দেখিলে তাহার মনের চাকলা আরও বৃদ্ধি হইতে পারে।” রতিকান্ত কোন উত্তর না করিয়া সে স্থান হইতে অপস্থত হইলেন, কিন্তু দূরে যাইয়া একটা তিস্তিভী বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া দেখিলেন যে দূর হইতে একট মধ্যবয়সী রমণী চঞ্চলগমনে আসিতেছে—তাহার নিকটবর্তী হইলে চিনিলেন যে পীড়িতা রমণীর সঙ্গিনী আর কেহ নহে; সেই উন্মাদিনী—যাহার

অনুসন্ধানে তিনি এই ভীষণ অন্ধকারে বনে বনে বেড়াইতেছেন। রতিকান্তের সেই জনাই অনুধাবন হইল যে তাঁহার জাতি রজনীকান্তের সম্বন্ধে যে অতি গুঢ় গোপনীয় কথা উন্মাদিনী গঙ্গাতীরে ব্যক্ত করিয়াছিল—তাহার সহিত এ পীড়িতা রমণীর কোন সংশ্রব থাকিবার সম্ভাবনা। অতএব তাহাদের কথাবার্তা শ্রবণাভিলাষে বৃক্ষান্তরালে রহিলেন। কিন্তু দূরবশতঃ, কিছুই শুনিতে পাইলেন না—ক্রমে যামিনী অবসান হইল, পূর্ন-দিক্ ঈষৎ আলোকময় হইল, বিহঙ্গম-কুল কলকল রব করিয়া উঠিল। পীড়িতা রমণী উন্মাদিনীর স্বন্ধ আশ্রয় কবিয়া অতি মুছপাদবিক্ষেপে আশ্রকানন হইতে নির্গত হইলেন। রতিকান্তও অলক্ষ্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। রমণীদ্বয় গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, হরিনাথ মুখোর বাটীর সন্নিকটে একটা মুক্তিকানির্দ্ভিত কুটারে প্রবেশ করিলেন। রতিকান্ত উহা দেখিয়া অদৃশ্য হইলেন।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী রাজে যাহা দেখিল।

রজনীকান্ত যেমন কুমুদিনীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, আমরা যদিও মোহিত হই নাই, তথাচ তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে ভাল বাসি। অনেক দিন তাঁহাকে দেখি নাই; চল পাঠক, যদি তোমাদের গৃহিণীরা রাগ না করেন তবে আজ একবার তাঁহাকে গিয়া দেখি। প্রস্তুত

পক্ষ কুসুমবৎ কুমুদিনী সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া বেড়াইতেছেন। শৈশব হইতে তিনি পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, আজ সেই অকৃত্রিম স্নেহের তিনি অধিকারিণী—সেই মধুর আদরে আদরিণী। আবার সংসারী হইবেন—শৈশবে যখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তখন বিবাহ কাহাকে বলে জানিতেন না, এবং সেই অর্থ না বুঝিতেও বিধবা হইয়াছিলেন; এখন তিনি সেই অর্থবুঝিতে পারিয়াছেন; এ অবস্থায় তাঁহার বিবাহ হইবে,—আবার মনোমত পাত্রের সহিত বিবাহ—তাঁহার কি আর স্নেহের সীমা আছে? এই অসীম স্নেহ বাহিরে অব্যক্ত, অথচ তাঁহার পিতা মাতা বুঝিতে পারিলেন—পারিয়া, তাঁহার জনক জননী জগদীশ্বরের নিকট মনে প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাদিগের এই একমাত্র কন্যাকে যেন দীর্ঘায়ু করেন—কুমুদিনীও মনে প্রার্থনা করিলেন তাঁহার ভাবী পতি শরৎকুমারকে ও তাঁহার পিতা মাতাকে যেন দীর্ঘায়ু করেন। কুমুদিনী স্নেহের সময়ে তাঁহার দুঃখে দুঃখী তাঁহার স্নেহে স্নেহী, রজনীকান্তকে ভুলিলেন না, তাঁহাকে যে অকারণে রুচবাক্য দ্বারা মনস্তাপ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বপ্নে স্বেপ্নে মধোঃ আঘাত করিত, এবং সর্বদাই ইচ্ছা করিতেন যে আর একবার রজনীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্ট আলাপ করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন কিন্তু হৃদ্যর্গ্য বশতঃ রজনীকান্তের আর সাক্ষাৎ লাভ হইল না। এই চিন্তা

মেঘবৎ মধোঃ কুমুদিনীর হৃদয় অন্ধকার করিত—এষাঞ্চ চিন্তায় এক দিবস সন্ধ্যাকালে কুমুদিনী তাঁহাদের খিড়কির উল্ল্যানেয় পুষ্করিণীর ঘাটের একটি শোপানে বসিয়া আছেন, এমনত সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া দেখিলেন, আমাদিগের পূর্বপরিচিত উদ্যাদিনী তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহাকে কি সঙ্কেত করিতেছে। কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন “কি?” পাগলিনী কোন উত্তর না করিয়া পুনরায় অঙ্গুলি সঙ্কেতদ্বারা তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। কুমুদিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে, তোমার ঠাকুরাণী ত ভাল আছেন?” পাগলিনী মাথা নাড়িয়া বলিল “উহু” কুমুদিনী চমকিত হইয়া পাগলিনীর হস্তধরিয়া অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “পীড়া কি বৃদ্ধি হইয়াছে?” পাগলিনী উত্তর না দিয়া কেবল অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহাকে তাহার সমস্তি ব্যাহারে ফাইতে সঙ্কেত করিতে লাগিল। কুমুদিনী পাগলিনীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্কেত চলিলেন। খিড়কির দ্বাবদিয়া নির্গত হইয়া অনতিদূরে একটি ভগ্নকুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীরের এক কোণে একটা মুক্তিকানিস্থিত দীপাধারে একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। তাহার সন্নিকটে এক জীর্ণ ও গলিত শয্যায় একটি প্রাচীনা অস্থিচন্দ্রাবশিষ্টা রমণী শয়ন করিয়া আছেন। ইনি আমাদিগের অপরিচিতা নহেন, পূর্ব পরিচ্ছেদের রতিকান্তের

সহিত যামিনীযোগে আত্মকাননে ইহারই সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এবং রক্তিকান্ত ইহারই পশ্চাৎ এই কুটীর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়াছিলেন। কুমুদিনী কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে পীড়িতা রমণী মুমূর্ষুপ্রায়; মধ্যে মধ্যে বারিসিঞ্চনের দ্বারা ও অনেক যত্নে তাহার সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হইল। পীড়িতা রমণী চক্ষুঃস্নান করিয়া নিকটে কুমুদিনীকে দেখিয়া ক্ষণিক হর্ষাধিত হইলেন। নয়নে দুই এক বিন্দু বারি পড়িল, এবং অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “মা এসেছিস, — কুমুদিনী তুমি পূর্জজন্মে আমার কে ছিল—নতুবা এজন্মে চবমকালে তুমি আমার পুত্রের ন্যায় কাজ করিতেছ কেন?” কুমুদিনী অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে বলিলেন “স্থির হউন, নতুবা রোগ বৃদ্ধি পাইবে।”

পীড়িতা রমণী উত্তর করিল, “রোগের আর কি বৃদ্ধি পাইবে—মা—আজ ব্যক্তি আমার কাটিবে না। তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে; আমি সেই জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি।”

কুমু। কি, বলুন।

পীড়িতা। আমার ভিক্ষা এই যে বহুদূর হইতে মনিতেন যাহাকে দেখিতে আসিয়াছি একবার তাহাকে দেখাও—মা আমার আর কেহ বন্ধু নাই যে এ উপকার করে—

কুমু। কে, কাকে দেখিতে চাও?

পীড়িতা। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলি-

লেন, “তোমাকে আমার পূর্বপরিচয় দিব, তা নহিলে তুমি বুঝিতে পারিবে না, আমার একটু জল দাও, বড় তৃষ্ণা—” বলিতে পীড়িতা অচেতন হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনী রাতে যাহা শুনিল।

কুমুদিনী একটি মৃৎপাত্রে জল আনিয়া তাহার মুখে সিঞ্জন করিলেন, এবং তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে উহা পান করিতে দিলেন। পীড়িতা রমণী কিঞ্চিৎ বলাধান হইলে বলিতে লাগিলেন, “তোমাদিগের প্রতিবাসী রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবন মৃত্যু হইলে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সোণামণিকে বিবাহ করেন। পিতা মাতা দরিদ্র বিধায়ে আমি তাহার সমভিব্যাহারে আসিয়া রমাকান্ত বাবুর বাটতে বাস করিতে লাগিলাম। কখন স্বামীর ঘর করি নাই, স্বামী একজন মহৎ কুলীন—বিবাহ তাঁহার উপজীবিকা—আমাকে দরিদ্রের কল্যাণ বিবেচনা করিয়া কখন তিনি আমাদেব বাটী আসিতেন না। কিন্তু যখন জনিতে পারিলেন যে আমি বিখ্যাত ধনাঢ্য রমাকান্ত বাবুর সংসারে বাস করিতেছি, তখন মধ্যে আসিতে লাগিলেন। আমি ভগিনীর সংসারে সুখে থাকিলাম। প্রথমতঃ—মধ্যে স্বামীকে দেখিতে পাইতাম, দ্বিতীয়তঃ—এই সংসারে কর্ত্তী স্বরূপা হইয়া রহিলাম। ভগিনীর ক্রমে বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইল। রমাকান্ত বাবুর প্রথমা জীবন

তিন কঙ্কাস্তান মাত্র ছিল, কিন্তু রমাকান্ত বাবু একটি পুত্রসন্তান না হওয়াতে সর্বদাই দুঃখিত। আমার ভগিনী সোণামণি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলেন। অনেক যাগ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। অবশেষে ভগিনী অন্তঃস্বত্বা হইলেন। দীর্ঘরে-চ্ছায় আমিও ঐ সময়ে অন্তঃস্বত্বা হইলাম। নবম মাসে এক দিবস প্রাতে ভগিনী একটি সুকুমার প্রসব করিলেন। বিধাতার নিরীক্ষ! আমিও সেই দিবসে সন্ধ্যাকালে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলাম। আমরা দুই ভগিনী এক সময়ে পুত্র প্রসবিনী হওয়াতে আত্মাদের আর সীমা রহিল না—রমাকান্ত বাবুর বিপুল বৈভবের অধিকারী জন্মিল। সুবর্ণপুর আত্মাদে কাঁপিয়া উঠিল। আমাদের সন্তান দুইটির তাহাদিগের মাতুলের জায় মুখাবয়ব হইল। উভয়ে দুই পুষ্ট এবং একই প্রকার দেখিতে হইল, দুই জনকে একত্রে রাখিলে সর্বদাই ভ্রম হইত। ভগিনী সন্তানটির নিতান্ত অসু-রক্তা হইলেন, ক্ষণকালের জন্য ক্রোড় হইতে ভূমিতে রাখিতেন না; এমন কি সন্তানটি এক মাসের হইলে একদিবস তাহার বালুসা হওয়াতে সোণামণি মনের চাকলা হেতু মূর্ছিতা হইলেন এবং সেই অবধি ক্রমে ক্রমে হইয়া পড়িলেন। রমাকান্ত বাবু সোণামণিকে অতিশয় ভাল বাসিতেন—তাহার পীড়া দেখিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। দেশ দেশান্তর হইতে কত চিকিৎসক

আনাহিলেন। তাহারা একমাস ধরিয়া চিকিৎসা করিল কিন্তু বিশেষ কোন ফল দর্শিল না—অবশেষে তাহারা স্থান পরিবর্তন করিতে পরামর্শ দিল। নিলারপুরে আমাদের পিতৃালয়। নিলারপুরের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, অতএব শেষ স্থির হইল কিছু দিনের জন্য ভগিনীদ্বয়ে পিতৃালয়ে গিয়া বাস করি। এক শুভ-দিনে নিলারপুরে যাত্রা করিলাম—রমাকান্ত বাবু বৃদ্ধ বয়সে সোণামণির অতিশয় বাধা হওয়াতে আমাদের সমভিব্যাহারে চলিলেন,—উঃ বড় তৃষ্ণা জল—”

বলিতে রমণী আর বলিতে পারিলেন না, বাকশক্তি রহিত হইল, কুমুদিনী দ্রুত জল অনিয়া দিল। রমণী উহা পান করিয়া ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন, পুনরায় যখন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কুমুদিনী নিষেধ করিলেন, বলিলেন, “আজ স্থির হইয়া থাকুন কাল বলিবেন।” রমণী বলিলেন, “আমিত কাল পর্য্যন্ত বাঁচিব না; আজ না বলিলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না।” এই বলিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন—

“পিতৃালয়ে কিছু দিন বাস করিয়া সোণামণি কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল। রমাকান্তের ইচ্ছা যে মাস ছয় সাত সেখানে থাকিয়া সোণামণি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ কবে। এইরূপে কিছুদিন পরে যখন আমাদের শিশুদিগের আড়াই মাস বয়ঃক্রম হইল তখন এক দিবস জনরব উঠিল যে পূর্বাঞ্চল হইতে

একদল ছেনেধরা স্ত্রীলোক আসিয়াছে। তাহারা দুই চারি মাসের শিশুদিগের চুরি করিয়া লালন পালন করিয়া চার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে ব্যবসাদার-দিগের নিকট বিক্রয় করে এবং তাহারা অন্য দেশে বালকদিগের গোলাম বলিয়া বিক্রয় করে—এই সংবাদে প্রস্থতিদিগের মনে কি প্রকার ভয় হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। আমার ভগিনী সোণামণি উন্মত্তের গায় হইলেন, পীড়া আরও বৃদ্ধি হইল, তাঁহার শিশুকে কাহাবও নিকট বিশ্বাস করিয়া দিতেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে আমিই সে বিশ্বাসভাজন হইতাম। এক দিবস সন্ধ্যার সময় সোণামণি আমার নিকট তাঁহার সন্তানকে দিয়া গঙ্গায় গা ধুইতে গিয়াছিলেন। আমার পিতার বাটীর পশ্চাতেই একটা ক্ষুদ্র প্রান্তব ছিল, আমি বিষম গ্রীষ্ম যন্ত্রণায় প্রাপ্তরের দিকে একটি দ্বাব খুলিয়া শিশুকে লইয়া শয়নে ছিলাম। ক্রমে নিদ্রাভিত্ত হইলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভয়েতে চমকিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ব্যস্ত হইয়া শিশুকে কোলে টানিতে গিয়া দেখিলাম, শিশু নাই—চীৎকার করিয়া আছাড়িয়া পড়িলাম, তখন বেস অরুকার হইয়াছে—আমার চীৎকারে ভগিনীপতি দৌড়িয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে সবিশেষ বলিলাম। তিনি চতুর্দিকে ভূতাবর্ণকে পাঠাইয়া আমার নিকট আসিয়া আমার দুই হস্ত ধরিয়া বলিলেন ‘দেখ আমি অনেক লোকজন পাঠাইয়াছি এক্ষণেই তাহারা শিশু ফি

রাইয়া আনিবে; কিন্তু ইতি মধ্যে তোমার ভগিনী যদি বাটা আসিয়া তাঁহার সন্তানকে দেখিতে না পান তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ হইবে। অতএব তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য আপাততঃ তোমার পুত্রকে তাঁহার বলিয়া তাঁহাকে দেওয়া আবশ্যিক। তোমার পুত্র ও আমার পুত্র যমজের গায়, কোন প্রভেদ নাই। সোণামণি সহজেই ভুলিবেন—তাহার পর আমার শিশুপুত্র প্রাপ্ত হইলে সকল বজায় থাকিবেক—’ আমি এই পরামর্শে সন্মত হইলাম—কেন না সোণামণি বাটা আসিয়া তাঁহার শিশুকে না দেখিতে পাইলে নিশ্চয় মরিবে, তাহা জানিতাম। বিশেষতঃ যতদিন না সোণামণির শিশু পাওয়া যায় ততদিন আমার শিশু আমার নিকট থাকিবে, এই বিবেচনা করিয়া পরিচারিকা কমলমণির (এক্ষণে এই উন্মাদিনী) নিকট হইতে আমার শিশু আনিয়া পূর্ববৎ সেইস্থানে শয়ন করাইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। ভগিনী পথিমধ্যে এ সংবাদ পাইয়া উন্মাদিনীর গায় দৌড়িয়া আসিতেছিলেন, এবং আমার শিশুকে তাহার বিছানা হইতে ক্রোড়ে লইয়া পাগলের ন্যায় হাসিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সকলে জানিল যে আমার শিশু হারাইয়াছে এবং তাহা আর পুনঃপ্রাপ্ত হইল না।

• “কিছুদিন পরে সোণামণি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে রমাকান্ত বাবু

তাঁহাকে লইয়া স্নানপুর্বে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমিও যাইতে উদ্যত হইলাম—কিন্তু তিনি নিষেধ করিলেন, বলিলেন, ‘তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা কাশী যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের সঙ্গে একজন অভিভাবক থাকা আবশ্যিক। তুমি ভিন্ন আর কে সঙ্গে যাইতে পারে? আমি সকল খরচপত্র দিব।’ আমি যাইতে অস্বীকৃত হইলাম, বলিলাম, আমার সন্তান ফিরাইয়া দাও, আমি যাইব। কিন্তু পাষণ্ড বলিল তোমার সন্তান চুরি গিয়াছে আমি কোথায় পাইব—আমি বলিলাম তুমি চুরি করিয়াছ—সে উত্তর করিল, ‘কে এখন বিশ্বাস করিবে যে তোমার সন্তান তোমার জ্ঞাতসারে আমি চুরি করিয়া তোমার ভগিনীকে দিয়াছি। একথা শুনিলে তোমাকে বাতুল মনে করিবে একথা আর মুখে আনিও না—’ আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। পাষণ্ড যাহা বলিল তাহা সঙ্গত বিবেচনা হইল, কিন্তু আমি অনেক কাঁদিয়া বলিলাম আমি তাহার বাটীতে বাস করিব—কেন না তাহা হইলে আমার পুত্রকে দিবারাত্র দেখিতে পাইব। কিন্তু পাষণ্ড কোন মতেই রাজি হইল না—এখন আমি কোথায় যাই স্তব্রাং পিতামাতার সহিত কাশী যাওয়া স্থির করিলাম—রমাকান্ত আমার প্রাণের পুত্র চুরি করিয়া সোণামণি সমভিব্যাহারে স্নানপুর্বে গেল। আমার শিশু সন্তানের পরিচর্যার্থে কমল-

মণিকে সঙ্গে লইয়া গেল। কাশী যাইবার কিছুদিন পূর্বে একদিবস এক জন পুলিশ কর্মচারী আমার পিতার নিকট আসিয়া বলিল, একদল স্ত্রীলোককে ছেলেধরা সন্দেহ করিয়া পুলিশে ধৃত করিয়াছে, এবং তাহাদিগের নিকট হইতে দুইটা শিশু-সন্তান পাওয়া গিয়াছে—তন্মধ্যে একটি হাকিমের নিকট তাহাদিগের এজেহারে প্রকাশ হইল যে তোমার দৌহিত্র, তোমাকে গিয়া উহাকে চিহ্নিত করিয়া আনিতে হইবে। বৃদ্ধ পিতা আহুত দে তাকার সমভিব্যাহারে গিয়া সোণামণির শিশু ফিরিয়া আনিলেন। আমি আহুতাদে গলিয়া গেলাম। আপনার শিশুর স্তায় তাহাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এই সংবাদ রমাকান্তকে লিখিলাম, আরও লিখিলাম আমার শিশু আমাকে ফিরাইয়া দিবেন আমি নিশ্চিত হইয়া কাশী যাত্রা করিব। রমাকান্ত প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে ‘তোমার শিশু ফিরিয়া পাইয়াছে শুনিয়া বড় সুখী হইলাম, তোমার পুত্র দীর্ঘায়ু হউক—কিন্তু পুত্র ফিরিয়া দিবার কথা কি লিখিয়াছ বুঝিতে পারিলাম না—তুমি কি পাগল হইয়াছ?’ আমি পত্রখানি অঞ্চলে বাঁধিলাম। চক্ষের জল চক্ষে মারিলাম হৃৎকের কথা আপনার হৃদয়ে গোপন করিলাম। সোণামণির শিশুসন্তান লইয়া কাশী যাত্রা করিলাম—সেখানে তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কমলমণি সোণামণিকে ত্যাগ করিয়া আমার নিকট

আসিল। তাহার বৃদ্ধির কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিলাম। রমাকান্তের প্রতি তাহার বিশেষ রাগ, বোধ হয় যেম রমাকান্ত তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। সে বাহা হউক কমলমণি শেষে উন্মত্ত হইল। সোণামণির পুত্র আমার নিকট থাকিয়া কৃতবিদ্যা হইল। রমণপুরের শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে কাশীবাস করিতেন, তাহার পরমাত্মন্দরী কন্যা প্রমদার সহিত সোণামণির পুত্র শরৎ কুমারের বিবাহ দিলাম—”

এইসময়ে কুমুদিনী চমকিয়া উঠিলেন—এবং জিজ্ঞাসা করিলেন “কি! আপনার প্রতিপালিত সোণামণির পুত্রের নাম শরৎকুমার?” পীড়িতা রমণী উত্তর করিল “হাঁ” কুমুদিনী বাগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার পর?” “তার পর বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শরৎকুমার কৃতবিদ্যা হইয়া, কলিকাতার চাকরীর চেষ্টা করিতে আসিতে ইচ্ছুক হইল। এই সময়ে তাহার স্বপুত্র শ্রীনাথ বাবু বাটী আসিতে ছিলেন। শরৎকুমার তাঁহার সহিত আসিল। রমাকান্তের সহিত তাহার অথবা আমার যে কোন সম্পর্ক ছিল, তাহা শরৎকুমারকে কখন বলি নাই। কেন না রমাকান্তের নাম মুখে আনিতে আমার স্বর্ণা হইত—শরৎ এদেশে আসিলে পর আমার পিতামাতার মৃত্যু হইল, এবং আমিও রোগ-গ্রস্ত হইলাম, এসংবাদ রমাকান্ত জানিতে পারিল, এবং সকলের নিকট প্রকাশ

করিল যে আমারও মৃত্যু হইয়াছে। আমি দিনে অতিশয় পীড়িত হইলাম এবং নিশ্চয় বিবেচনা হইল আর অধিক দিন বাঁচিব না। মনে আপনাব পুত্রকে দেখিতে বড় সাধ হইল। মরিতে ঐ উন্মাদিনী সমভিব্যাহারে এ দেশে আসিলাম। শুনিলাম আমার ভগিনী ও রমাকান্তের মৃত্যু হইয়াছে। পুত্র রজনীকান্ত তাহাদের বিষয়াধিকারী হইয়াছে। এক দিবস উন্মাদিনী আমার রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল এবং কি বলিয়াছিল তাহা জানি না। রজনী তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছিল। রজনী তাহাকে চিনিত না—কিন্তু তাঁহার শত্রু রতিকান্ত চিনিত। তাহার সহিত কাশীতে এক দিবস সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুমুদিনী আনাব পূর্ববর্তাস্ত সব শুনিলে, এক্ষণে একবার রজনীকান্তকে এইখানে আনাও, আমি দেখে প্রাণত্যাগ করি।”

কুমুদিনী এই অশ্রুযুক্তি প্রবণ করিয়া প্রস্তরমূর্তিবৎ সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। পরে পীড়িতা পুনঃ পুনঃ কাতরোক্তি করিতে লাগিল দেখিয়া, তিনি ধীরে উঠিলেন এবং প্রতিবাসী এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন “তুমি রজনী বাবুকে একবার এইখানে শীঘ্র আসিতে বল।” তৎপরে পুনরায় কূটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে রমণী অচেতন। চেতন করিতে বহু যত্ন করিলেন কিন্তু সফল হইলেন না। রমণীর মৃত্যু হইয়াছে—কুমুদিনী তাঁহার শিয়রে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

কাঁদিতে লাগিল। রমণী তাহার কে ছিল? কেহ না—কিন্তু অনাধিনী বলিয়া পীড়িতা অবস্থায় তাহার গুপ্তাধা করাতে গায়া জন্মিয়াছিল। ঐতিমধ্যে রজনীকান্ত সেই কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রজনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “এ মৃতব্যক্তি কে?” কুমুদিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন “তোমার জননী।” বলিয়া মনেই অতিশয় ক্ষোভিত হইলেন, লজ্জায় অঞ্চল দিয়া মুখাবরণ করিলেন।

রজনী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে আবার কি? তুমি কি আমার চেন না? আমি বমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র।”

কুমু। অত্ৰব্যক্তি তাঁহার পুত্র।

রজ। কে?

কুমু। শরৎকুমার।

বজ। যাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে?

এই কঠিন তিরস্কাবে কুমুদিনী লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, অত্যন্ত ক্রোধে, পুরুষ-মাহুষের মত তীব্রদৃষ্টিতে রজনীর প্রতি চাহিলেন। আবার তখনই স্ত্রীলোকের মত চক্ষু ছটিকে নত করিয়া, ক্রমে ক্রমে জলে পরিপূর্ণ করিয়া, একেবাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। রজনী অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, “আমি তা বলি নাই। তবে কথাটা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। তুমি একথা কেন বলিতেছিলে?”

কু। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে?

এবার রজনীর দৃষ্টিতে তিরস্কার ব্যক্ত হইল। রজনী বলিল, “কবে তোমার কথায় অবিশ্বাস করিয়াছি? তোমার কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করি বলিয়াই তোমার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ নাই।

কুমুদিনী আবার লজ্জায় মুখ নত করিলেন। পরে বলিলেন, “বিশ্বাস কর না কর, আমার যা কর্তব্য তা আমি করি। তুমি মনোযোগ দিয়া শোন।”

তখন সেই অন্ধকার নিশীতে, সেই বিজন কুটীর মধ্যে, সেই সদাঃবিমুক্তপ্রাণ মনুষ্য দেহপার্শ্বে বসিয়া, সেই যুবতী, রজনীকান্তের কাছে বলিতে লাগিল। সেই ভীষণ সর্বস্বাস্তকর কথা, কুমুদিনী যেমন মৃত্যুর নিকট গুনিয়াছিলেন, তেমনি বলিতে লাগিলেন; ক্ষুদ্র, নিস্তেজ দীপের ক্ষীণালোক, কুটীরমধ্যে কাঁপিতেছিল,—মধ্যেই কুটীর ভিত্তির উপর ভৌতিক ছায়া সকল প্রেতবৎ নাচিতেছিল—শবদেহের উপর ভৌতিক রঙ্গে খেলিতেছিল—কুমুদিনীর অশ্রুসমুজ্জল চক্ষে বিদ্যুৎ ঝলমাইতেছিল;—নিকটস্থ বৃক্ষ শাখায় কদাচিৎ কোন অতি মৃদু, কি ভীষণ মৃদু! রব হইতেছিল—দূরে কদাচিৎ কোন বিকট পশু রব করিতেছিল। সেই সময়ে, সেই আলোকে, কুমুদিনী, ধীরে ধীরে, অক্ষুটস্বরে, গভীরভাবে সেই সর্বস্বাস্তকারিণী কাহিনী রজনীকে শুনা ইলেন। মেঘ বলিল, চাতক গুনিল—যা গুনিল, তা—বজ্রাঘাত!

পালি ভাষা ও তৎসমালোচন।

পালি অতি প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃত ইহার জননী সত্ত্বেও পালিব্যাকরণ কর্তা কচ্ছুরণ* কহেন “এই ভাষা সকল ভাষার মূল, এই কল্পারম্ভে ব্রাহ্মণ ও অহ্ম বর্ণের ব্যক্তিগণের ইহা মাতৃভাষা ছিল, এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং এই ভাষার কথোপকথন করিয়াছিলেন, ইহাকে মাগধী ভাষা বলে যথা—

সমাগধা মূল ভাষা

নবের আদি কপ্পিক

ব্রাহ্মণ সমুত্তরাপ

সম বুদ্ধ চাপি ভাষয়ে।।

পুনশ্চ “পতি সস্থিণ অত্ময়” নামক পালি গ্রন্থে লিখিত আছে “এই ভাষা দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, প্রেতলোকে, এবং পশুজাতির মধ্যে সর্বস্থলেই প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোণক, দামিল প্রভৃতি ভাষা পবিবর্তনশীল কিন্তু মাগধী আৰ্য্য ও ব্রাহ্মণগণের ভাষা, এজন্ত অপবিবর্তনীয়—চিরকাল সমানরূপে ব্যবহৃত। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাগধী ভাষা সুগম ভাবিয়া পিটক নিচয় এই ভাষার সর্ব সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।”

লিখিবার ও কথোপকথনের (গৃহধর্মের) ভাষা স্বতন্ত্র প্রকার, এবং এই দ্বিবিধ প্রকার ভাষা চির কালই প্রসিদ্ধ। “নরে-

* কাত্যায়ন।

দিত বে নানা ভংশিতটে” এই ক্রটি বাক্য আর “যএব শব্দা লোকে তএব বেদে,” “লোকবেদয়োঃ সাধারণাৎ” ইত্যাদি আৰ্য বাক্য এবং “যদাযজ্ঞীয়ং বাচং বেদেৎ” এই বেদ বাক্য এবং “যাত যামঞ্চ যন্তবেৎ” ইত্যাদি স্থিতি বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে অতি প্রাচীনকালেও দ্বিবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল। বৃহদ্রক্ষ্য পুরাণে লিখিত আছে, “ততো ভাষাশ্চ সমুজ্জৈ পকাশং বট্ট সংখ্যা। তজ্জ্ঞানায়চ বালানাং তত্ত্বাকরমানিচ।” বিদ্যাতা ৫৬টা ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তত্ত্বা-যার ব্যাকরণও করিলেন “এ কথা যত-দূর সত্য হউক, তাহার অমুশীলন নিশ্চ-য়োজন। সমস্ত ভারতবর্ষে ১৮টা শাস্ত্রীয় ভাষা প্রচলিত। ইহা ভিন্ন ব্যবহারিক ভাষা নানা প্রকার আছে। ফল শাস্ত্রীয় ভাষা প্রধানতঃ দ্বিবিধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত। শিক্ষা গ্রন্থে ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন “প্রাকৃতে সংস্কৃতে বাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বরজুবা” স্বরজু স্বয়ং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শাস্ত্র বলিয়াছিলেন, এতাবত শাস্ত্রীয় ভাষা দ্বিবিধ হইতেছে এবং তাহার প্রত্যেক অষ্টাদশ প্রকার যথা। (১) সংস্কৃত (২) প্রাকৃত, এই প্রাকৃতির ভেদ উদাচী (৩) মহারাত্রী (৪) মাগধী (৫) মিশ্রাক্ষ মাগধী (৬) পকাতীরী (৭) শ্রবন্তী (৮) ত্রাবিক্তী (৯) ওড়ীয়া (১০) পাশ্চাত্য (১১) প্রাচ্যা

(১২) বাহ্লিকা (১৩) রস্তুকা (১৪) দাক্ষিণাত্যা (১৫) পৈশাচী (১৬) আবন্তী (১৭) শৌরসেনী (১৮) এতদ্ব্যতীত অষ্টম স্থানে শ্রবন্তী ভাষা আছে, উহাই পালি ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শাক্যসিংহ যে সময় শ্রবন্তীস্থ জেত বনে বাস করিয়া ভিক্ষু দিগকে উপদেশ প্রদান করেন, সেই সময়েই ঐ বৌদ্ধ ভাষার সংস্কার হয় এবং সেই সংস্কার প্রাপ্ত ভাষা পালিনামে প্রখ্যাত হয়। কল্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, “বৌদ্ধ ভাষা মজ্জানানো মাহেশ্বর তয়া নৃপঃ;” এতদ্বাৰা তাঁহার বৌদ্ধ ভাষার ভিন্নতা দেখান প্রধান উদ্দেশ্য। হরীর টীকায় উক্ত হইয়াছে “সংস্কৃত শিষ্ট ভাষা চ শ্রবন্তী বাক্ বিনায়কঃ” অর্থাৎ শিষ্টদিগের ভাষা সংস্কৃত আব বিনায়কদিগের ভাষা শ্রবন্তী। বিনায়ক শব্দে বৌদ্ধ বুঝায়। এই ১৮ প্রকার ভাষার উদাহরণ “প্রাকৃতলঙ্কেশ্বরবাকবণে” আছে, ঐ সকল উদাহরণ পর্যালোচনা করিলে পালিভাষার সহিত শ্রবন্তী-ভাষার সাম্য দৃষ্ট হইবে।

পালি শব্দের প্রকৃত অর্থ শ্রেণী যথা মহাবংশ (মূল পালি) অস্য পালি ব্যাধনম্ তদা অসি নিবেসিত” অর্থাৎ সেই সময় রাজার ব্যাধগণের নিমিত্ত এক শ্রেণী বাটী নির্মিত হইল। আমাদিগের সংস্কৃত সূত্র ও তত্ত্বের গ্রাম বৌদ্ধদিগের শ্রেণীবদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নিচয় পালি নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল, এক্ষণে সাধারণতঃ সেই মাগধী ভাষায় রচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষাভাসারে

পালি একটি স্বতন্ত্র বৌদ্ধ ভাষা হইয়াছে। অধ্যাপক চাইল্ডার্স অনুমান করেন যে বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থনিচয় খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণের ১০০ বা ২০০ বর্ষ পরে পালি গ্রন্থ নামে প্রচলিত হইয়াছিল, কাবধ কেবল আধুনিক কতিপয় পালি গ্রন্থে পালি যে কেবল বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থকে বুঝায় তাহাব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যথা “সামান্যকালস্বত্রাথ কথ্য” নেবা পালিয়ম্ ‘ন অথ কথায়ম্ দীশতি” অর্থাৎ ইহা মূল বা অর্থ কথায় অর্থাৎ টীকায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; যথা লঘু পদ্ম পুণ্ডরীক “পালিয়ম্ পান বুদ্ধতি কেন অথেন” অর্থাৎ তাঁহাকে মূলগ্রন্থে কিজন্য বুদ্ধ বলা যায়? পুনশ্চ যথা মহাবংশ “পিটকতায় পালিন স তস অথকথান” অর্থাৎ মূল ত্রিপিটক এবং তাহার অর্থ কথ্য ইত্যাদি আধুনিক পালিগ্রন্থের ভূরিং উদাহরণ দ্বারা পালিমূল বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের একটি বিখ্যাত নাম তাহা সপ্রমাণ হইবেক। পালি ভাষায় মূল ধর্ম গ্রন্থ রচিত বলিয়া পালি শব্দ মূল গ্রন্থকে বুঝাইত এবং ইহার টীকা অন্য ভাষায় রচিত, তাহা উপরের লিখিত প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সাধারণতঃ পালি মগধ দেশীয় ভাষা, এই প্রাকৃত ভাষার নাম মাগধী, কিন্তু ইহা দৃশ্য কাব্যের প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে “পালি ভাষা” এই নামের পরিবর্তে মাগধী ভাষা এই নামে পালি ভাষা বুঝা-

ইত। পালি ভাষায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্ট জন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্বে ইহা মগধ দেশের ভাষা ছিল, তখন ইহাকে মাগধী বলিত, পবে সিংহল দ্বীপে ইহা পালি নামে খ্যাত হইল। এক্ষণে পালি ভাষা কথোপকথনের এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের মূল প্রাকৃত ভাষাকে বুঝাইতেছে, এজন্য ইহাকে আব মাগধী ভাষা বলা যায় না, তাহা দৃশ্য কাব্যের স্বতন্ত্র ভাষা। ভট্ট লাসেন কছেন পালিব সহিত সৌবসেনী ও মহা রাষ্ট্রীর সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহা হটলে ইহাকে মাগধী বলা যাউতে পারে না, এজন্য আমরা তাহার কথা অপ্রামাণ্য বোধ করিলাম। ববকচির প্রাকৃত প্রকাশের মহাবাঙ্গী ও সৌরসেনীর সহিত পালি ভাষাব কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধগণের ৩ টি প্রাকৃত ভাষা যথা প্রথম গাথা, দ্বিতীয় প্রস্তরের খোদিত কীর্তিস্তম্ভের ভাষা, ও ৩য় পালি ভাষা। আনাদিগের মতে অশোকের লাটের ভাষার সহিত আধুনিক পালিব সহিত অতি অল্প মাত্র ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বলিত বিস্তারের গাথা, নেপালীয় বৌদ্ধ ভাষা।

শাক্য সিংহ মাগধী অর্থাৎ পালিভাষায় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার শিষ্যবর্গ এই সকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া উহা প্রাকৃত ভাষায় প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। পালি

ভাষায় কর্কশ শব্দ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের বাক্য সুমধুর করিবার জন্য এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ইহাব সংস্কৃত ভাষার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইবেক যথা—

সংস্কৃত	পালি
অভিধর্ম	অভিধম্ম
অমৃত	অমত
অর্হত	অরহ
অর্থকথা	অথকথা
শ্রুতি	সুতি
মম	মস্তো
মার্গ	মাগেগা
ম্লেচ্ছ	মিলান্সো
নির্ঝাণ	নিব্বানম্
বর্ণ	বালো
যবন	যোন
পর্কত	পব্বত
অস্থ	অসো
রক্ত	রত্ত
ব্রহ্ম	বাম্ম
শিষ্য	শিষণ
সপ্প	সপ্প
সিংহ	সিহো

মগধরাজ মহা মহেন্দ্র ৩০৭ খৃঃ পূঃ সিংহল দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন, সেই সময় তাহার দ্বারা পালিভাষা তথায় প্রচলিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৫০০ শতাব্দীতে বুদ্ধ ঘোষ মগধ দেশ হইতে সিংহল দ্বীপে গমন করিয়া তথায় পালি

ভাষার বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পালিভাষায় রচনা করিয়া অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কচ্ছয়কৃত পালি ব্যাকরণ অতি প্রসিদ্ধ। আমাদিগের পানিনি ব্যাকরণের ন্যায় বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থের মান্য করিয়া থাকেন। সিংহল দ্বীপের সকল বৌদ্ধমঠে উহা সাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহা বৌদ্ধ স্মৃতির গণ একাল পর্যন্ত বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনেকগুলি পালি ব্যাকরণ আছে, তাহার মধ্যে কচ্ছয়কৃত ব্যাকরণ প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। অধ্যাপক এগ্‌লিং কছেন কচ্ছয়ণের পালিব্যাকরণের নিয়মামুসারে কাস্ত্র রচিত হইয়াছে।

এই পালি ব্যাকরণ ৮ ভাগে বিভক্ত। এই ৮ ভাগ বিবিধ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন যথা।

সিদ্ধান তিলোকমহিতম্ অতিবন্দিতং গগান
বুদ্ধন চ ধম্মমমলান্ গগনমুও মঞ্চ
সথুস তস বচনাথ বরান্ সুবোধন
ব্যাখ্যামি স্তুত্বহিত মেথা সুসঙ্কপান্
মোদান জিনিরিত মেয়েন বুদ্ধলভন্তি
ততপি তসবচনাথ সুবোধনেন
অধ্যম চ অক্ষর পদেষু অমোহভাব
সিদ্ধম্বিক পদ মতো বিবিধন শৃঙ্খল

অর্থাৎ “আমি জিলোক আরাধ্য বুদ্ধ দেব, তথা নির্মল ধর্ম, ও স্মৃতির মণ্ড-

লীকে বন্দনা করিয়া সন্ধি করের গভীরার্থ সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। জ্ঞানিগণ বুদ্ধদেবের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চির সুখসম্পাদন করিয়া থাকেন। এক্ষণে হাঁহারা এতাদৃশ বথার্থ স্তুত্বের আশা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের নানা প্রকার বাক্য সংযোগ শ্রবণ করুন।”

পালি ব্যাকরণের সূত্র যথা।

- ১। অথ অক্ষর সম্ভাভো।
- ২। অক্ষর পাদোয় একচত্বারিংশিন্।
- ৩। তথো উদাস্ত সুর অথ।
- ৪। লহ মত্ব তয় রথ।
- ৫। অগ্র দীঘ।
- ৬। শেষ ব্যঞ্জন।
- ৭। বগ পঞ্চা পঞ্চাশ মন্ত।

এইরূপে কচ্ছয়কৃত ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বার্তিকদ্বারা গ্রন্থ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে কোন স্থানে পানিনি সূত্র অবিকল গৃহীত হইয়াছে যথা পানিনি “অপাদানে পঞ্চমী” তথা কচ্ছয়কৃত “অপাদানে পঞ্চমী।” এই গ্রন্থে অনেক বৌদ্ধ তীর্থ স্থানের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে যথা শ্রবস্তী, পাটলী, বারানশী ইত্যাদি—

রূপসিদ্ধি এই ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকা কর।

বালাবতার—এখানি সচরাচর প্রচলিত পালি ব্যাকরণ। ইহা কচ্ছয়ণের

* এই স্থলে সন্ন্যাসবাদ মাজ করা হইয়াছে।

ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার, এবং অপৰ্য্যাপ্ত সিংহলে এতদেশীয় লম্বু কৌমুদীর জায় আদরণীয়। বাল্যাবতার কচ্ছয়ণের ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন নিয়মানুসারে সংকলিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সন্ধি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম, তৃতীয় অধ্যায়ে সমাস, চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্ধিত, পঞ্চম অধ্যায়ে অখ্যাত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে কীটক, ও উৎপাদি হ্রস্ব, এবং সপ্তম অধ্যায়ে কারক ও বিভক্তি ভেদ। গ্রন্থারম্ভে গাথা যথা বুদ্ধনতি দত্তিবন্দিত বুদ্ধম্ ভুজবিলোচনন্ বাল্যাবতারণ ভাষিষন্ বালানান্ বুদ্ধি বুদ্ধিয

অর্থাৎ প্রস্তুত পদগোপ ন্যায় আনন্দ বর্দ্ধক বুদ্ধদেবকে তিনটী প্রণাম করিয়া স্নকুমারমতি বালকের জ্ঞানোন্নতি নিমিত্ত বাল্যাবতার রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।*

দেবরক্ষিত নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার মূল মুদ্রিত করিয়াছেন।

রূপসিদ্ধি। এখানিও কচ্ছয়ণেব পালি ব্যাকরণের সারসংগ্রহ কিন্তু বাল্যাবতারের ন্যায় প্রোজল ও শিক্ষোপযোগী নহে। যে সময় মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় এই ব্যাকরণ রচিত হয়। গ্রন্থকার কচ্ছয়ণের একজন প্রাচীন সংকলন কর্তা, তিনি মূলগ্রন্থের বানানাদি হইতে বিস্তর উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন যথা—

* পালি ও গাথা সমূহ এই প্রস্তাবে অক্ষরার্থ অনুবাদ করি নাই, কেবল মর্দ্দানুবাদ করিয়াছি মাত্র।

কচ্ছয়ণন্ চ চরিয়ন্ নমিষ্য
নিশ্যেয় কচ্ছয়ণ বানানাদিন্
বাল্যাববোধাথ যুজন করিয়ন্
ব্যাখ্যান স্থানানন্দন পদরূপসিদ্ধি।

অর্থাৎ “আচাৰ্য্য কচ্ছয়ণকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃত বানানাদি পৰ্যালোচনা করতঃ বালকগণের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত, কয়েক কাণ্ডে বিভাগ করিয়া এই পদ রূপসিদ্ধি রচনা করিলাম।

গ্রন্থকার আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন যথা—

বিখ্যাত আনন্দ থেরাভৃত্তয় বর গুরু নাম
তন্ম পালি ধজ্ঞানন
শিষ্যে দিপাক্ষরাখ্য দমিল বসুমতি
দিপালধ্যাঙ্গ কাশ
বালাদিচ্ছদি বাসদিত্য মধিবলান
নসনান যোতি ও
সোয়ম্ বুদ্ধ পিয়ভো যতি ইমানুজ্জকান
রূপ সিদ্ধিন অকাশী।

অর্থাৎ এই নির্দোষ রূপসিদ্ধিগ্রন্থ বিখ্যাত আনন্দ শিষ্য তাম্রপনি (সিংহল) প্রদেশেব ধ্বজ স্বরূপ ও দামিল দেশের (চোল) দ্বীপ স্বরূপ এবং “বুদ্ধপ্লিব” (বুদ্ধপ্রিয়) খ্যাত দীপাক্ষর রচনা করেন। তিনি বালাচিদ্দি ও চুডামণিক্য নামক মঠস্থরের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম উজ্জল প্রভা ধারণ করিয়াছিল।

• সিংহল দেশীয় প্রবাদ অনুসারে গ্রন্থকার সিংহল দ্বীপবাসী ছিলেন।

মহাবংশে উল্লেখ আছে মহাবাজ পরাক্রমবাহু চোল দেশীয় (তাজোর) একজন হুবিরের নিকট হঠাতে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন, ইহাতে বোধ হয় উক্ত নৃপতির সময় হঠাতে তাজোর দেশীয় জ্ঞানী ও নানা শাস্ত্রদর্শী বৌদ্ধগণ সিংহল দ্বীপে ঔপনিবেশ করিয়াছিলেন। রূপসিদ্ধি গ্রন্থকারের মুখবন্ধ শ্লোকানুসারে তাঁহাকে চোল দেশবাসী বোধ হইতেছে।

মৌগ্গল্যায়ণ ব্যাকরণ। এখানি বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু মৌগ্গল্যায়ণ প্রণীত। “বিনয়াখসমুচ্চয়,” পক্ষীকাপদীপ, গ্রন্থে এবং বিখ্যাত আচার্য্য মেধাক্ষরের গ্রন্থে এই গ্রন্থকারের বিশেষ গুণকীর্তিত হইয়াছে। মৌগ্গল্যায়ণ ১১৫৩ হঠাতে ১১৮৬ খৃঃ অব্দ মধ্যে পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে অতুরাধা পুরের খুপারাম মঠের পুরোহিত ছিলেন। এখানি কচ্ছরগুরুত ব্যাকরণ ও সদানীতি হঠাতে বিভিন্ন প্রকার রীতিতে রচিত। সমুদায় ব্যাকরণ ষষ্ঠ ভাগে বিভক্ত যথা—প্রথম সন্ধি, দ্বিতীয় সিদ্ধান্তি, তৃতীয় সমাস, চতুর্থ নাদি পঞ্চম খাদি, এবং ষষ্ঠ ত্যাগি। গ্রন্থের আরম্ভ ব্যাক্য যথা—

সিদ্ধ সিদ্ধ গুণম সাধু নমাসিদ্ধ তথাগতম
সধম্ম সজ্জম ভাষিষন্ মগধনশক লক্ষণম।

অর্থাৎ প্রথমে বিনীতভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্য, এবং সজ্জকে বন্দনা করিয়া, আমি মাগধী ভাষার ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করিতেছি।

গ্রন্থের সমাপ্তি শ্লোক যথা—

তস্য ভূতি সমাসেন বিপুলার্থ পকাশিনী
রচিত পুন তেনেব সমাসু যোত কারিন।

এই কয়েকখানি সচরাচর প্রচলিত ব্যাকরণ ভিন্ন পালিভাষার দীপানি, কচ্ছরগ ভেদ টীকা, মহাশব্দনীতি, প্যায়োগ-সিদ্ধি, গরল ধেনীসনা, পক্ষিকা পদীপ, অক্ষত পদ প্রভৃতি ব্যাকরণ আছে।

বৃত্তোদয়—এখানি প্রসিদ্ধ পালিচ্ছন্দ গ্রন্থ। ইহা গদ্য ও পদ্যে রচিত। এবং পিঙ্গল, সুব্রতাকর প্রভৃতি প্রামাণিক সংস্কৃত ছন্দ গ্রন্থের আদর্শে লিখিত। গ্রন্থকার আরম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন।

নমাথু জন শান্তন তমশাস্তন ভেদিনো
ধক্ষুজালস্ত রুচিন মুনিন্দোদাতরচিনো
পিঙ্গলাচার্যা দিহিহুন্দানম দিতমপুরা
সুদু মাগধী কানন তন ন সাধতি

যথিচ্ছিতম।

ততো মগধ ভাষের সত্যবস্তু বিভেদনন
লক্ষ লক্ষণ সমুত্তন পশানথ পদাকমম
উদম বৃত্তোদয়ন নামা লোকীয় চন্দ্র

নিশিতন্

অব ভিশ্যনহন দানি তেশম সুখ বিবুজ্জিয়।

অর্থাৎ “মুনীন্দ্রকে নমস্কার, যিনি চন্দ্রের ন্যায় কিরণে ধর্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেন, এবং যিনি মানবজাতির মনের তিমির নাশ করেন। পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব পণ্ডিতগণের রচিত ছন্দ গ্রন্থ দ্বারা বিশুদ্ধ মাগধী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা যায় না, এজন্য অতি সুগম মাগধী ভাষায় এই বৃত্তোদয় রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।” ইহাতে উত্তমরূপ মাত্রা ও বর্ণের প্রভেদ

দেখাইয়া, প্রচলিত ছন্দ সমূহের রচনার
রীতি উদাহরণ সহকারে প্রদর্শিত হইল।
এই গ্রন্থ ৬ অংশে বিভক্ত। গ্রন্থকারের
নাম সঙ্গ রক্ষিত।

ধাতু মঞ্জুষা—এখানি শিলাবংশ নামক
বৌদ্ধ স্থবির কৃত। পালি ভাষার ধাতু-
পাঠ। ইহা কচ্ছয়ণের ব্যাকরণ সম্বন্ধে
গ্রন্থ, এজন্য ইহার অপর নাম কচ্ছয়ণ
ধাতু মঞ্জুষা। গ্রন্থের প্রাবল্ল্য শ্লোক যথা—
নিকন্তি নিকর পার পারাবারত্তগান্ মুনিন্
বন্দিত ধাতু মঞ্জুবান্ ত্রমি পবচনান্ যশান্
সুগত গম মগম তন তন ব্যাকরণানিচ
ইত্যাদি

অর্থাৎ শব্দ সমুদ্র পার হইয়াছেন,
এতাদৃশ বুদ্ধদেবকে বন্দনা করিয়া সঙ্ক-
র্মের মার্গ স্বরূপ এই ধাতুমঞ্জুষা রচনা
করিলাম, বৌদ্ধধর্ম, বিবিধ ব্যাকরণ উত্তম
রূপে আলোচনা করিয়া এই ধাতু পাঠ
সঙ্কলন করিলাম।

গ্রন্থকাব এইরূপ আপনার পরিচয়
দিয়াছেন যথা

“রচিত ধাতুমঞ্জুষা শিলা বংশেন ধীমতা
সধম্ম পঙ্কেকহ রাজহংস
অসিখ ধামাং থিটি শিলাবংশ
যক্ষাদিলে নাম্য নিবাস বাসী
যতীষ্মরে সো জমিদান্ আকাশী—”

অর্থাৎ এই ধাতুমঞ্জুষা প্রথম পাঠার্থি-
গণের শিক্ষার জন্য পণ্ডিতবর শিলাবংশ
রচিত। এই শিলাবংশ একজন যক্ষাদি-
গণেন অন্ধিরের পুরোহিত ও তথায় অব-
স্থিতি করেন; তাঁহার বাসনা বৌদ্ধ ধর্ম

বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া। রাজহংসের
শ্রায় ধর্ম গ্রন্থরূপ পদ্মাবনে বিরাজ করুক।

ধাতুমঞ্জুষা ডন এনড্রিউ সিল ভিয়া
বাত্ত বাস্ত দেবনামক পৃষ্ঠদক্ষীণবল্লী প-
ণ্ডিত ইহা সিংহল ও ইংরাজী ভাষার অনু-
বাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিধান পদীপি—একখানি সংস্কৃত
অমর কোষের শ্রায় প্রসিদ্ধ পালি অভি-
ধান। ইহা অমরকোষের প্রণালীতে
আদ্যোপাস্ত রচিত।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ যথা
তথাগতো ককণাকবো করো
পায়ত্তো মোসজ্জ সুখাপ পদান্ পদান্
অক পযাথান কলিসম্ ভাব ভাব
ননামি তান্ কেবল ছুংথ করণ্ করণ্

অর্থাৎ আমি দয়ার সিদ্ধ তথাগতকে
বন্দনা করি, যিনি নির্ঝাঁপ আপনার আয়-
ত্তাধীন বিবেচনা করিয়াও অন্যের সুখ-
বর্দ্ধন করত স্বয়ং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের
অপার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রন্থ
রচনার উদ্দেশ্য বৃত্তান্ত যথা

সগ্গ কাণ্ডোচ ভূকাণ্ডো
তথা সামান্য কাণ্ডকান্
কাণ্ডাট্টত্তান বিত এস
অভিধান পদীপিকা
তিদীব মাহিয়ান ভূজপ বশাধি
সকলাথ সমাভায় দিপা নিয়ান
ইহও কুশল মতীম সনারো
পাত্ত হোতি মহা মুনিন বচন
অর্থাৎ এই অভিধান পদী পিকা ত্রি-
কাণ্ডে বিভক্ত যথা স্বর্গ, পৃথিবী ও সামান্য

কাণ্ড। ইহাতে স্বর্গ, পৃথিবী এবং নাগ-
দেশের সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে।
বুদ্ধিমান্ বাক্তি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন কবিলে
মহামুনির সকল বাক্য অবগত হইবেন।
এই গ্রন্থ লক্ষ্যমিতি পরাক্রমবাহুর রাজ্য
কালে যোগগম্ভায়ণ কর্তৃক রচিত। পরা-
ক্রমবাহু ১১৫৩ খৃঃ অঃ রাজ্যারম্ভ করেন।
উপরের লিখিত প্রবন্ধে পালিভাষা সম্ব-
ন্ধীয় ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ছন্দোগ্রন্থ, এবং
অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হ-
ইল, এক্ষণে পালিভাষায় অন্যান্য সাহিত্য
গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে সাবোদ্ধৃত
হইল। আমরা পালি ভাষার সুপণ্ডিত নহি
এতদ্ভুক্ত সুবিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ এই
প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা বা বর্ণাস্তম্বিত বা
অসুবিধা ঘটতি দোষ মার্জনা করিবেন

মহাবংশ—ইতিপূর্বে সংস্কৃত ভাষায়
নৃপতি বা কোন মহামুনির জীবনী কিম্বা
কোন দেশের ইতিহাস সঙ্কলনের পদ্ধতি
ছিল না, কেবল পুরাণ ও বৃহৎ কথাব
ন্যায় অলৌকিক গল্প পরিপূর্ণ গ্রন্থে আমা-
দিগের যাহা কিছু পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত হই-
য়াছে তাহাতে অণুমাত্র সত্য আধিকার
করা দূরপরাহত। আমাদের সংস্কৃতে
প্রকৃত পুরাবৃত্ত মধ্যে কেবল একমাত্র
রাজতরঙ্গিণী প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহাও
আধুনিক। রাজতরঙ্গিণী ১১৪০ খৃঃ অঃ
সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু পালিভাষায়
রচিত সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ-
নিচয় তাহা অপেক্ষা অতি প্রাচীন দৃষ্ট
হইয়া থাকে। সিংহল দেশীয় পালি

বৌদ্ধ ইতিহাসসমূহ প্রকৃত পুরাবৃত্তের
প্রণালীতে সঙ্কলিত, তাহা হইতে আমরা
সিংহল দ্বীপের অনেক বৌদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত
প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারিতেছি।
পালি বৌদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে
মহাবংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন।
মহাবংশ নামে পালিভাষায় দুইখানি
পুরাবৃত্ত প্রচলিত, কিন্তু দুইখানি গ্রন্থের
বিবরণে পরস্পর অনেকা নাই। ইহার
মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থখানি অম্ববাধাপুরের
উত্তর বিহাবেব কোন স্থবিরকর্তৃক রচিত
কিন্তু কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা ইহা
সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা কোন বিবরণ
অবগত হইতে পারা যায় না। সিংহ-
লেশ্বর ধাতুসেন এই গ্রন্থের পাঠ প্রবণ
করিতেন; তিনি ৪৫৯-৪৭৭ খৃঃ অব্দের
মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাচীন
মহাবংশ গ্রন্থখানি ইহার পূর্বের রচিত।
এই গ্রন্থে মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৩০২
খৃঃ অঃ) বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ
খানি প্রথম গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট এবং
সম্পূর্ণ। ইহাতেও মহাসেনের মৃত্যু
পর্য্যন্ত ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এই
গ্রন্থ মহানামকৃত। গ্রন্থমধ্যে ৫৪৩ খৃঃ
পূঃ হইতে সিংহল দ্বীপের প্রাচীন ইতি-
বৃত্ত লিখিত হইয়াছে। মহাবংশ এক
প্রকার বৌদ্ধদিগের পুরাণ বলিলেও হয়,
এতদ্ভুক্ত তাহাতে আমাদের পুরাণের
স্তায় অনেক অলৌকিক বিবরণ আছে।
কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক

বিবরণ সমূহ সুপ্রণালী সহকারে বিবিধ প্রাচীন সিংহলদেশীয় গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে। আমাদিগের সংস্কৃত পুবাণের ন্যায় এ গ্রন্থখানি কেবল “কা-হিনী” নহে। মহাবংশে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। মহানামকৃত মহাবংশ ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে সংকলিত। ইহা একশত অধ্যায়ে বিভক্ত এবং আদ্যোপান্ত পালি কবিতায় গ্রন্থিত। গ্রন্থকার ইহা টীকাসহ রচনা করিয়াছেন।

মহাবংশের আর এক অংশ আছে, তাহার নাম সুলুবংশ। এই অংশে পরাক্রম বাহুর (১২৬৬ খৃঃ অব্দ) রাজ্যশাসন পর্যন্ত কীর্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কীৰ্ত্তি শ্রীমহারাজের অমুজ্জানুসারে ও তিব্বতীয় দ্বারা রচিত।

অর্জু টরনার মহোদয় দ্বারা মহাবংশ অনুবাদ সহ ৩৭ অধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

দ্বীপবংশ—মহাবংশের ত্রায় এখানিও

সিংহলদেশীয় প্রসিদ্ধ পালি ইতিবৃত্ত। মেং টরনার সাহেব অনুমান করেন এই গ্রন্থ উত্তর বিহারের বৌদ্ধ স্থবিগণের মহাবংশ গ্রন্থ। দ্বীপবংশ সুপ্রণালী অনুসারে রচিত নহে, এজন্য কেহ অনুমান করেন এই গ্রন্থ এক সময়ে এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

পালি ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে অতাকম্ব বংশ, দাতা বংশ, ব্রহ্মজালহৃত্ত, জাতক (পঞ্চ) কুদ্ধক পাঠ, স্তুত্বে নিপাত, মহা পরিমর্কিণ স্তুত্বে, ধর্মপদ, প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ এবং সিংহল দেশে প্রচলিত।

পালিভাষা এক্ষণে সিংহল দ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। এই ভাষার অনেক গ্রন্থ চাইল্ডার্স, ফস্‌বুল, ক্রফ, ও কুমার স্বামীর বস্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীরামদাস সেম।

নীতিকুসুমাজলি।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৪২

বিশেষ ঘণ্টার সহ, নিদ্রাভিলে অহরহ,
বালুকায় তৈল পেতে পার।
পান করি মৃগভৃক্ষা, সলিল পানের তৃষ্ণা,
বুঝি কভু হইবে সংহার ॥

কদাচিত্ পর্বাটন, করিয়া মানবর্গণ,
শশস্বদ পাইতেও পারে।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরামিলে পর,
কিছু ফল নাই এ সংসারে ॥

৫০

মকরের ভয়যুক্ত, দস্ত থেকে করি মুক্ত,
সদা মণি উদ্ধারিয়া লও।
ভরজেতে অনিবার, তরলিত পায়াবার,
সস্তরিয়া পার হবে হও ॥
রোষযুক্ত বিষধর, ফণা ঘোর ভয়ঙ্কর,
ধর গিয়া কুহুম আকারে।
কিন্তু ভাই নিরস্তব, মূর্খে আরাধিলে পর,
কোন ফল নাই এ সংসারে ॥

৫১

যদবধি তব, ছিলহে শৈশব,
তদবধি ক্রীড়াসক্ত।
যৌবন রসাল, ছিল যতকাল,
তরুণীতে অমুরক্ত ॥
এলো বৃদ্ধকাল, সহ চিন্তাভ্রাল,
সতত রহিলে মগ।
পরম ঈশ্বরে, আপন অন্তরে,
কভু না করিলে লগ ॥

৫২

দিবস যামিনী আর প্রদোষ প্রভাত।
শিশির বসন্ত সদা করে গতান্নাত ॥
কালক্রীড়া রত, গত হইতেছে আয়ু।
তথাপি না পরিত্যাগ করে আশা বায়ু ॥

৫৩

শরীর গলিত, কেশ হইল পলিত।
মুখ থেকে দস্তগুলি হইল খলিত ॥
করেতে ধরিয়া দণ্ড কাঁপিতেছে কার।
তথাপিও তত্ত্ব আশা না ছাড়ে আমায় ॥

৫৪

যদবধি ধন, কর উপার্জন,
নিজ পরিজন করয়ে মেহ।
বখশ জরায়, জর্জর করায়,
তখন ধরায় নাহিক কেহ ॥

৫৫

অষ্ট কুলাচল আর সাতটা সাগর।
রুদ্র দিনকর আর ব্রহ্মা পুরন্দর ॥
আমি তুমি, তারা কেহই না রবে।
কেন বল মিছামিছি শোক কর তবে ॥

৫৬

কাম ক্রোধ মোহ করি পরিহার।
কেবল সঙ্কম কর আত্মা আপনার ॥
আত্মজ্ঞান হীন যেই, সেইজন মুঢ়।
তাহারেই পচাইবে নরক নিগূঢ় ॥

৫৭

দেবতামন্দির কিবা তরুমূলে বাস।
ভূমিতল শয্যা, আগ্নেয়গুপ্ত বাস ॥
সকল প্রকার কস্মভোগ পরিহার।
বৈরাগ্য স্তম্ভদ বল না হয় কাহার ॥

৫৮

অনর্থের মূল বিস্ত, মমেতে ধিয়াও নিত্য,
নাহিক তাহাতে স্তম্ভলেশ।
ধনভাগে পুত্রগণ, নানা দ্রোহ পরায়ণ,
নীতি শাস্ত্র বর্ণিত বিশেষ ॥

৫৯

কে তব ললনা, কে পুত্র বলনা।
কি আশ্চর্য্য এসংসারে।
তুমি কার ছেলো, কোথা থেকে এলো,
মনে ভাব ভাই আরে ॥

৬০

ধন জন কি যৌবন, মদে মত্ত হয়ে মন,
কর্য না কর্য না অহংকার । •
এসব বিভবছাল, দেখিতে দেখিতে কাল,
নিমেষেতে করয়ে সংহার ॥
মারাময় এসংসারি, ওরে মন অনিবার,
ভাবনা করিয়া এই সার ।
ব্রহ্মপদে আশ্রমজ, ভজ ভক্তিভাবে ভজ,
তোরে বল কি বলিব আর ॥

৬১

কমলের দলে জল, সন্ধ্যা করে টল টল,
তার চেয়ে জীবন তরল ।
ব্যাধি ঘোর বিষধর, গ্রাসে গ্রস্ত যতনর,
শোকানলে প্রতপ্ত সকল ॥

৬২

তবু চিন্তা কর ভাই অবিরত চিন্তে ।
পরিহার কর চিন্তা বিনশ্বর বিস্তে ॥
কণেক সজ্জন সঙ্গ কর যত্ন করি ।
সেইমাত্র ভবসিদ্ধ তরিবার তরী ॥

৬৩

মদে অন্ধবুদ্ধি করি, কর্ণ অবঘাত করি,
তাড়াইয়া দেয় মধুকরে ।
তারি গুণ্ড শোভা হত, ভুগিয়ে মনোমত,
বিকচ কমল বনে চরে ।

৬৪

মৃণাল কমল দল যাহার আহাব ।
মত্ত মাতঙ্গিনী সহ যে করে বিহার ॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রময়ে যেই কন্দর নিকরে ।
যাহার পান্থীর পয় পর্বত নিকরে ॥
সেই বন্য করী নিপতিত নরকরে ।
ভূপাশি চিটাইয়া দেহ রক্ষা করে ॥

৬৫

গ্রহ পীড়া প্রাপ্ত নিশাকর দিনকর ।
অবরুদ্ধ বিষধর আর করিবর ॥
মতি মানে ধনহীন করি বিলোকন ।
বিধাতাই বলবান্ জানিহু এখন ॥

৬৬

আকাশ একান্তে চরে, বিহঙ্গম পরিকরে,
তারিও আপদ ছাড়া নয় ।
সাগরেতে মীনচয়, অগাধ সলিলে রয়,
চতুর চাতরে নষ্ট হয় ।
কি লাভ উত্তম স্থানে, কিবা কৰ্ম্ম অমুষ্ঠানে
বিধি-বিধি কে করে লঙ্ঘন ।
বিপদ প্রসর করে, বসি কাল দ্রুতন্তরে,
সকলেরে করে আকর্ষণ ॥

৬৭

সিংহ নখে বিদারিত, করিকুন্ত বিগলিত,
কুধিরাক্ত চাক মুক্তা ফলে ॥
বনে ভিন্নী দেখি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়,
উঠাইয়ে নিল করতলে ।
দেখি তার গুহ্রতর, স্বকঠিন কলেবর,
দূরে ফেলি করিল গমন ।
কুস্থানে পড়িলে পর, মনস্বী মহুম্যবর,
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হন ॥

৬৮

হে অশোক তরুবর, কিবা কার্য্য নম্রতর
শাখা আর উন্নত মস্তক ।
কিকাজ কোমল দল, নীলারসে চলঢল,
কমনীয় কুমুম স্তবক ॥
যেহেতু তোমার তলে, নিবন্ধ পথিকদলে,
খিন্ন হরে করি কত স্তব ।

মুহু মধুযুক্ত ফল, না পাঠয়ে সুবিকল,
অন্তরেতে প্রাপ্ত পরিভব ॥

৬৯

সারহীন হে শিমুল, অতি দূরে ভব মূল,
কণ্টকে আবৃত পুন কাষ ।
ছায়াশূন্য তব দল, যে আছে তোমাব ফল
বানবেও নাহি খাষ তায় ॥
কুসুমোতে নাহি গন্ধ, নাহি মাত্র মকবন্দ,
কোন গুণ নাহিক তোমার ।
ধাক, থাক, আমি যাউ, কিছুমাত্র ফল নাই,
তবান্দ্রে থাকিতে আমাব ॥

৭০

পল্লবন মনে ভাবি ধায় হংসদল ।
সুরভির লালসায় ভ্রমর চঞ্চল ॥
স্বাচ্ছন্দ্য ফল ভাবি ব্যস্ত পথিক সকল ।
মাংস ভাবি গিধিনী শকুনী সুবিকল ॥
দূরে থেকে দেখি সমুন্নত পুষ্পচয় ।
সাবহীন মিথ্যা সে উন্নতি সুনিশ্চয় ॥
ওরে রে শিমুল গাছ বল কি কারণ ।
চিরকাল অগতেরে করিছ বঞ্চন ॥

৭১

শুকপক্ষীর উক্তি ।

কাঞ্চন পিঞ্জবে, থাকি নিবস্তবে,
নৃপতির কবে, সাজিত কোমল কাষ ।
থাই সুরসাল, দাড়িষ পমাল,
পান করি ভাল, পয়ঃসুখা পিপাসায় ॥
সমাজেতে হাম, পড়ি অবিশ্রাম,
রাম রাম নাম, তবু কেন হায় হায় ।
কানন ভিতরে, কোন তরুণয়ে,
জনমকোটারে, সদা মম মন ধায় ॥

৭২

মিত্রে কর বশীভূত বিমল ব্যাভারে ।
রিপুজয় কর যুক্তি বল সহকারে ॥
লোভিজন ধনদানে, কার্ষোতে জীষ্মরে ।
যুবতীরে প্রেমে, দ্বিজগণে সমাদরে ॥
সমভাবে বশকর কুটুম্বনিকরে ।
রাগীপ্রতি স্তুতি আর ভক্তি গুরুববে ॥
মুখেরে নানা কথা কয়ে, বসিকেরে রস ।
শীলতা গুণেতে কব সকলেরে বশ ॥

৭৩

নৃপতির নীতি আর গুণী বিনতি ।
যুবতীর লজ্জা, দম্পতির স্থিতি বতি ॥
গৃহের শোভন শিশু, বুদ্ধির কবিতা ।
তম্বব লাবণ্য, মতি স্মৃতি সমবিতা ॥
দ্বিজের প্রশান্তি ক্ষমা জোড়াসক্ত জনে ।
সতের সুস্থতা, গৃহাশ্রম শোভা ধনে ॥

৭৪

চিন্ন হইলেও তব উঠে পুনবায় ।
ক্ষয় পেয়ে পূর্ণ হয় শশাঙ্গের কাষ ॥
এইরূপ চিন্তা কবি সদাশয়গণ ।
বিষম বিপদে তপ্ত কদাচ না হন ॥

৭৫

কমল আকবে, কমলনিকরে,
দিনকব ফুলকাব ।
কিবা চক্রবাল, কুমুদিনী জাল,
বিকাশে বিধুর করে ॥
প্রার্থনা বিহনে, জলধবগণে,
কবয়ে সলিল দ্বান ।
বিনা আবাহন, পরার্থে স্নেহন,
করেন হিত বিধান ॥

৭৬-

ফলকরে নত হয় বিটপী নিকর ।
নবজলে ভূমে নামি পড়ে জলধব ॥
অক্ষুণ্ণত স্নজনের যদি হয় ধন ।
স্বভাবত পরহিতে কবেন যোজন ॥

৭৭

রূপগতা হবে যশ, ক্রোধে গুণচয় ।
ক্ষুধার মর্যাদা, দন্তে সতানশ হয় ॥
বিপদে দৈবর্ঘ্যের নাশ, বাসনেতে ধন ।
বৈধক্রিয়া পরিহারে বিনষ্ট ব্রাহ্মণ ॥

৭৮

কুরতায় কুলনাশ, মদেতে বিনয় ।
অসাধা চেষ্টায় হয় পুঙ্খার্থ ক্ষয় ॥
দরিদ্রে দশায় সমাদর পবিগত ।
মমতায় আত্মাব প্রভাব হয় হত ॥

৭৯

বল বল কাবে বল, নাবীব যৌবন বল,
তোষানোদ পর প্রত্য্যাশীর ।
প্রতাপ নৃপতিগণে, সত্য বল সাধুজনে,
সুগময় সামান্য ধনীর ॥
ঠক্দের বাক্ছল, পণ্ডিতের বিদ্যা বল,
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যতি-বল ।
কুলের একতা বল, যথা ব্যয়ে বিস্ত ফল,
শাস্ত-বল বিবেক কেবল ॥

৮০

দলাদলী প্রিয়, হয়ে বিদ্যাবান্ জ্ঞানী ।
ধনহীন গৃহী, আর পরাধীন মানী ॥
পরবশ স্থরী, তথা সধন রূপণ ।
বৃদ্ধ হয়ে নাহি করে ভীর্থ পর্য্যটন ॥
সুপতি কুম্ভীরবশ, মূর্থ অকুলীন ।
পুরুষ হইয়ে হয় নারীর অধীন ॥

সংক্রিয়া বিহীন ব্রহ্মজ্ঞানী পদ পেয়ে ॥
কিবা আর হাস্যান্দ ইচ্ছাদের চেয়ে ॥

৮১

উৎপাটিতে যিনি পুন কবেন রোপণ ।
প্রফুল্ল হইলে পুষ্প করেন চয়ন ॥
সুতরুণ তরুগণে পোষেন যতনে ।
প্রোরতকে নত উন্নয়ন নতগণে ॥
ছাড়াইয়া দেন যথা জড়াঅড়ী হয় ।
বাহির করেন ঘোর কণ্টকী নিচয় ॥
যেখানে দেখেন তরু হঠাতেছে স্নান ।
সেইখানে জলসেচ কবেন প্রদান ॥
প্রয়োগ নিপুণ হেন মালীর সমান ।
সর্বদা থাকুন সুখে রাজা কীর্ত্তিমান্ ॥

৮২

কুসুম স্তবকাকার, দ্বিপ্রকার ব্যবহার,
প্রাপ্ত হন জ্ঞানবান্ মহুধ্য নিকরে ।
সর্বলোক শিরোপরে, অপরূপ শোভাধরে,
অথবা বিশীর্ণ হন কানন ভিতরে ॥

৮৩

অনল শীতল হয়, সলিল সম্পাতে ।
চত্রে তালুকর, করী অক্ষুশ আঘাতে ॥
গো গৃদ্ধত বশীভূত লাঠীর প্রহারে ।
ভেষজ্ঞেতে ব্যাধি, মন্ত্রে গরল নিবারে ॥
সর্বত্র ঔষধ শাস্ত্রে সুবিহিত আছে ।
সকল ঔষধ বার্থ মূর্থদের কাছে ॥

৮৪

সজ্জন-সঙ্গমে বাহ্যা, পরগুণে প্রীতি ।
পত্নী প্রতি রতি, আর অপযশে ভীতি ॥
গুরুজন প্রতি যথা নম্র আচরণ ।
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, বিদ্যায় বাসন ॥

ইঞ্জিয় দমনে শক্তি, সেই শক্তি সার ।
সেই মুক্তি কণ্ট সংসর্গ পরিহার ॥
যাহাদের আছে হেন চাক গুণগ্রাম ।
তাহাদের পদে মম সহস্র প্রণাম ॥

৮৫

রাজা ধর্মহীন, শুচিবিহীন ব্রাহ্মণ ।
সত্যহীন দারা, জ্ঞানহীন যোগিগণ ॥
গতি হীন অর্থ, জ্যোতি বিহীন ভূষণ ।
ব্রতহীন তপ, বীরহীন যোদ্ধাগণ ॥
ছন্দোহীন গান, স্নেহ হীন সহোদর ।
ঈশহীন নরে, ত্যজে শীঘ্র সুধিবর ॥

৮৬

ক্ষণ ফল তরু ত্যজে বিহঙ্গনিকর ।
সারস ত্যজিয়া যায় শুদ্ধ সরোবর ॥
পর্যায়িত পুষ্প ত্যাগ করে মধুকর ।
কুরঙ্গ ছাড়িয়া যায় দক্ষ বনাস্তর ॥
বারবধু ত্যজে নর হইলে নির্ধন ।
ত্রিভুট ভূপালে পরিত্যজে মস্ত্রিগণ ॥
ফলত সংসারে কেহ কারু বশ নয় ।
কার্যবশে সকলেই রমণীয় হয় ॥

৮৭

দীনজনে দান নাই তবে কিবা ধন ।
সেকি সেবা পরহিতে অভাব যতন ॥
কি কাজ বিবাহে যদি না হেরে নন্দনে ।
বল্লভা বিরহ যদি কি কাজ যৌবনে ॥

৮৮

নিত্য ধনাগম আর নিত্য অরোগিতা ।
প্রিয়তমা প্রিয়ষদা সদা পরিণীতা ॥
বশীভূত প্রভু, বিদ্যা অর্থকরী হয় ।
এই দুই গৃহস্থের স্ত্রের নিলয় ॥

৮৯

সুত বলি তারে, যে জন পিতারে,
'সুখ দেয় স্মৃতিতে ।
সেই ত কামিনী, যে দিবা কামিনী,
চিস্তয়ে পতির হিতে ॥
মিত্র সেই হৃদ, সম ভাবে রয়,
অসময় অসময় ।
বহু পুণাকলে, এ জগতী তলে,
এই তিন লাভ হয় ॥

৯০

ভোগেতে রোগের ভয়, কুলে ভয় ক্ষয় ।
মানে দৈন্য ভয়, আর বলে রিপু ভয় ॥
যদি কিছু ধন থাকে সদা ভয় ভূপে ।
নিরস্তর ভয় আছে তরুণীর রূপে ॥
শাস্ত্রে বাদীভয়, গুণে খলজনে ভয় ।
শরীরের ভয় সদা যম মহাশয় ॥
এসংসারে কিছুমাত্র ভয়শূন্য নয় ।—
কেবল বৈরাগ্যে দেখি নাহি কিছু ভয় ॥—

৯১

শশাঙ্কে কলঙ্ক রেখা, কণ্টক যুগালে ।
যুবতী যৌবন ক্ষয়, মিত্রি কেশজালে ॥
জলধির জল লোণা, পণ্ডিত নির্ধন ।
হা নির্বোধ বিধি! ধনলোভী বৃদ্ধ গণ ॥

৯২

দিবসেতে সুধাকর, ধূসর বরণ ধর,
বিগলিত যৌবন ললনা ।
কমলকুম্ববর, বিহীন কমলাকর,
মুখে গর নিন্দার কলনা ॥
প্রভু ধন পরায়ণ, দীন দশা সর্বক্ষণ,
প্রাপ্তহন বতক সূজন ।

নৃপতির সন্নিধান, হৃদয় খেলের মান,
এই সাত মনের বেদন ॥

৯৩

দীন যেইজন, শতে আকুঞ্জন,
শতীর হাজারে মন।

হাজারীর লক্ষ্য, হয় এক লক্ষ,
লক্ষেশের রাজ্য পণ ॥

রাজা যেই হয়, তুষা কৃষা নয়,
সত্রাট্ হইতে চায়।

সত্রাট্ বেজন, চিন্তে অধুঙ্কণ,
ইন্দ্রপদ কিসে পায় ॥

সহস্র লোচন, ভাবে মনে মন,
ব্রহ্মস্থ মিলে আমারে।

বিধি গৌরীশ্বর, হরি পদ হয়,
কে গিয়াছে আশাপারে ॥

৯৪

পাপ কর্মে রত দেখি করে নিবারণ।

হিতকর কার্যে সদা করে নিয়োজন ॥

অতিশয় গুপ্তগুণ করয়ে প্রচার।

আপদে কদাচ নাহি করে পরিহার ॥

সময় পড়িলে করে সাহায্য প্রদান।

স্মিজ লক্ষণ এই কয় মতিমান্ ॥

৯৫

শুভাশুভ কর্ম ফল কালেতে উদয়।

শরদেই আশু ধান্য, বসন্তে না হয় ॥

৯৬

নীচের সংসর্গে ধনী প্রভা হয় দূর।

তহু দহে লগ্ননাক্ত মাখিলে কপূর ॥

৯৭

স্বজাতি-সহায়ে সিদ্ধ কর্ম অহঙ্কর।

জল দিয়ে কর্ণজল বহিষ্কৃত কর ॥

৯৮

উপভোগে ভোগীদের ভোগেচ্ছা নাযায়।

যত ভুণ খাও তত তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় ॥

৯৯

স্বভাব-স্বন্ধরে কিবা কার্য্য সংশোধনে।

মুক্তারে না বুড়ে কেহ শাণের ঘর্ষণে ॥

১০০

ভুবন রঞ্জনকারী শীলতা বাহার।

অঙ্গেতে প্রদীপ্ত আছে নিকটে তাঁহার ॥

বহি হয় জল, জলনিধি হয় কূপ।

মৃগপতি মৃগ, মেরু শিলার স্বরূপ ॥

ভুজঙ্গ হইতে হয় পুষ্পমালা সৃষ্টি।

বিষরস হইতে অমৃত হয় বৃষ্টি ॥

১০১

বিদ্যা বিভূষিত খলে পরিহার কর।

মণিমস্ত ভুজঙ্গ কি নহে ভয়ঙ্কর ॥

১০২

খল কুর বটে, আর কুর বিষধর।

কিন্তু খল সর্প চেয়ে হয় কুরতর ॥

মস্ত আর ওষধিতে সর্প বশ হয়।

কোনরূপে কুর খল নিবারিত নয় ॥

১০৩

অতি দূর পথশ্রমে হইতে শীতল।

তরুর ছায়াতে বসে পথিক সকল ॥

প্রস্থান করয়ে পুন হইলে শীতল।

কে কাহার ব্যাখ্যায় ব্যথিত ভবে বল ॥

ইতি প্রথম অঞ্জলি।

জ্যোতিষিক সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

আরবীয় ।

আসিয়া খণ্ডে আরব সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইলে পর, উক্ত জাতি বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে গণিতবিদ্যা, বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের অমূল্যশীলন করিয়াছিল । খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী শেষে খালিফা আল্ মানসুর এবং খালিফা হারুন আল্ রাসিদের রাজত্ব সময়ে আরব দেশে জ্যোতির্বিদ্যালোচনার যত্নপাত হয় । খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যে আল্ মামুনের অধিকার কালে আরবের সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । ইবু জোনিস লিখিয়াছেন যে আল্ মামুনের রাজত্ব কালে আরব জ্যোতির্বিদগণ অপমণ্ডল তির্ঘ্যগ্ভাবে নিরক্ষবৃত্ত চ্ছেদ করিয়া যে সূক্ষ্ম কোণ উৎপন্ন করে তাহা $২৩^{\circ} ৩৩'$, অথবা $২৩^{\circ} ৩৩' ৫২''$ পরিমিত এবং যাম্যোত্তর বৃত্তের একাংশ পরিমিত গোলীভূজ ৫৬ বা $৫৬\frac{১}{২}$ মাইল [৫ অথবা ৬ যবে এক ইঞ্চি, ২৭ ইঞ্চি = ১ হাত, ৪০০০ হস্তে = ১ মাইল) নিরূপণ করিয়াছিলেন ।

খৃষ্টীয় দশম এবং একাদশ শতাব্দী আরব দেশে জ্যোতির্বিদ্যার সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল ।

আরব জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে আল্ বাটেগ্নিয়স অথবা আল্ বাটনী [খৃষ্টীয়

নবম শতাব্দী] সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন । আল্ বাটনী সূর্যের দূর-বিন্দু গতি আবিষ্কার করেন, সৌর কেন্দ্র-বিত্ত্বিত্ততার ভ্রম সংশোধন করেন, অপমণ্ডল নিরক্ষবৃত্ত চ্ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপাদন করে তাহা $২৩^{\circ} ৩৫'$ পরিমিত এবং বিসুবৎ ৬৬ বৎসরে একাংশ মাত্র পুরোগমন করে, নিকৃপণ করেন । আল্ ফেগেল বা আল্ ফারগানী (খৃঃ দশম শতাব্দী) একখানি জ্যোতিষিক গ্রন্থ রচনা করেন । থাবেট বিন্ কোরা [খৃঃ দশম শতাব্দী] অপমণ্ডলের স্থহান পরিবর্তন বিষয়ক মতের পুনরুদ্ভাবন করেন ।

ইবন্ জুনিস (খৃঃ দশম শতাব্দী) একখানি জ্যোতির্বিবরণ রচনা করেন, এবং কোন স্থির জ্যোতিষ্কের উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা গ্রহণারম্ভ ও মোক্ষকালের নির্ণয় করেন ।

স্পেনীয় মুর আর সেচেল খ্রীষ্টীয় ১০৮০ অব্দে টলেমী প্রণীত তালিকা অবলম্বন করিয়া এক জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন ।

আর সেচেলের সমসাময়িক আল্ হাজেন কিরণরশ্মির বক্রীভবন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন ।

আবুল হাসেন খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতা-

জারিতে সিজর জ্যোতিষগণের এক তালিকা প্রস্তুত করেন।

গ্রীকেরা যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, যথা, শঙ্কু, বৃত্তপাদ, গোল, ইত্যাদি আরবেরাও সেই সমস্ত ব্যবহার করিতেন। অধিকন্তু আরবেরা (বোধ হয় ইবন জুনিস) কোন নক্ষত্র অথবা গ্রহের উন্নতি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সময় নিরূপণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন।

পারসিক।

আরব খালিফাদিগের দ্বায় তাতার সম্রাটেরাও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের সম্যাগা-লোচনা করিয়াছিলেন। জেনিস খাঁর পৌত্র হলাকু খাঁ পারস্য দেশে একটা পর্য্যবেক্ষণিকা সংস্থাপন করেন, এবং তাঁহার রাজসিংহাসন আরোহণ কালাবধি যাবতীয় জ্যোতিষিক যন্ত্র নির্মিত ও গ্রহ রচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় সংগ্রহ করেন। হলাকুর রাজত্ব সময়ে প্রায় ১২৭১ খৃঃ অব্দে;—নাসীর উদ্দীন জ্যোতিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দে জর্জ জীসোকাস নামক গ্রীক চিকিৎসক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে প্রণীত কতকগুলি পারস্ত জ্যোতিষিক তালিকা অম্বুবাদ করেন। চিওনিয়াডেস এই সকল তালিকা পারস্ত রাজ্য হইতে ইউরোপথণ্ডে আনয়ন করেন।

তৈমুরলঙ্গ বংশীয়েরাও জ্যোতির্বিদ্যার বিশিষ্টরূপ অম্বুশীলন করিয়াছিলেন। তৈমুর সাহের পৌত্র উলুগবেগ আপন

রাজধানী সময়কন্দ নগরে পর্য্যবেক্ষণিকা সংস্থাপন করেন; এবং গণিতবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণের সাহায্যে ১৪৪৭ খৃঃ অব্দে (হিজরি ৮৪১ শকে) স্থির জ্যোতিষিক দিগের এক তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকার কিয়দংশ মাত্র ইউরোপীয় ভাষায় অম্বুবাদিত হইয়াছে।

গ্রীক।

ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে গ্রীকেরাই প্রথম জ্যোতিষ শাস্ত্রের অম্বুশীলন করেন। গ্রীকভাষায় প্রথম জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণেতা অটোলাইক্স সচল-গোলক এবং জ্যোতিষগণের উদয়ান্ত সম্বন্ধীয় জুইখানি গ্রহ রচনা করেন। অটোলাইক্স খ্রীষ্টাব্দের চারিশত বৎসর পূর্বে সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আরিস্তারক্স শেষম দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং প্রায় ২৮০ বৎসর খৃঃ পূঃ সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি সূর্য্য এবং চন্দ্রের আয়তন এবং দূরতা পরিমাণ করিবার প্রথম উদ্যম করিয়াছিলেন। আরিস্তারক্স খৃঃ পূঃ ৪২০ অব্দে জীবিত ছিলেন।

খৃঃ পূঃ ২৭৬ অব্দে সাইরিগী নগরে ইরটস্থেনিসের জন্ম হয়। ইরটস্থেনিস আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীর আয়তন নিরূপণে উদ্যুক্ত হন। প্রবাদ আছে যে তিনি অপমণ্ডল নিরক্ষবৃত্ত ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপাদন করে তাহা ২৩°৪'২০" পরিমিত নির্ণয় করিয়াছিলেন।

খৃঃ পূঃ ১৯৪ অব্দে ইরাটস্থেনিসের মৃত্যু হয়।

সিসিলি দ্বীপে সাইরাকিউস নগরে আর্কিমিডিসের জন্ম হয়। আর্কিমিডিস অয়নবিন্দুস্থর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সূর্য্যের ব্যাস পরিমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ২১২ খৃঃ পূঃ রোমান সেনাপতি মার্সেলসের জনৈক সৈনিক কর্তৃক আর্কিমিডিস নিহত হন।

আর্কিমিডিসের মৃত্যুর পর হিপার্কস খৃঃ পূঃ ২০০-১২৫ জ্যোতির্বিদ্যার সমধিক আলোচনা করেন। হিপার্কস বিধি নিয়ম অঙ্কগত নাইসি নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিপার্কস বিদ্যুৎবিন্দুস্থরের পুরোগমন আবিষ্কার করেন, এবং স্থান সন্নিবেশ নিরূপণার্থ প্রথমতঃ সরল উত্থান এবং ক্রান্তি এবং তৎপরে অক্ষ এবং দ্রাঘিমা ব্যবহার করেন। তিনি সূর্য্য এবং চাঁদ্র দুইবিদ্যুর গড়-গতি নিরূপণ করিয়াছিলেন। হিপার্কস গ্রহগণনা করিতে পারিতেন এবং সূর্য্য বৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। হিপার্কস কর্তৃক সৌরবৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিবস, ৫ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ১২ সেকেন্ড নির্ণীত হইয়াছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে একটী অদৃষ্ট-পূর্ব্ব তারকা দর্শন করিয়া তিনি নক্ষত্রগণের সংখ্যানির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তদভিপ্রায়ে ১০৮১ নক্ষত্রের অক্ষ এবং দ্রাঘিমা নির্ণয় করেন।

মিশরীয় জ্যোতির্বেত্তা সোসিজেনিস্

খৃঃ পূঃ ৫০ অব্দে রোমাধিপতি জুলিয়স্ সিজরকে পঞ্জিকা-গত ভ্রম সংশোধনে সাহায্য করেন।

জুলিয়স্ মানলিয়স্ সিনেকা পোম্পে দেশে কর্দোবা নগরে খৃঃ পূঃ ৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সিনেকা একখানি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান রচনা করেন; এবং ধ্রুবেতুগুণের নৈসর্গিকভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে একপ্রকার গ্রহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৬৫ অব্দে সিনেকার মৃত্যু হয়।

ক্লডিয়স টলেমি খৃঃ প্রথম শতাব্দী মিসর দেশে পিলুসিয়স্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গণিত সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খলিফা হারুন আল-রাসিদের রাজত্ব সময়ে এই গ্রন্থ আববী ভাষায় অনুবাদিত হয়। আরবেরা ইহাকে “আল মেজেস্তা” কহে। এই গ্রন্থে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক যে সমস্ত মত উল্লিখিত হইয়াছে তৎসমুদায় যে টলেমি কর্তৃক উদ্ভাবিত এমত নহে। টলেমি যে মতের পোষকতা করেন তাহার মর্ম্ম এই। পৃথিবী অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বের কেন্দ্রীভূত, এবং গ্রহগণ বৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে। এই মত প্রবাদপূর্ণ হইলেও কোপার্নিকসের সময় পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

টলেমি চন্দ্রোন্নতি এবং আলোকরশ্মির বক্রীভবন আবিষ্কার করেন, ও আকাশ-

কঙ্কার নিকটবর্তী স্থা অথবা চন্দ্র মণ্ড-
লের অপেক্ষাকৃত দৃশ্যমান বৃহদাকারের
কারণ নির্দেশ করেন। তিনি অনুমান
করিয়াছিলেন যে গ্রহগণ এক এক অতি
বৃহৎ স্বচ্ছ গোলাকার বস্তু, এবং তন্মধ্যে
এক এক তারকা সন্নিবেশিত আছে।
এই মতের সমর্থন জন্যই নিচোচ্চ-বৃত্ত *
প্রভৃতি যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। টলেমি সিদ্ধান্ত
জ্যোতিষ ব্যাভীত ভূগোল, সঙ্গীত এবং
ফলিত জ্যোতিষেরও আলোচনা করি-
য়াছিলেন।

টলেমি গ্রন্থীত “আলমাজেস্ট” নামক

* সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৫ম অধ্যায় ৪১
লোক।

জ্যোতিষিক গ্রন্থ খঃ ১২৩০ অব্দে দ্বিতীয়
ফ্রেড্রিকের রাজত্ব সময়ে গ্রীক ভাষায়
অনুবাদিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ৬৪০ অব্দে আবব জাতিধারা
আলিক জাতিয়া নগরী খংস হওয়াতে
গ্রীক জাতির জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনা
এক প্রকার শেষ হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ আধুনিক
ইউরোপ সম্বন্ধীয়। লেখক এতদংশ
সুপাঠ্য করিতে পারেন নাই—এজন্য
তাহা আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য
হইলাম। যং সং

কৃষ্ণকান্তের উইল।

মঠ পরিচ্ছেদ।

তুমি, বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া
ডাক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি
নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ
অনুরোধ, যে সময় বুঝিয়া ডাকিবে।
সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি
ভাল নহে। দেখ আমি, বহু সন্ধ্যানে,
লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পা
ইয়া, আরও অধিক অনুসন্ধানের পর
মনের সাক্ষাৎ পাইয়া, “কৃষ্ণকান্তের
উইল” ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম
—এমত সময়ে তুমি আকাশ হইতে

ডাকিলে “কুহ! কুহ! কুহ!” তুমি
স্বকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু স্বকণ্ঠ
বলিয়া কাহারও পিছু ডাকিবাব অধিকার
নাই। যাই হউক, আমার পলিত কেশ,
চলিত কলম, এসব স্থানে তোমার ডাকা-
ডাকিতে বড় আসিয়া যায় না। কিন্তু
দেখ, যখন নবাবাবু টাকাব জালায়
বাতিবাস্ত হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা
কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয় ত
আপিসের ভগ্নপ্রাচীরের কাছে হইতে
ডাকিলে, “কুহঃ”—বাবুর আর জমা-
খরচ মিলিল না। যখন বিরহ সম্ভ্রান্ত

সুন্দরী, আর সময়দিনের পর অর্থাৎ
বেলা নয়টার সময় ছুটি ভাত মুখে দিতে
বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটাটি
কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি
তুমি ডাকিলে—সুহঃ—সুন্দরীর ক্ষীরের
বাটা অমনি রহিল—হয় ত, তাহাতে অল্প
মনে লুণ মাখিয়া থাইলেন। যাই হউক,
তোমার কুহরবে কিছু যাহু আছে—
নহিলে, যখন তুমি বকুলগাছে বসিয়া
ডাকিতেছিলে—আর বিধবা রোহিণী
কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল
—তখন—কিন্তু আগে জল আনিতে
যাওয়ার পরিচয়টা দিই।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ
দুঃখী লোক—দাসী চাকরাণীর বড় ধার
ধারে না। সেটা সুবিধা কি কুবিধা তা
বলিতে পারি না—সুবিধা হউক, কুবিধা
হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার
ঘরে ঠিকামি, মিথ্যা সম্বাদ, কোন্দল,
এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই।
চাকরাণী নামে দেবতা, এই চারিটির
সৃষ্টিকর্তা। বিশেষ যাহার অনেক গুলি
চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরু-
ক্ষেত্রের বৃদ্ধ—নিত্য রাবণ বধ। কোন
চাকরাণী ভীমরূপিণী, সর্কদাই সম্মা-
র্জনী গদা হস্তে গৃহ রণক্ষেত্রে ফিরি-
তেছেন—কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা
দ্রুপদাধন, ভীষ্ম দ্রোণ কর্তৃক তৎসনা
করিতেছেন; কেহ কুন্তকর্ণ রূপিণী, ছয়
মাস করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, নিদ্রান্তে
সর্কধ খাইতেছেন—কেহ সুগ্রীব, গ্রীবা

হেলাইয়া কুন্তকর্ণের বধের উদ্যোগ
করিতেছেন। ইত্যাদি।

ব্রহ্মানন্দের সে সকল আপন বাংলাই
ছিল না—সুতরাং জল আনা বাসন
মাঝা টা, রোহিণীর ঘাড় পড়িয়া ছিল।
বৈকালে, অন্যান্য কাজ শেষ হইলে,
রোহিণী জল আনিতে যাইত। যেদিনের
ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন
নিম্নমিত সময়ে, রোহিণী কলসী কক্ষে
জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের একটা
বড় পুকুর আছে—নাম বারুণী—জল
তার বড় মিঠা—রোহিণী সেইখানে জল
আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল।
রোহিণী একা জল আনিতে যায়—দল
বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা
হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে
হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর
অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি,
চাল চলনও ভারি। তবে রোহিণী
বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম
নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা,
ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের
উপর চাকবিনিস্কিতা কাল ভুজঙ্গিনী
তুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনো-
মোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে;
চলনেব দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী
নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী
নাচে, সেইরূপ, ধীরে ধীরে গা দোলা-
ইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি
আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত,
মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে

রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া ছলিয়া, পালভরা জাহাজের মত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, বোহিনী সুনন্দী, সরোবর পথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমত সময়ে, নিষের ডালে বসিয়া, বসন্তের কোকিল ডাকিল।

কুহঃ কুহঃ কুহঃ! বোহিনী চারিদিক চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, বোহিনীর সেই উর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোলকটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাঠিত, তবে সে তখনই—ক্ষুদ্র পাখিজাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, রূপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখী অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্য্যকারণের অনন্ত শ্রেণী পরস্পরায় এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই—অথবা পাখীর তত পূর্ব্বেজ্ঞানজিত স্মৃতি ছিল না। মূর্থ পাখী আবাব ডাকিল—“কুহ! কুহ! কুহ!”

“দুব হা! কালামুখো!” বলিয়া বোহিনী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদেব দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গবির বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেন না, কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলো বিপ্রী কথ্য মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবনসর্ব্বস্ব

অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কে যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রক্ত হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বুথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পুরিল না—যেন এসংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কুহঃ, কুহঃ, কুহঃ। বোহিনী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নিশ্চল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবগ্রন্থটিত আশ্রমকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতলসুগন্ধ পরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুণ গুণে, শব্দিত, অথচ সেই কুহরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল, সরোবরতীরে, গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাগে লাগে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আব সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড় কৃষ্ণ কৃষ্ণিত কেশ দাম, চক্রে ধরিয়া তাঁহার চম্পক রাজি নিশ্চিত স্বকোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিত বৃক্ষা-

ধিক জ্বলন্ত সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া ছিল—তেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুচ-রবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক আশোকের উপর হইতে ডাকিল “কু উঃ” তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ করিতেছিল। বোহিণী সোপান অবতীর্ণ চইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া, কাদিতে বসিল।

কেন কাদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি ক্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমাব বড়ই সন্দেহ হয় ঐ ছুট কোকিল রোহিণীকে কাদাইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাকুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম—আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণী টি অতি বৃহৎ—নীল কাঁচের আয়না মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানেব ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারি পাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যানপ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেম খানা বড় জাঁকাল—লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানা বর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাতার বসান। মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলো একত খানা বড় বড় হীরার

মত অন্তর্গামী সূর্য্যোব কারণে জলিতে ছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের আয়নার প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিল টা ডাকিতেছিল। এসকল এক রকম বুনান বাঁধ, কিন্তু সেই আকাশ, আর সেই পুকুর, আব সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে বোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইট বঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে এই বাকুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। গোবিন্দলালও সেই কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন, যে বোহিণী আসিয়া ঘাটের রানায় একা বসিয়া, কাদিতেছে। গোবিন্দলাল বাবু মনেই সিদ্ধান্ত করিলেন, এ, পাড়ায় কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাদিতেছে। আমবা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিণী কাদিতে লাগিল।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল, যে কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে

আমি এ পৃথিবীর কোন স্মৃতিভোগ করিতে পাইলাম না? কোন দোষে আমাকে এ রূপ, যৌবন থাকিতে কেবল শুক'কা'ষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল স্মৃতি স্মৃতি—মনে কর ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণ বতী—কোন পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ স্মৃতি—আমার কপালে শূন্য? দূরহৌক—পরের স্মৃতি দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অস্বস্তির জীবন রাখিয়া কি করি?

তা আমরা তা বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, এটুকতে কত হিংসা! রোহিণী শোভী, রোহিণী চোর, তা বলিয়াছি—হরলালের টাকা লইয়া উইল চুরি করিল। রোহিণী ব্যাপিকা, তাও বলিয়াছি, হরলালের সঙ্গে অতি ইতরের ন্যায় কথা বার্তা কহিয়াছিল। রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ, কণ্টকক্ষেত্রে দেখিয়া রুষ্টি সম্বরণ করে না।

তা, তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল। দেখ, এখনও রোহিণী, ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে—শূন্য কলসী জলের উপর বাতাসে নাচিতেছে।

শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল—

শেষে অন্ধকার চইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোকুল সকল গৃহাতিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাতিমুখে চলিলেন—বাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এখন, রোহিণী বড় ব্যাপিকা বলিয়া বিখ্যাত। খ্যাতিটা অযোগ্য নহে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। ব্যাপিকা হইলেই আর এক অখ্যাতি, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সঙ্গে আসিয়া যোটে। রোহিণীর সে গুরুতর অখ্যাতিও ছিল। স্মৃত্তক্য কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না। গোবিন্দলাল কৃষ্ণগ্রন্থবৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন। কিন্তু এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাহার একটু হৃৎপিণ্ড উপস্থিত হইল। তখন তাহার মনে হইল, যে এ স্ত্রীলোক সজ্জরিজ্ঞা হউক হৃৎপিণ্ডবিজ্ঞা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ—আমিও সেই তাহার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ—অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার হৃৎপিণ্ড নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না?

গোবিন্দলাল ধীরে২ সোপানাবলি অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া, তাহার পার্শ্বে চম্পক নির্মিত মূর্তিবৎ সেই

চন্দ্রকালোক চম্ভকিরণে দাঁড়াইলেন।
রোহিণী দেখিয়া চম্ভকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন,

“রোহিণী! তুমি একতরফ একা বসিয়া
কানিতেছ কেন?”

রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা
কহিল না।

গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন,

“তোমার কিসের ভুখ, আমার কি
বলিবে না? যদি আমি কোন উপকার
করিতে পারি।”

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে অতি
স্বাধীনতা ব্যাপিকার ন্যায় অনর্গল কথো-
পকথন করিয়াছিল—কত হাসিয়াছিল,
কত ঠাট্টা করিয়াছিল, কত জবাব ম্লোক
আবৃত্ত করিয়াছিল—গোবিন্দলালের স-
ম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে
পারিল না। কিছু বলিল না—গতিত
পুতুলীর মত সেই সরোবরসোপানের
শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দ-
লাল কিছু সরোবর জলে সেই ভাস্করকীর্তি
কর মূর্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের
ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি
বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—
কেবল নির্দয়তা অসুন্দর! সৃষ্টি করুণা-
ময়ী—মহুয়া অকরণ। গোবিন্দলাল
প্রকৃতির স্পষ্টাকর পড়িলেন। রোহিণীকে
আবার বলিলেন,

“তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট
থাকে, তবে আজি হউক কালি হউক,
আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে

পার, তবে আমাদের বাড়ীর জীলোক-
দিগের দ্বারার জানাইও।”

রোহিণী এবার কথা কহিল, বলিল,
“একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন
তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।”

কি কথা রোহিণী? উইল চুরি করিয়া
যে গোবিন্দলালের সর্বনাশ করিয়াছ,
তাহার সঙ্গে আবার তোমার কি কথা?

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া, গৃহাভি-
মুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া
কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল পূরিল—
কলসী তবন বক্-বক্-গল্-গল্—করিয়া
বিস্তর আপত্তি করিল। আমি আনি, শূন্য
কলসীতে জল পূরিতে গেলে কলসী, কি
মৃৎকলসী কি মহুয়া কলসী, এইরূপ আ-
পত্তি করিয়া থাকে—বড় গণ্ডগোল করে।
পরে অন্তঃ শূন্য কলসী পূর্ণতায় হইলে,
রোহিণী ঘাটে উঠিয়া, আর্জ বস্ত্রে দেহ
অচাক্ষুণ্যে সমাচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে
ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন চলৎ
ছলৎ ঠনাক্! বিমিক্ ঠিনিকি ঠিন্!
বলিয়া, কলসীতে আর কলসীর জলেতে
আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন
হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও
সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল—
রোহিণীর মন বলিল—উইল চুরি করা
কাজটা!

জল বলিল—ছলৎ!

রোহিণীর মন—কাজটা ভাল হয় নাই।

বালা বলিল ঠিন্ ঠিনা—না! তাত
না—

রোহিণীর মন—এখন উপায়?

কলসী—ঠনক্ চনক্ চণ্—উপায়
আমি,—দড়ি সহযোগে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রোহিণী সকাল২ পাককার্য সমাধা
করিয়া, ব্রহ্মানন্দকে ভোজন করাইয়া,
আপনি অনাহারে শয়নগৃহে দ্বার রুদ্ধ
করিয়া গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রার
জন্য নহে—চিন্তার জন্য।

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদগণের
মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া,
আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন।
সুমতি নামে দেবকন্যা, এবং কুমতি
নামে রাক্ষসী, এই দুই জন সর্বদা মনু-
ষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং
সর্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে।
যেমন দুইটা ব্যাঘ্রী, মৃত গাভী লইয়া
পবম্পর যুদ্ধ করে, যেমন দুই শৃগালী মৃত
নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবন্ত
মনুষ্য লইয়া সেইরূপ করে। আজি,
এই বিজন শয়নাগারে, রোহিণীকে লইয়া
সেই দুইজনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপ-
স্থিত করিয়াছিল।

সুমতি বলিতেছিল,—“এমন লোকে-
রও সর্বনাশ করিতে আছে?”

কুমতি। হাজার টাকা দেয় কে?
টাকার কত উপকার!

সু। তা, গোবিন্দলালের কাছেও
টাকা পাওয়া যায়। তার কাছে ঐ হা-

জার টাকা লইয়া কেন উইল ফিরাইয়া
দাও না?

(N. B—এই কথাটা স্তমতি বলিয়া-
ছিল কি কুমতি বলিয়াছিল, তাহা লেখক
ঠিক বলিতে পারেন না।)

কু। টাকা চায় কে? আর গোবিন্দ
লাল উইল বদল হইয়াছে জানিতে পা-
রিলে, টাকাই বা দিবে কেন? উইল যে
বদল হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই
তাহার কার্যোদ্ধার হইবে। তখনই সে
কৃষ্ণকান্তকে বলিবে, মহাশয়ের উইল
বদল হইয়াছে—নূতন উইল করুন। সে
টাকা দিবে কেন?

সু। ভাল, টাকাই কি এত পরম-
পদার্থ? কি হইবে টাকায়? তোমার এত
দিন হাজার টাকা ছিল না, তাতেই বা
কি ক্ষতি হইয়াছিল—হাজার টাকা কত-
দিন যাইবে? হরলালের টাকা হবলালকে
ফিরাইয়া দাও। আর কৃষ্ণকান্তের উইল
কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

কু। বাঃ যখন কৃষ্ণকান্ত আমাকে
জিজ্ঞাসা করিবে “এ উইল তুমি কোথায়
পাইলে, আর আমার দেৱাজে আর এক
খানা জাল উইলই বা কোথা হইতে
আসিল,” তখন আমি কি বলিব? কি
মজার কথা! কাকাতে আমাতে ছুজনে
থানায় যেতে বল না কি?

সু। তবে সকল কথা কেন গোবিন্দ-
লালের কাছে খুলিয়া বলিয়া, তাহার
পায়ে কাঁদিয়া পড় না? সে দয়ালু অবশ্য
তোমাকে রক্ষা করিবে।

কু। সেই কথা, কিন্তু গোবিন্দলালকে অবশ্য এ সকল কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে জানাইতে হইবে, নইলে উইলের বদল ভাবিবে না। কৃষ্ণকান্ত যদি খানার দৈব, তবে গোবিন্দলাল রাখিবে কি প্রকারে? বরং আর এক পরামর্শ আছে। এখন চূপ করিয়া থাক—আগে কৃষ্ণকান্ত মরুক, তারপর তোমার পরামর্শ মতে গোবিন্দলালের কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া পড়িব। তখন তাঁহাকে উইল দিব।

সু। তখন বুথা হইবে—যে উইল কৃষ্ণকান্তের ঘরে পাওয়া যাইবে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। গোবিন্দলাল

সে উইল বাহির করিলে, কালের অপবাদ-প্রাপ্ত হইতে পারে।

কু। তবে চূপ করিয়া থাক—যা হই-
য়াছে তা হইয়াছে।

সুতরাং স্মৃতি চূপ করিল—তাহার পরামর্শ হইল। তারপর দুই জনে সন্ধি করিয়া, সম্যক্তাবে, আর এক কার্যে প্র-
বৃত্ত হইল। সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোক প্রতিভাসিত, চন্দ্রকন্দাধিনি-
র্মিত দেব মূর্তি আনিয়া, রোহিণীর দানস-
চক্রে অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, কাদিল। রোহিণী সে রাজ্যে সুমাইল না।

চৈতন্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দ্বিতীয় বিবাহ।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূ-বিয়োগ-
বিধুরা জননীকে নানারূপ সাস্থনা করিয়া
চৈতন্য বথাবিহিত পত্নীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া
নির্বাহ করিলেন। স্বামীজন দাদ ঠাকুর
প্রভৃতি চৈতন্যের জীবনচরিত লেখকগণ
কেহ একথার উল্লেখ করেন না। কারণ
(কুশ হস্তে করা অথবা পিণ্ডদান করা
বৈষ্ণবদিগের যারপর নাই মতবিরুদ্ধ।
অদ্যাবধি অন্তর্দেশীয় অনেক বৈষ্ণব
নিষ্ঠাত সমাজের অনুবোধে আদ্যাশ্রাদ্ধ
করিয়াও পারতপক্ষে আদ্যাশ্রাদ্ধের নিম-

ন্ত্রণাদি রক্ষা করিতে যান না।) তথাপি
চৈতন্য বণিতার যথাসম্ভব শ্রাদ্ধাদি
করিয়াছিলেন ইহা সুক্তিসঙ্গত বলিয়া
বোধ হয়। কারণ;*

(১) তৎকাল পর্য্যন্ত চৈতন্য কর্মকাণ্ড
তাগ করেন নাই। এবং সঙ্ক্যাবন্ধ-
নাদি যান্ত্রিক ক্রিয়ায় + যারপরনাই পক্ষ-

* এই সকল প্রমাণ চৈতন্য চরিতামৃত
ও চৈতন্য ভাগবত হইতে সংগৃহীত।

+ ছাত্রগণের মধ্যে যদি কেহ কোন
দিন সঙ্ক্যাদি না করিয়া চতুষ্পাঠীতে গমন

পাতী ছিলেন। বোধ হয় বঙ্গীর বৈষ্ণবগণ আপনাদিগের ভবিষ্যৎ শাস্ত্র বিকল্পচরণ এতাবৎ ক্রমেও মনে করেন নাই। একাদশ ভাগবতের মতে † বৈষ্ণব ভিন্ন ভাগে বিতক্ত—উত্তম মধ্যম ও অধম। উত্তম অর্থাৎ নিরাশ্রম সন্ন্যাসী বৈষ্ণব, মধ্যম অর্থাৎ গৃহী সাধু বৈষ্ণব, অধম অর্থাৎ প্রকৃত সংসারী, কপটচারী—বিক্ষুব্ধ। স্বামীশ্রদ্ধ স্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও নিরাশ্রম বৈষ্ণব ও গৃহী এই দুই সম্প্রদায়ে বিতক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ এতাবৎ গৃহী বৈষ্ণবই ছিলেন।

(২) চৈতন্যের মাতা তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে যজ্ঞী পূজাদি সমুদায় করিয়াছিলেন, এবং চৈতন্যও যথাবিহিত বিবাহ করিয়াছিলেন।

(৩) চৈতন্য পত্নীর শ্রাদ্ধ না করিলে, অবশ্যই সমাজচ্যুত হইতেন, সুতরাং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিতেন না।

পত্নীর শ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত হইলে, চৈতন্য প্রতিদিন মুকুল সজ্জের মণ্ডপে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এদিকে শচী পুত্রের বিবাহের জন্য যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া কন্যা অহুসন্ধান করিতে

লাগিলেন; একদা গঙ্গাধীন করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীসনাতন রাজ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশধর ব্রাহ্মণের কুমারী কন্যা লক্ষ্মীদেবীর রূপ লাভণা ও বালিকোচিত অবলতা দেখিয়া যার পর নাই মুগ্ধ হইলেন, এবং গৃহে প্রত্যাপ্ত হইয়া কাশীনাথ মিশ্র নামক জাতিকে আহ্বান করিয়া সনাতন রাজের নিকট সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। চৈতন্যের ১ম পত্নীবিয়োগ হওয়া অবধি, সনাতন চৈতন্যকেই তদীয় কন্যা সমর্পণ করিতে মানস করিয়াছিলেন। একশে বিলা যত্নে রত লাভ হইবে আনিতে পারিয়া যারপর নাই আক্লান্দিত হইলেন। মতা সমারোহে চৈতন্য ও সনাতনরাজের কন্যা লক্ষ্মীর বিবাহ ক্রিয়া নির্বাহ হইল। এই ক্রিয়া যথা শাস্ত্র নির্বাহ হইয়াছিল।*

চৈতন্যের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পত্নীর নামই লক্ষ্মী। চৈতন্য ভাগবতে ও চৈতন্য চরিতামৃতে উভয় গ্রন্থেই ইহা স্পষ্টতঃ লিখিত আছে। তথাপি লোকে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর নাম কিজন্য বিস্মৃপ্রিয়া† বলিয়া থাকে। অমাদিগের বিবেচনায় ইহার দ্বিবিধ উত্তর হইতে পারে।

* চৈতন্য ভাগবত দেখ।

† যুবতী ভার্গ্যা রাণিয়া পুত্র পরলোকগত হইলে জনক জননী “বিস্মৃপ্রিয়া” রহিল বরে” এই বলিয়া খেদ উক্তি করেন। এরূপ উক্তি বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচলিত।

করিত, তাহাকে চৈতন্য যারপর নাট তিরস্কার করিতেন, এবং তৎক্ষণাৎ বাটী ঘাইয়া নিত্য কৰ্ম করিতে আদেশ করিতেন।

‡ উক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ (যোগতত্ত্ব)

(১) ১ম হইতে দ্বিতীয় পত্নীর পার্থক্য রাখার জন্য বৈষ্ণবগণ প্রথম পত্নীকে আৰ্য্য্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাব মাম পরিবর্তন করিয়া দ্বিতীয়ার নাম পরিবর্তন করিয়াছেন। চৈতন্য বিষ্ণুর অবতার সূতরাং বৈষ্ণবগণ কর্তৃক তাঁহার পত্নীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া রাখা অসম্ভব নয় বোধ হয়।

(২) কথিত আছে সনাতন রাজ “বিষ্ণু-প্রীতি কামে” কন্ডাদান করিয়াছিলেন। ইহাকেই বৈষ্ণবগণ নিষ্কাম দান বলিয়া থাকেন। চৈতন্যের জন্মের পূর্বে বঙ্গদেশ সমধিক কৰ্ম্মকাণ্ড প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল সূতরাং, হয়ত, তাৎকালিক কোন লোকই স্বর্গ কামনা প্রভৃতি কামনাবিরহিত হইয়া কন্ডাদান করিতেন না। পশ্চান্তরে সনাতনরাজ স্বীয় কন্ডা লক্ষ্মীকে বিষ্ণুপ্রীতি কামে দান করিলেন, এইজন্ত লক্ষ্মীর নামান্তর বিষ্ণুপ্রিয়া † হইল।

সে যাহাই হউক চৈতন্যের দ্বিতীয় ভাৰ্য্যার প্রকৃত নাম লক্ষ্মী, কিন্তু বঙ্গদেশের সকলেই তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রিয়া বলিয়া থাকেন। আমরাও তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রিয়াই বলিব।

চৈতন্য এতাবৎ সংসার ত্যাগের অণুমাত্র চিন্তা করিয়াছিলেন না। হায়! ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনুষ্য কি অন্ধ। চৈতন্য যদি একদিন ভ্রমেও মনে করিতেন যে চারিবৎসর পরেই সংসারপ্রশ্রম ত্যাগ

† বিষ্ণুপ্রিয়া—বিষ্ণুপ্রীতিকামনাতো দত্তা হইয়াছে যে।

করিবেন তাহা হইলে কি তিনি একজন অবলাকে অনাথা করিতেন।

চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া কয়েক দিবস মাত্র গৃহে অবস্থান করিলেন এবং মাক্ষ অমুত্তি গ্রহণ করিয়া পিতৃপুরুষের ঋণ শোধনার্থ সলিষ্যে গয়াধামে † যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস গয়াধামে অবস্থান করিয়া যথাসম্ভব গয়াতীর্থের সমুদয় কার্য্যাদি সমাপ্ত করিলেন।

একদা চৈতন্য গদাধবেব মন্দিবে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে পূর্কপরিচিত বৈষ্ণবচূড়ামনি ঈশ্বর পুরীকে দেখিলেন। ঈশ্বরপূর্বী চৈতন্যকে দেখিয়া যারপব নাই প্রীত হইলেন। উভয়ে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। অধুনা চৈতন্যের ধর্ম্মবল্লি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ছিল। ঈশ্বরপূর্বী বিন্যাস ভাগবত শ্রেষ্ঠ সন্দর্শনে তাহাতে যেন নবীন আহুতি পড়িল। চৈতন্য পূর্বীবারেব সহিত আপন গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে নানাকপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন—

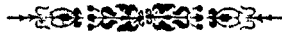
হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।

যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে ॥

† অদ্যাবধি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। গয়াতে পিতৃ দান না করিলে কোন হিন্দুসন্তানই আপনাকে পিতৃঋণ মুক্ত বিবেচনা করেন না।

চৈতন্য কক্ষমস্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণ
রূপে কক্ষপ্রবেশে বিগলিত হইলেন এবং
কক্ষের লীলাভূমি বৃন্দারণ্যে ও মথুরা দর্শন
করিতে লালায়িত হইলেন। চৈতন্যের
পারিদর্শন অনেকরূপে ব্যাখ্যা তাঁহাকে

এ ব্যাখ্যা বৃন্দাবনব্যাখ্যা হইতে নিবৃত্ত
করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। পারিদর্শ-
ন ভাবিয়াছিলেন, হয় ত, চৈতন্য বৃন্দা-
বন গমন করিলে আর প্রত্যাগমন
করিবেন না।



ধাত্মশিক্ষা।*

এই জন্ম সূত্রে কি দুঃখের বলিতে
পারি না, ধর্মোপদেশক এবং নীতি-
বেত্তাগণ তাহা নিরূপণ করিবেন, কিন্তু
জন্মগ্রহণ করা অতি সুকঠিন। বিধাতার
সৃষ্টি যে অসম্পূর্ণ, এবং লোকে যেমন
কুশলময় বলে, তেমন কুশলময় নহে,
এই কথাই উদাহরণপ্রয়োগস্থানে মিল,
জীবের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় দুঃখের বিশেষ
করিয়া উল্লেখ উত্থাপন করিয়াছেন।
প্রথমতঃ, জঠরযন্ত্রণা। যে জঠরস্থিত
তাহার কত যন্ত্রণা তাহা সবিশেষ বলিতে
পারি না, কিন্তু গর্ভিণীর যন্ত্রণার শেষ
নাই। যত দিন না সন্তান প্রসূত হয়,
তত দিন নিত্য পীড়া, নিত্য বিপদ।
যদি কোম ক্রমে নিয়মিত কাল অতীত
হইল, তবে প্রসবের দিন উপস্থিত।

যদি সূত্রসব ঘটিল, তবে হয় ত পী-
ড়ার ভয়ানক দৌরাণ্ড্য আরম্ভ হইল।
নিত্য পীড়া, নিত্য প্রাণ সংশয়। বাহ্যিক
সামাজিক জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখেন

তাঁহারা জানেন, যে যত মনুষ্য, মাতৃগর্ভ
হইতে প্রসূত হওয়ার অল্পকাল মধ্যে
প্রাণত্যাগ করে, এত আর অন্য কোন
বয়সে করে না।

এই সকল অমঙ্গলের কোন প্রতীকার
হইতে পারে না? পারে। এমন কিছুই
নৈসর্গিক অমঙ্গল নাই, যে নৈসর্গিক
নিয়ম সকলের আলোচনা করিলে নি-
তান্তপক্ষে কিয়ৎপরিমাণে তাহার প্রতী-
কার হয় না। এ বিষয়েও নৈসর্গিক
নিয়ম সকল অবগত হইলে পীড়া ও
মৃত্যুর লাঘব করা যায়। এবং ইউরোপে
এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম উত্তমরূপে
অধীত হওয়ায় প্রসূতী এবং সূতের একটি
উত্তম সূচিকিংসা প্রণালী উদ্ভূত হই-
য়াছে। তৎসাহায্যে বহুতর প্রাণীর
জীবন রক্ষা এবং পীড়ার নিবারণ অথবা
উপশম ঘটয়া থাকে।

কিন্তু যে জ্ঞান মনুষ্যমাজেরই প্রয়ো-
জনীয়, তাহা কেবল চিকিৎসকের অধি-

* ধাত্মশিক্ষা এবং প্রসূতি-শিক্ষা।
চূড়। ১৮৭৫।

ডাক্তার শ্রীযত্ননাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কানের শুহানিহিত মস্তের ন্যায় ক্ষুদ্রায়িত থাকিলে সংসারের মঙ্গল অনির্বাচ্য পায় না। প্রায় রমণী মাতৃকেই রত ধারণ করিতে হয়; প্রায় গৃহ মায়েই প্রসূতী এবং মৃত। গৃহমাতৃ চিকিৎসকের অধিকৃত নহে। বিশেষ, যে চিকিৎসা একদিনের জন্য নহে, বাহা গর্ভাধান কাল হইতে শিশুর শৈশবাতিক্রম পর্যন্ত অবলম্বিত হওয়া কর্তব্য, তাহা চলত, অবসর বিহীন, এবং বেতনভোগী চিকিৎসকের উপর নির্ভর করিলে চলে না। বিশেষ অনেক সময়ে, অকস্মাৎ এমন সঙ্কট উপস্থিত হয় যে চিকিৎসক ডাকিবার সময় থাকে না। আর এতদ্দেশে চিকিৎসক পুরুষ জাতি, চিকিৎসানীয়া, লজ্জাশীলা জীজাতি: চিকিৎসার প্রয়োজনও লজ্জাবিশ্বাসকর। অতএব প্রতি গৃহে গৃহে, গৃহী ও গৃহিণীগণ এ চিকিৎসা অবগত না থাকিলে মহাব্যাগণের মঙ্গল নাই। যিনি গৃহে গৃহে গৃহস্থগণের এই চিকিৎসা শিখিবার উপায় বিধান করিবেন, তিনি পরম লোকহিতকারী বলিয়া খ্যাত হইবেন সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশে ডাক্তার যজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায় এই লোকহিতকর ব্রত সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত “ধাত্মশিক্ষা ও প্রসূতী শিক্ষা” গ্রন্থে, গর্ভাধারী গৃহস্থ হইতে এ চিকিৎসার সমুদায় তত্ত্ব, অতি পরিষ্কাররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যজ্ঞ বাবু যে প্রণালীতে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে, শিক্ষিতা হউক অশিক্ষিতা

হউক জীলোক মায়েই বিনাশ্রুৎপন্নমণে এই প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সকল শিক্ষিতে পারেন। যে তাহার জীলোকেবা সচরাচর পরাম্পরের সহিত কথোপকথন করে, সেই ভাষাতেই দুইজন জীলোকের কথোপকথনজলে ইহা রচিত হইয়াছে। ইহাতে এমন কথাই নাই যে সামান্য অশিক্ষিতা জীলোকে তাহা বুঝিতে পারেনা। দুজনে চিকিৎসা তত্ত্ব এইরূপ পরিষ্কার করিয়া যিনি বুঝাইতে পারেন, তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় অসামান্য দক্ষতা সম্পন্ন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ডাক্তার যজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায়, একজন বিখ্যাত সূচিকিৎসক। তিনি এ সকল বিষয়ে যে বিধান দিয়াছেন, তাহা নির্বিবাদে গ্রাহ্য।

গর্ভে বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তব্য তদ্ব্যতিক্রমে অনেক শিশুর শরীর দুর্বল এবং অস্বাস্থ্যপ্রবল হইয়া থাকে। ধাত্মশিক্ষার নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে এই একটি মহৎ অনিষ্টের প্রতিবিধান হইতে পারে। এমন কি একজন ক্ষুদ্র লোকের সন্তান হইয়া অল্প কাল মধ্যেই বিনষ্ট হইত। পরিশেষে তিনি যজ্ঞবাবুর ধাত্মশিক্ষা গুস্তক ক্রয় করিয়া, তাহার নিয়মগুলি প্রসূতী ও সন্তানগণের দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন। সেই অবধি তাঁহার সন্তানগণ কনিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইতে লাগিল। ইহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন। যে গ্রন্থের একপ

অপরিস্রবের শুভ কল, তাহা যে কেমন
আকালিম গৃহে গৃহে থাকে না, ইহাতে
আমরা বিস্মিত হই। যদি শুভদিন
দেখিবার জন্য, পঞ্জিকা গৃহে গৃহে রাখি-
বার প্রয়োজন আছে, তবে জীবনের
শুভবিষয়ক এই গ্রন্থ গৃহে রাখিবার
আবশ্যকতা আছে।

এই স্থলে আমরা সুবিখ্যাত ডাক্তার
চার্লস যজুবাবুকে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে পত্র
লিখিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া
কান্ত হইব।

“It gives me much pleasure to
be able to inform you that after
having had the work critically

examined, and selected passages
either read to me, or translated
for me, I have formed a high
opinion of its merits. I consider
that the subjects you have taken
up are very judicious and your
treatment of them most careful.
I am convinced that an extensive
circulation of the book through
the Bengalee districts in the
Lower Provinces would do that
amount of good which is possible
as long as the management of
women in labor is entrusted to
untrained women who can neither
read nor write.”



কালিদাসের উপমা।

“উপমা কালিদাসস্য”—পৃথিবী বি-
খ্যাত। যেমন হোমবের যুদ্ধ, যেমন
ক্লোদ লোবানের দৃশ্যচিত্র, যেমন পিত্রা-
কার চতুর্দশপদী,—তেমনি—তোমাদিক
—বিখ্যাত, কালিদাসের উপমা। যেমন
বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের ত্রিশূল, ইন্দ্রের
বজ্র, এবং মথুরের কুম্ভেশ্বর—তেমনি
কালিদাসের উপমা—অব্যর্থসন্ধান। পৃথি-
বীতে এমন উপমা-পটু কবি, আর কখন
জন্মগ্রহণ করেন নাই। সংস্কৃতানন্ডিজ
পাঠককে, সেই উপমাকুঞ্জের একছড়া
ফুল হার গাঁথিয়া অন্য উপহার প্রদান
করিয়া

প্রথমে উপমার প্রকৃতি বিচার করিয়া
দেখিলে ক্ষতি নাই। আমাদের বিবে-
চনায় উপমা বিবিধ।

প্রথম, সামান্য উপমা। কতকগুলি
উপমাতে, কেবল একটি মাত্র বস্তুর সহিত
আর একটি বস্তুর সাদৃশ্য নির্দিষ্ট হয়,
যথা চন্দ্রতুলা মুখ। ইহার নাম সামান্য
উপমা দেখিয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, যুক্ত উপমা। যেখানে দুইটি
বা তদধিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের
সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয়, সেখানে উপমার
নাম যুক্ত দেখিয়া যাইতে পারে। দেখ
যেমন বারি বায় করে, রাজা দশরথ

সেইরূপ ধনব্যয় করিয়াছিলেন। এই উপমায়, একদিকে দশরথ ও ধন, একটি বিশেষ সম্বন্ধবিশিষ্ট—দশরথ ধনের ব্যয়কারী, ধন দশরথকর্তৃক ব্যয়িত। অন্যদিকে, মেঘ ও জল সেইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট—মেঘ ব্যয়কারী, জল মেঘকর্তৃক ব্যয়িত। মেঘের সঙ্গে দশরথ, এবং জলের সঙ্গে ধন তুলিত। সামান্যতঃ মেঘ ও দশরথে বা ধনে এবং জলে কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু এখানে কথিত সম্বন্ধবশতঃই সাদৃশ্য ঘটিল। অতএব এখানে, সম্বন্ধই উপমেয়। সম্বন্ধবিশিষ্টের তুলনা আত্মমুখিক মাত্র।

এইরূপ যুক্ত উপমাই সচরাচর অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে; এবং কালিদাসে তাহারই প্রাচুর্য্য। কালিদাস এরূপ উপমাপটু, যে অনেক স্থানে প্রায় প্রতি শ্লোকেই এক একটি উৎকৃষ্ট যুক্ত উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। এবিষয়ে রঘুবংশের প্রথম সর্গ বিখ্যাত। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

বাগর্থ্যাবিবসংপ্তকৌ বাগর্থ্য প্রতিপত্তয়ে ।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্শ্বতী পরমেষ্ঠরৌ ॥
ক নৃধ্যপ্রভবো বংশঃ ক চান্নবিষয়া

মতিঃ ।

তিতীর্ষু হৃদয়ঃ মোহাহুড়ূপেনান্মি
সাগরং ॥

মন্মঃ কবিষশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্মুপ-
হাস্যতাম্ ।

প্রাংশুলভ্যে কলে লোভাহুহা হি ব
বামনঃ ॥

অথবা কৃতবাগ্ধারে বংশেহস্মিন্ পূর্ক
শ্রুতিঃ ।

মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে যজ্ঞসোবান্তি মে
গতিঃ ॥

ভেলার সাগর পার, এবং “বামন হইয়া চাঁদে হাত” এক্ষণে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে, কালিদাসের সময়ে তাঁহার উপমা অভিনব ছিল কি না বলিতে পারি না। বোধ হয় ছিল, কেন না কালিদাসের ন্যায় উপমা-পটু কবি রাধু মাধুর্য্য চরিতচর্চণ করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ কালিদাসের অনেক গুলি উপমা এক্ষণে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। নিম্নোক্ত উৎকৃষ্ট উপমা একটি ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ—

ভীমকাস্তৈর্ণপশুগৈঃ সবভূবোপজীবিনাম্ ।
অধুষ্যাশ্চাভিগম্যাশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ ॥

সেই রাজা ভয়ানক অথচ কমনীয় রাজগুণসমূহ দ্বারা আশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে নক্রচক্রসকুল অথচ রত্নরাজি পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় অনভিভবনীয় এবং আশ্রয়ণীয় ছিলেন।

আর একটি,
প্রজ্ঞানামেব ভূতার্থং স তাভ্যো বলিম-
গ্রহীৎ ।

সহস্র গুণমুৎসৃষ্টমাদত্তে হি রসং রবিঃ ॥

আর একটি,
দেষ্যোপি সম্মতঃশিষ্টে স্তম্ভার্জস্ত যথৌষধম্ ।
ত্যাভ্যো ছষ্টঃ প্রিয়োপাসীদমূলীবোরগ-
কৃতা ॥

তিনি প্রজাদিগের উন্নতি নিমিত্তই
তাহাদিগের নিকট হইতে রাজকর গ্রহণ
করিতেন।

স্বর্ঘ্য সহস্রগুণ দান করিবার নিমিত্তই
পৃথিবী হইতে রসগ্রহণ করিয়া থাকেন।

রোগীর ঔষধের ন্যায়, শিষ্ট ব্যক্তি
শত্রু হইলেও তাঁহার ঐহীক; কিন্তু
দুষ্ট ব্যক্তি প্রিয় হইলেও সর্বদষ্ট অঙ্গ-
লির ন্যায় তাঁহার ত্যাজ্য ছিল।

বশিষ্ঠাশ্রম গমন সময়ে এক রথ কঢ়
রাজদম্পতী—

স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষ মেকং স্যন্দন-

মাস্থিতৌ

প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যাদৈরা বতাবিব।

শ্রুতি সুখাবহ অথচ গম্ভীর শব্দশালী
এক রথাক্রুড় সেই দম্পতী, বর্ষাকালীন
বারিধরাশ্রিত বিদ্যাও ঐরাবতের ন্যায়
শোভিত হইয়াছিলেন।

তৎপরে

রাজোক্তি শ্রবণে বশিষ্ঠের সচিস্তাবস্থা—

ইতি বিজ্ঞাপিতো রাজা ধ্যানস্তিমিত-

লোচনঃ।

ক্ষণমাত্র মুষিস্তহৌ স্পৃগুমীন ইব হৃদঃ ॥

ঋষি, রাজা কর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত
হইয়া, ধ্যানে স্থিরনেত্র হইয়া কিছুকাল
মীনাহতিরহিত হৃদের ন্যায় অবস্থিত
হইলেন।

কুমার সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে অম্বর
পীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত
হইয়াছেন।

তেষামাবিরত্বক্কা পরিস্রানমুখপ্রিয়াং।
সরসাং স্পৃগুপদ্মানাং প্রাতর্দীপ্তিমানিব ॥

তারকাস্বরোংপীড়নে স্রানমুখকাস্তি
সেই দেবতাদিগের সম্মুখে, মুদিতপদ্মা-
সরোবর সম্বন্ধে বাল স্বর্ঘ্যের ন্যায় বিধাতা
আবির্ভূত হইলেন।

ব্রহ্মা দেবগণের তেজোহানি দেখিয়া,
বরুণকে বলিতেছেন।

কিঞ্চায় মরিচ্ছরারঃ পানৌ পাশঃ প্রচেতসঃ
মন্ত্রেণ হতবীর্যস্য ফণিনো দৈন্য-

মাস্রিতঃ ॥

শত্রুহরীর বরুণেব হস্তস্থিত এই পাশাঙ্গ
মন্ত্রকুবীর্য্য সর্পের ন্যায় শোচনীয়াবস্থা
কি জন্য ?

আমরা অন্যান্য হইতে অধিক উপমা
সঙ্কলন না করিয়া, কুমারের তৃতীয় সর্গ
হইতে কিছু গ্রহণ করিব। কাব্যাংশে
কুমারের তৃতীয় সর্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট
রচনা, সাহিত্যসংসারে বড় দুর্লভ। এই
সর্গে মদন কর্তৃক শিবের ধ্যানভঙ্গ বর্ণিত
হইয়াছে। ইন্দ্রের উত্তেজনার মন্থণ,
রতিনহায় হইয়া, বসন্ত সময়ে সেই
মহাসংঘমী মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত
হইলেন। উমাও তথায় গেলেন। তপঃ-
পরায়ণ মহাদেবের বর্ণনা কবিত্বের এক
শেষ। তাহা হইতে একটি উপমা চয়ন
করিব।

অবুষ্টিসংরম্ভ মিবাসুবাং

অপ্যামিবাধার সমুত্তবঙ্গং।

অন্তশ্চরণাং মরুতাং নিরোধাৎ

নিবাত নিষ্কম্মিমিব প্রদীপং ॥

অন্তর্গত বায়ু (প্রাণাদির) নিরোধ হেতু
বর্ষণহীন মেঘের ন্যায়, তরঙ্গহীন সমুদ্রের
ন্যায়, বাতুলভাবে নিষ্চল প্রদীপের জ্বালা
স্থিরতাবাপন্ন ।

উমার বর্ণনা কালে—

আবজ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তন্যভ্যাম্
বাসো বসানা তরুণাক্ষরাগং ।
পর্যাণ্ড পুষ্পস্তবকাবনভ্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥

স্তনভরে শরীর যেন ঈষৎ নত হই-
য়াছে । বালহর্যোর জ্বালা অরুণবর্ণ বস্ত্র
পরিধান করিয়াছেন । গেন পর্যাণ্ড পুষ্প-
স্তবকে নম্র ও নবপল্লবশালিনী লতা
বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে ।

বসন্ত এবং মদনের কার্যো, তপস্বী
কিঞ্চিং বিচলিত হইলেন,

হরন্তু কিঞ্চিং পরিলুপ্তধৈর্য্য
চন্দ্রোদয়ারন্তু ইবাম্বুরাশিঃ ।

চন্দ্রোদয়ে জলনিধির জ্বালা মহাদেবও
কিঞ্চিং ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন ।

পরে রতিবিলাপ—

ক মু মাং ত্বদধীনজীবিতাং বিনিকীর্ষা
ক্ষণভিন্নমৌরুদঃ ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জল সংঘাত
ইবাসি বিদ্রুতঃ ॥

ভগ্নসেতুবন্ধ জলরাশি যেমন জলাধীন
জীবিতা নলিনীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্র-
স্থান করে, তদ্রূপ ত্বদধীনজীবিতা আমা-
কে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রে প্রণয়
ভগ্নপূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিলে ।

কামসখ বসন্ত দর্শনে—

গতএব ন তে নিবর্ত্ততে
স সখা দীপইবানিলাহতঃ ।
অহমস্যাদশেব পশ্য মা
মবিসহ্য বাসনেন ধুমিতাং ॥

তোমার সেই সখা বায়ুতড়িত দীপের
ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর
ফিরিবেন না । আমি নিরীক্ষাণিত দীপের
দশাবৎ অসহ্যঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ ।

পরে অমুকুল আকাশবাণী হইল ।

ইতি দেহ বিমুক্তয়ে স্তিতাং
রতিমাকাশভবা সরস্বতী ।
শফরীং হ্রদশোষবিক্রবাৎ
প্রমথ্য বৃষ্টি রিবাহকম্পয়ং ॥

সরোবর শুষ্ক হইলে বিপন্ন শফরীকে
প্রথম বৃষ্টি যেমন অমুকুলা প্রদর্শন করে,
সেইরূপ দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় আকাশ-
বাণী রতিকে অমুগ্রহ প্রকাশ করিল ।

পরে ক্ষুদ্রমনে উমা গৃহে প্রত্যাগমন
করিয়া তপস্চরণে অভিলাষিণী হইলেন ।
তখন জননী মেনকা তাঁহাকে বিরত
করিতেছেন ।

মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতা
স্তপঃ ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ ।
পদং সহৈত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং নপুনঃ পতত্রিণঃ ॥

হে বৎসে! মনোহরীষ্ট দেবতা গৃহে-
তেই আছেন । তুমি তাঁহাদিগের আরা-
ধনে প্রবৃত্ত হও । কষ্টসাধ্য তপস্যা
কোথায় আর তোমার সুকোমল শরীরই
বা কোথায় । কোমল শিরীষ ক্ষুদ্র
ভ্রমরের পদভর সহ্য করিতে পারে কিন্তু
অন্য পক্ষীর নহে ।

এখন মেঘদূত হইতে কয়েকটি উপমা
সঙ্কলন করিব।

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীম্বিতং মৈ
দ্বিতীয়ঃ
দুরীভূতে ময়ি সহচবে চক্রবাকী মিবৈকাং।
গাঢ়োৎকর্ষণঃ শুক্লবু দিবসেসেবু গচ্ছৎস্ব
রালাং
জাতাং মন্ত্রে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং
বানকপাং ॥

আমি প্রিয়ার সদাই সহচব ছিলাম।
কিন্তু দৈবনিগ্রহে এক্ষণে দূরবর্তী। স্মৃত
রাং সহচব চক্রবাক বিবহিত একাকিনী
চক্রবাকী তুল্য। সেই মিতভাগিনীকে
আমার দ্বিতীয় জীবিততুল্য জানিবে।
আমি অনুমান করিতেছি প্রবল উৎকর্ষণ
দ্বিত্য সেই সুকোমলাঙ্গী বিবহমতঃ এই
সকল দিবস অতিক্রান্ত হইতে হইতেই
হিমক্লিষ্টা পদ্মিনীর হ্রাস পূর্বাকারেব
বিপবীতাকাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।
নুনঃ তন্ত্রাঃ প্রবল রদিতোচ্চননেত্রঃ প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধার্যঠং।
হস্তগুপ্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকড়া
দিন্দোদৈর্ঘ্যং স্বদন্তসবর্ণক্লিষ্টকাস্তে বিতর্জিতঃ ॥

হে মেঘ! প্রবল রোদন হেতু উচ্চ
সিত নেত্র, উষ্ণ নিশ্বাসবশতঃ বিবর্ণ
অধরৌষ্ঠ, সংস্কারভাবে লম্বমান কুন্তল
হেতু অসম্পূর্ণ প্রকাশিত এবং কবচল
নিগুপ্ত প্রিয়ার বদনটী তোমারই অব-
বোধে স্নানকাস্তি চক্রে ন্যায় হইয়াছে।
আবিষ্কার্যঃ বিবহশয়নে সন্নিবস্নৈকপার্শ্বাঃ
প্রোচীমূলে তন্ত্রমিব কলামাত্র শেখাঃ
হিমাংশোঃ।

হে মেঘ! মানসিক যন্ত্রণায় কুশঙ্গী,
বিরহশয্যায় একপার্শ্ব শায়িনী, সেই প্রি-
য়াকে পূর্ষদিকে কলামাত্রাবশিষ্ট চক্রে
মূর্তির ন্যায় অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী
চক্রেব ন্যায় দেখিবে।

পাদানিন্দোরমৃত শিশিবান্ জালমার্গ প্রি
ষ্টান্
পূর্ষপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃখেদাং সলিলগুপ্তভিঃ পদ্মভিচ্ছা
দয়ন্তীং

সাত্রেহল্লিব স্তলকমলিনীং নপ্রবৃদ্ধাং
নসুপ্তাং ॥

পূর্ববৎ প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া গবাক্ষ
পথে প্রবিষ্ট, শীতল চক্রে সন্নিব প্রীতি
নিয়মিত কিন্তু অসহ্য বোধে তৎক্ষণাৎ
প্রত্যাবৃত্ত চক্ষু, জলভরগুরু পদ্মদ্বারা
আচ্ছাদন কবতঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে অধিক
সিত অমুদিত স্তলনলিনীর অবস্থা প্রাপ্ত
ঐহাকে দেখিবে।

বদ্ধাপাঙ্গপ্রসবমলকৈরঞ্জনয়েহশৃংখলং
প্রত্যাদেশাদপিচ মধুনো বিস্মৃত জ্বিলাসং।
জ্বায়াসন্নয়নমুপবিষ্পন্দিত শক্রে মৃগাক্ষা
মীনাক্ষাভাকুদাকুবলয় শ্রীতুলা মেঘাতীতি ॥

অবিন্যস্ত দীর্ঘালক বশতঃ অপাঙ্গ প্রস
ববিহীন, স্নিগ্ধাঞ্জন রহিত, মধুপানাবে
জ্বিলাসবর্জিত মৃগনয়নীয় বামনয়নী
তুমি নিকটবর্তী হইলে উপরিভাগে
স্পন্দিত হইয়া মীনচলন বশতঃ চঞ্চল
কুমলশোভার তুলনা প্রাপ্ত হইবে।

ক্রমশঃ

ভারতমহিলা ।*

প্রথম অধ্যায় ।

[প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বুদ্ধিবৃত্তি ।]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানা বিদ্যার চর্চা ছিল। আর্ষ্য পণ্ডিতেরা নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। গণিতশাস্ত্র ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথমে উন্নতি লাভ কবে। ভারতবর্ষীয়দিগের দর্শনশাস্ত্র ইয়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র হইতে কোন অংশেই নূন নহে। ইয়ুরোপীয়েরা সহস্র বৎসর চিন্তার পর যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার কবিত্তেছেন তাহাব অনেক তত্ত্ব প্রাচীন ঋষি ও পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল শাস্ত্র আলোচনায় গভীর চিন্তার প্রয়োজন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন, ও দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক পরিশ্রমেব প্রয়োজন সে সকল শাস্ত্রই ভারতবর্ষে সমুন্নতি লাভ করিয়াছে।

[তীহাদিগের কল্পনাশক্তি ।]

আর্ষ্য পণ্ডিতেরা শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির পবিচালনা করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন নাই। তীহাদিগের কল্পনাশক্তিও বিগড়ন তজ্জ্বিনী ছিল। তীহাদিগের সাহিত্য, "মহাভারত" বিশেষ। উহাতে যেরূপ চাও তাহা মিলিবে। কি নৈসর্গিক সামগ্রী নদ, নদী, পর্বত, কন্দর, কি শিল্প সামগ্রী,

প্রাসাদ, বাপী, উপবন, ক্রীড়ামণ্ডল; কি আন্তরিক গভীরভাব হৃদয় বিদারকশোক-প্রবাহ, কি আনন্দনিস্যাদিনী প্রণয় বর্ণনা, সকল বিষয়েই আর্ষ্যকবিগণ আপনাদিগের কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে তীহারা সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইয়াছেন।

[কবিত্বশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব ।]

কবিদিগের এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে তীহারা যদি কোন জঘন্য বা ভয়ানক বস্তু বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন তাহাও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও আমাদের আন্তরিক কুস্তি হয়। শ্মশান অতি ভয়ানক পদার্থ; কিন্তু ভবভূতি সেই শ্মশান বর্ণনা করিয়াই তীহার পাঠকবর্গের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব তীহারা যদি কোন উৎকৃষ্ট বস্তু বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন, যাহা লোকে ভাল বাসে এমন কোন বস্তু বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তীহারা যে আরো অধিক প্রীতি উৎপাদন করিবেন, আশ্চর্য্য কি? প্রণয় মহাব্যাসদয়ের একটি অমূল্য রত্ন। নারীগণ সেই প্রণয়ের আধিপত্যী। সুতরাং কবিগণ সকল দেশে ও সকল সময়েই নারীচরিত্র বর্ণনা

* এই প্রবন্ধ মহাবল্লভ প্রীতি হুলকার প্রদত্ত পুস্তকের প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রণীত।

করিয়া মানবমণ্ডলীর আনন্দ সমুৎপাদনের জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন।

[আর্য্য কবিকল্পিত নারীচরিত্র।]

আমাদিগের আর্য্যকবিগণ আপন আপন কল্পনাশক্তি বলে যে নারীগণের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা বিধিনির্মিত রমণীগণাপেক্ষা অনেকাংশে অধিকতর রমণীয় পদার্থ। তাঁহাদের কাহার চরিত্র পাঠ করিলে শোকে হৃদয়ের দ্রবীভাব হয়, কাহার চরিত্র পাঠে হৃদয় প্রেমরসে আপ্ত হইয়া, কাহার ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিলে আত্মার বৈশদ্য সম্পাদন হয় এবং সকলেরই কথা মনে হইলে আনন্দের সঞ্চার হয়। এক্ষণে সেই সকল প্রধান কবিকল্পনা-সম্বৃত-রমণীগণের মধ্যে কোনগুলি সর্বোৎকৃষ্ট নির্ণয় করিতে হইবে।

[কল্পনাশক্তির প্রতিদ্বন্দী কারণ।]

কবিরা যখন লেখনী ধারণ করেন তখন তিনটি কারণ বশতঃ তাঁহাদের কল্পনা শক্তির সর্ব্বতোমুখী তেজস্বিতা প্রকাশ পাইতে পারে না। ১ম। কবিরা সমসাময়িক অবস্থার বিরোধী কোন বিষয়ের বর্ণনা করিতে সঙ্কুচিত হন। ২য়। তাঁহারা যে দেশের জন্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন সেই দেশের লোকের যাহাতে প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন সে বিষয়েও তাঁহাদের সচেতন থাকিতে হয়। সুতরাং জাতীয় স্বভাবও কল্পনাশক্তিকে সমাক্ষেপিত হইতে দেয় না। কবিদিগের নিজ স্বভাবও

সময়ে সময়ে উহার প্রতিদ্বন্দী হয়। এই তিনটির মধ্যে আবার সামাজিক অবস্থাই প্রধান প্রতিদ্বন্দী। জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাব সময়েই প্রতিদ্বন্দী না হইতেও পারে। মিল্টনের মহাকাব্য যে সময়ে লিখিত হয় সে সময়ে জাতীয় স্বভাব অতি জঘন্য ছিল। কিন্তু মিল্টন ভাবিতেন যদিও আমার কাব্য এসময়ে কেহ আদর করিবে না কিন্তু জাতীয় স্বভাব ভাল হইলে অবশ্যই ইহার আদর হইবে।

[সর্বোৎকৃষ্ট নারীচরিত্র বর্ণনা হুজুহ।]

কবিকল্পিত রমণীচরিত্র অবশ্যই বিধিনির্মিত রমণীচরিত্র হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। কিন্তু কবিদিগকেও আবার পূর্ব্বোক্ত তিনটি কারণের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয় সুতরাং সর্বোৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র Highest Ideal চিত্রিত করা তাঁহাদিগের পক্ষেও হুজুহ।

[সর্বোৎকৃষ্ট রমণীর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, নির্ণয় করা যায়।]

যদি কোন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দী কারণত্রয়কে পরিহার করিয়া স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তি বলে কোন অনন্য সাধারণ গুণসম্পন্ন কামিনীর চরিত্র বর্ণনা করেন তবে সেই রমণীই নারীকূলের প্রধান রত্ন হইবে। তাহার চরিত্রই রমণীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest Ideal হইবে। তাহার সহিত তুলনায়, কবিকল্পিত রমণীগণ অনেকাংশে নূন হইবে। কোন

কবিই,এপর্যন্ত তাদৃশ রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোন কবিই এপর্যন্ত সামাজিক বন্ধন হইতে আপনাকে সম্যকরূপে মুক্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু যদিও এরূপ রমণীসৃষ্টি করা একান্ত কঠিন, যদিও কোন কবি এরূপ রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তথাপি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাজেই তাদৃশ রমণীর কোনও গুণ থাকা আবশ্যক অসম্ভব করিতে পারেন। তাঁহার কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি তেজস্বিনী হওয়া উচিত কোন্ কোন্ বৃত্তি নিস্তেজ হওয়া উচিত তাহাও চিন্তা করিলে অবগত হওয়া যায়।

[মহুযোর মনোবৃত্তি বিভাগ।]

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা মহুযোর মানসিকবৃত্তি সকলকে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি ২য় মেহ প্রবৃত্তি ৩য় কর্মনিষ্ঠতা।* যে শক্তিদ্বারা গণিত ও পদার্থ বিদ্যার সমুন্নতি করা হয়, যে শক্তিদ্বারা আপনকে কর্তব্য কর্ম নির্দেশ করিয়া লওয়া যায়, যাহাদ্বারা রাজমন্ত্রীরা রাজকার্য পর্যালোচনা করেন, সেনাপতিরা সৈন্যবাহরচনা করেন, দার্শনিকেরা কূটার্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়েন, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা আমরা সামাজিক লোকের সহিত সদ্ভাব করিয়া চলিতে পারি, যাহাদ্বারা পিতামাতাকে ভক্তি করিতে,

* Intellectual Emotional and Active powers.

পুত্রাদিকে মেহ করিতে, ছরবন্ধকে দয়া করিতে, বন্ধুগণকে ভাল বাসিতে শিখি তাহার নাম মেহ প্রবৃত্তি। মেহ প্রবৃত্তি স্নেহ ও হৃৎখের কারণ। মহুযোর যে কিছু কোমল মানসিক ভাব আছে সে সকলই এই বিভাগের অন্তর্গত। কর্মক্ষমতা ইচ্ছাশক্তির অপর নাম। শুদ্ধ মানসিক ইচ্ছা থাকিলেই হয় না। যে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়, যাহা দ্বারা লোকে অপার সমুদ্র পার হইয়া, পর্বত অতিক্রম করিয়া, জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, ঈপ্সিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় সেই যথার্থ কর্মক্ষমতা।

এই তিনটি প্রবৃত্তিই মহুযোবৃত্তিবৈচিত্র্যের নিরন্তর সমভিব্যাহারী। অতি মূর্খ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হটেস্টট দিগেরও বুদ্ধিবৃত্তি আছে। নরমাংসলোলুপ আণ্ডামান বাসীদিগেরও মেহপ্রবৃত্তি আছে এবং জড়প্রায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান কাকিদিগেরও কর্মক্ষমতা আছে। তবে পরিমাণগত ইতর বিশেষ মাত্র। আমরা ইন্ডার ভিন্ন আর কুত্রাপি এত বৃত্তিজয়ের যুগপৎ সমুন্নতি ও প্রকর্ষ পর্য্যন্ত (Perfection) কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু এরূপ সমুন্নতিকল্পনা করিতে পারি যাহার সকল কয়টাই সতেজ এবং একটী, মহুযোর পক্ষে যতদূর সম্ভব, সমুন্নতি লাভ করিয়াছে।

[কাব্যলিখিত পুরুষচরিত্রের প্রাকর্ষপর্য্যন্ত।]

যখন আমরা পুরুষচরিত্রের চরম উৎকর্ষ কল্পনা করি তখন আমরা তাঁহাকে

যতদূর পারি কর্মক্ষম করি তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তিকে বিলক্ষণ তেজস্বিনী করি। তাঁহার স্নেহ প্রবৃত্তিকে বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করি। কিন্তু তিনি যদি কর্তব্যাকর্ম সম্পাদনের জন্য সেই তেজস্বিনী স্নেহপ্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিতে পারেন তবেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি। রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলেন দাতা কর্ণ পুত্রকেও বধ করিলেন তিনজনই স্নেহপ্রবৃত্তিকে কর্তব্য কর্মের দ্বারে বলি দিলেন। এবং তিনজনই জগদ্বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইলেন।

[তাদৃশ নারী চরিত্র।]

কিন্তু যখন আমরা ঐরূপ নারীচরিত্র চিত্রিত করিতে বসি তখন আমরা তাঁহাকে পুরুষের ঠিক বিপরীত করিয়া চিত্রিত করি। পুরুষের যেমন, কর্মক্ষমতা সর্বত্র হইবে নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি সেই রূপ। তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সকল সর্ব-তোভাবে সমুন্নতি লাভ করিবে। প্রণয় তাঁহার জীবন স্বরূপ হইবে। পিতৃ-ভক্তি, মাতৃভক্তি, অপত্য স্নেহ, সর্কভূতে দয়া, দীক্ষার পরায়ণতা, প্রভৃতি যাবতীয় কোমল স্তন্দর এবং মানস প্রফুল্লকারী বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে। বুদ্ধি বৃত্তি ও কর্মক্ষমতা সম্ভবমত থাকা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বিনী হইবে; কর্মক্ষমতা তাহা অপেক্ষা মূম হইলেও ক্ষতি নাই। তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা অনেকে প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন,

অধুনা তন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সমান স্বভাবিকারী, স্ত্রীরাও সহিষ্ণুতা অপেক্ষা কর্মক্ষমতা তাঁহাদের মতে অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া স্বামীর জন্য, পুত্রের জন্য, পিতার জন্য, পরের উপকারে জন্য তাঁহাকে নাগাবিধ শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় তবে সে সহিষ্ণুতা অবশ্যই তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় হইবে।

[নারীচরিত্রে স্নেহপ্রবৃত্তি প্রধান হইবে বলিবার কারণ।]

অমেকে বলিবেন স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল হইলেই যে নারীচরিত্র উৎকৃষ্ট হইবে এরূপ বলিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে আমরা দেখিতে পাই ইতর জন্তু-দিগের মধ্যেও নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল; মনুষ্যদিগের মধ্যেও পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহপ্রবৃত্তি বলবতী এবং যে কোন কবিই নারীচরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তিকেই অধিকতর প্রকাশিত করিতে যত্ন করিয়াছেন। সম্ভ্রাম লালনপালনের ভার সর্বত্রই স্ত্রী লোকের প্রতি অর্পিত হয় এই জন্য স্ত্রীলোকের অপত্য স্নেহ বলবান হইয়া উঠে। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল এজন্য স্ত্রীলোককে পুরুষের আশ্রয়ে বাস করিতে হয় স্ত্রীরা যে সকল মনোবৃত্তি থাকিলে সমাজে সম্মানের সহিত চলা যায়; তাঁহার পক্ষে সেগুলির আপনাই প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

অতএব স্থির হইল যে দেশগত কাল-গত অবস্থাগত বৈলক্ষণ্য পরিহার পূর্বক নারীচরিত্রের প্রকৃষ্ট পর্য্যাপ্ত বা Highest Ideal স্থির করিতে হইলে তাঁহার স্নেহ প্রবৃত্তিকে যতদূর পারা যায় তেজস্বিনী করা আবশ্যিক। তাঁহার কর্মণাতা ও বুদ্ধিবৃত্তিও বিলক্ষণ প্রকাশ থাকা উচিত। কর্তব্য কর্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকিবে। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অমুরোধে তাঁহাকে সমস্ত কর্তব্যকর্মে জলাঞ্জলি দিতে হয় এবং যারপরনাই শারীরিক যত্ননা ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

প্রস্তাবের অবতারণা।

পৃথিবীস্থ তাবদেশের কবিগণই এই উৎকৃষ্ট নারীচরিত্রের অমুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সামাজিক নিয়ম জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাবের অমুরোধে প্রায় কেহই এরূপ সর্কাঙ্গীন স্নন্দরচরিত্র চিত্রিত করিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইয়াছেন নাই। আমরাদিগের প্রাচীন কবিগণও পূর্বোক্ত কারণত্রয়ের অমুরোধে এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু শকুন্তলাদি সৌভাগ্যবতী কামিনীগণের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বোধ হয় তাঁহারা নান্নিকা কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। হিন্দু দিগের সাহিত্যমধ্যে যাদৃশ সর্বগুণসম্পন্ন পতিপরায়ণা কার্যকুশলা রমণীগণের বিবরণ পাঠ করা যায় পৃথিবীর আর কোন দেশীয় কবিগণের গ্রন্থাবলীতে

তাদৃশ রমণীচরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

এইরূপ উপক্রমণিকার পর দেখা যাইক আখ্যাকবিগণ নারীচরিত্র বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন এবং কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা জ্ঞী লোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে প্রথমতঃ তৎকালে জ্ঞীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার পর্যালোচনা করা আবশ্যিক। যে হেতুক কল্পনাশক্তি যতদূর তেজস্বিনী হউক না কেন, যতই নূতন পদার্থ নির্মাণে সমর্থ হউক না কেন, উহা কবির সমসাময়িক সামাজিক অবস্থাকে আশ্রয় করিয়াই নিজশক্তি প্রকাশে সমর্থ হয়। অতি নৈসর্গিক ঘটনা বর্ণন-কুশল কবীজ মিল্টনের আলৌকিক কাব্যেও তাঁহার সমকালবর্তী কেবালিয়ার ও পিউরিটান দিগের প্রতিকৃতি চিত্রিত হইয়াছে। অতএব আমরাও এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে তৎকালীন জ্ঞীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। পরে কালিদাস বাণীকি বেদব্যাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ জ্ঞীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিব।

[সামাজিক অবস্থা জানিবার উপায়।]

সেই সামাজিক অবস্থা জানিবার নানা উপায় আছে। প্রথমতঃ বেদ, দ্বিতীয় স্মৃতি, তৃতীয় পুরাণ এবং চতুর্থ তন্ত্র। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোন স্থানেই স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থা একত্র বর্ণনা নাই। নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ পুরাণেব অধিকাংশ আবার কবিকল্পনাসম্মত। স্মৃত্যং উহাকে প্রকৃত সমাজ চিত্র কোন রূপেই বলা যায় না। বেদ ও তন্ত্র উপা সনা প্রণালী ও অন্যান্য ধর্ম সংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ, কিন্তু স্মৃতিসংহিতা সকলেই প্রকৃত সমাজেব মণার্থ প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়। বর্ণধর্ম বর্ণন করাই স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব উহা হইতে আমরাই প্রমাণ প্রয়োগ অধিক পবিমাণে সংগৃহীত হইবে।

[১ স্ত্রীলোকের আদি।]

আমাদিগেব দেশীয় বৃদ্ধেবা কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই জিজ্ঞাসা করেন ইহার আদি কি? অর্থাৎ পুৰাণ বা স্মৃতিতে কিরূপে ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছে। সেইরূপ, প্রস্তাবের প্রথমে আমরা জিজ্ঞাসা করি স্ত্রীলোকের আদি কি? বাইবেলাদি পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বলে আদ্য-মের পঞ্জর হইতে, ইবের উৎপত্তি আর পুরুষের স্মৃতির জন্যই স্ত্রীলোকেব উৎপত্তি। ইহাতে স্ত্রীলোক যেন পুরুষের অপেক্ষা অমেক নীচ জাতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের

মর্যাদা অনেক অধিক। 'আনাদিগেব সৃষ্টি প্রকরণ প্রধানতঃ দুই প্রকার। ১ম। আদ্যাশক্তি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকই ব্রহ্মা-ণ্ডের মূল। দ্বিতীয় নাব্যবণ বা ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং আপন দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করেন, একভাগে পুরুষ ও অপরভাগে নারী উৎপত্তি হয়। দ্বিধা রুদ্রাঙ্গানাদেহমর্দেন পুরুষোত্তরং অর্দেন নারী" মমঃ।

[ও প্রযোজন।]

আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীলোক ভোগের জন্য নহে, মমু স্ত্রীলোকেব তিনটি প্রয়ো-জন নির্দেশ করিয়াছেন যথা উৎপাদন মণতাস্ত্র জাতসা পরিপালনং প্রতাহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনং ॥

[স্ত্রীলোকেব স্বাধীনতা ছিল না।]

যদিও স্ত্রীলোক পুরুষের পঞ্জর হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ স্ত্রী-লোকে পুরুষের যাবজ্জীবন অধীন ক-রিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি" ইহা সকল ঋষিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়া-ছেন। মমু বলেন, "স্ত্রীলোকের অভি-ভাবকেরা তাহাদিগকে দিন রাত্রি আপ-নাদের অধীনে রাখিবে। নিয়মমত বিশ্রাম সময়েও স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদি-গের রক্ষাকর্তার নির্দেশমত কার্য করিতে হইবে।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "পিতা মাতা বাল্যকালে, স্বামী যৌবনে ও বৃদ্ধা-

বস্ত্রায় পুঞ্জেরা জীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ইহাদের অভাব হইলে, আত্মীয় বান্ধবেরা উহাদিগের রক্ষা করিবে। জীলোক কোন মতেই স্বাধীন হইতে পারিবে না।” ব্রহ্মপতি বলেন, “স্বস্ত্র অথবা অন্য কোন প্রাচীন জীলোকে তরুণবয়স্ক জীলোকদিগকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করিবে।” নারদ বলেন, “যদি স্বামীর বংশ নির্মূল হয়, অথবা জ্ঞাতির উত্থাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নির্মূল হইলে, রাজা জীলোকের রক্ষক হইবেন। যদি ঐ জীলোক ধর্ম্মবিরুদ্ধ পথগামিনী হয়, তবে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন।” পৈতৃনিসী বলেন, “জীলোকদিগকে সর্বদা সাবধানে রাখিবে দেখিও যেন সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হয় না।”(১) এই সকল বচন দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইবে, জীলোকের স্বাধীনতা কোন প্রকাবেই প্রাচীন ঋষিদিগের সম্মত নহে। কিন্তু মহাভাবতে আমরা এক সময়ের কথা শুনিতে পাঠি, তখন জীলোকে পুরুষের নাম সর্বপ্রকারে স্বাধীন ছিল।(২)

[জীলোক অবরোধবর্ত্তিনী ছিল না।]

যদিও জীলোকের স্বাধীনতা বিষয়ে ঋষিরা সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্তু তাহা বলিয়া জীলোক যে অবরোধবর্ত্তিনী থাকিতেন তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(১) D. N. Mitra's decision in the great Unchastily case.

(২) খেতকেতুপাখ্যান।

প্রত্যুত দেখা যাইতেছে, সীতা রামের সহিত বনগমন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীও পঞ্চ পাণ্ডবের অদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যারা ত কখনই অপরুদ্ধ ছিলেন না ও থাকিতেন না। মহাভারতীয় দেবযানী উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। কাব্য গ্রন্থ সকলে যে “শুদ্ধান্ত,” “অন্তঃপুর,” “অবরোধ,” ইত্যাদি কথা দেখা যায়, তাহাতে এই বোধ হয় যে, ঋষিরা রাজাদিগের গৃহিণীরাই অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন। যাহারা ৭০০৮০০ বিবাহ করিবে তাহাদের অবরোধ সূতরাং প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু আর্ধ্যগণ প্রায়ই একটি মাত্র বিবাহ করিতেন, এবং নির্মূল গার্হস্থ্য সূত্রে অধিকারী ছিলেন। মুসলমানদিগের ভ্রাতৃ তাহারা জীলোকদিগকে ভোগার্থ মাত্র বলিয়া মনে করিতেন না। জীলোকদিগের প্রতি তাঁহারা সর্বদাই ভাল ব্যবহার করিতেন। মনু বলিয়াছেন, “যে গৃহে জীলোকেরা অসন্তুষ্ট থাকে, সেখানে কখনই ভদ্রহুতা নাই।” জীলোকেরা যে অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই যে অরুদ্ধতী সর্বদাই সপ্তর্ষিদিগের সমভিব্যাহারিণী থাকিতেন। রাজাদিগের প্রধানা মহিষী প্রায়ই সিংহাসনারূপভাগিনী হইতেন। আর “সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ” এই এক নিয়ম। প্রায় সকল ধর্ম্ম কর্ম্মই জীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত সভায় উপস্থিত হইতেন। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,

ক্ৰীড়াং শবীবসংস্কারং সমাজোৎসব-

দর্শনং।

হাস্যং পবগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিত-

ভর্তৃকা ॥

অর্থাৎ স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী পবেব বাটী বাইবে না কোন সমাজ বা উৎসব স্থলে উপস্থিত হইবে না। তাহাইলে স্বামী গৃহ থাকিলে, স্বামীর অমুমতি লইয়া স্ত্রী সর্বত্র গতাযাত কবিত্তে পাবিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শব্দশাস্ত্র হইতে এই বিষয়ের আর এক প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐশ্বরীণী বলি লেই ব্যভিচারিণী বুঝায়। যে স্ত্রী আপন ইচ্ছামত কার্য্য কবিত, তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিত স্মৃতিবাং স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু কুটা বলিলে পূর্বকালে দুই স্ত্রীলোক বুঝিত না সে হেতু “কুলটার অপত্য” এই অর্থে “কৌলটিনেস” পদ হইয়া থাকে। যদি দুই বুঝাইত কৌলটেব বা কৌলটার পদ হইত। “কুলগোপাভ্যো বৈবাবো” এই যুক্তবোধের স্থানে ক্ষুদ্র অর্থাৎ নিচাশয়া বুঝাইলেই এষ বা আব পত্যয় হয়। অতএব কৌলটিনেস এই পদ প্রয়োগ থাকাতাই বোধ হইতেছে এক সময়ে কুলটা শব্দের অসদর্থ ছিল না অর্থাৎ এক সময়ে যাহারা বেড়াইয়া বেড়াইত তাহারা মন্দনীয় হইতনা।*

* কুলং গ্রামং অটতি গচ্ছতি ভ্রম্যতি ইতি প্রাচীন ব্যুৎপত্তি কুলমটতি তাজতি ইতি নূতনব্যুৎপত্তি। কুলটাশব্দ সতী

[স্ত্রীলোক দিগেব বিদ্যা শিক্ষা।]

“কতাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া তিব্রতঃ “যেমন পুত্রের শিক্ষাদান আব শ্যক সেই কপ স্ত্রীলোক দিগেবও শিক্ষাদান আবশ্যক। এই শিক্ষা কি রূপ? হুহ শাস্ত্র বেদ ভিন্ন স্ত্রীলোকে সকল শাস্ত্রেই অধিকারিণী। কিন্তু আমবা দেখিতছি গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক বেদেও সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়া ছিলেন।

এবং একস্থলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীলোক দিগকে বেদে উপদেশ দিতেছেন। বেদ দুই প্রকার কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ইহাব মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড অতি হুহ কিছু গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যাব নিকট জ্ঞানকাণ্ডে উপদেশ পাইয়া ছিলেন। ভবভূতি প্রণীত উত্তর চণিত নাটকেও দেখা যায় যে এক জন তাপসী বেদান্ত অর্থাৎ কোদর জ্ঞানক ও অধ্যয়ন কবিবাব জগৎ বাল্মীকি মুনিব আগ্রম হইতে আশ্রমাস্তব গমন করিতেছেন। উক্ত মহাকবির আর এক খান নাটকে কামন্দকী, ভূবপু ও দেববাত নামক দুই জন প্রসিদ্ধ অমাত্যের সহাধাযিনী ছিলেন। এতাল সন্দেহ হইতে পারে যে কামন্দকী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিনী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বিনী ছিলেন না। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকেও পণ্ডিত কৌষিকী স্বকীয় বিদ্যাবত্তা প্রযুক্ত পণ্ডিত উপাধি অর্থে ব্যবহৃত হয় বাসন্তরুকবাগীশ মুখ্য বোধের টীকাব লিখিয়াছেন।

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্য কালে হিন্দু ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। স্মৃতরাং বোধ হইতেছে অতি প্রাচীন কালে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই সমান রূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন। আমরাগের দেশে যে স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা দৃষ্ট হয় তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্শ্ববর্তী বাংলা কালেই নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া ছিলেন। বিদ্যা বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা যে কত দূর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহার কতক অবগত হইতে পারা যায়।

বিশ্বদেবী গঙ্গা বাক্যাবলী নামক এক খানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন। লক্ষ্মী দেবীর প্রণীত মিতাক্ষরার টীকা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ভাস্করাচার্য্যের পাটীগণিত ও বীজগণিত লীলাবতীকে সযোজন করিয়া উক্ত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যের কাব্যে আর একজন প্রসিদ্ধ লীলাবতী ছিলেন। শঙ্করবিজয় গ্রন্থের শেষভাগে শঙ্করাচার্য্য কলিঙ্গদেশে একটি স্ত্রীলোকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কর্ণাট দেশীয় রাজার মহিষী কালিদাসের কবি হবিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। বল্লালসেনের পুস্ত্রবধুও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

[স্ত্রীলোকের বিবাহ।]

পিতা উপযুক্ত পাত্রের কন্যা সম্প্রদান

করিবেন। এইটিই সকল মুনির মত কিন্তু কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে যদি পিতা বিবাহ দিবার কোন উদ্যোগ না করেন তাহা হইলে কন্যা ইচ্ছামত পাত্র মনোনীত করিয়া লইতে পারিবে। (মহু) উপযুক্ত পাত্রের কন্যাদান করিলে অক্ষর স্বর্গ লাভ হয় নচেৎ নরকে ঘাইতে হয় এই নিয়ম থাকায় অল্পপুত্র পাত্রের কন্যা সম্প্রদান প্রায়ই ঘটিত না। বিশেষতঃ বরের গুণাগুণ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ কঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতেও অপাত্রের কন্যাদান ঘটয়া উঠা ভার হইত। তিনি বলিয়াছেন, এতৈরেব শুণৈযুক্তঃ সর্বঃ শ্রোত্রিয়োবরঃ। যজ্ঞাংপরীক্ষিতঃ পুংস্তে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রসিদ্ধ টীকা মিতাক্ষরাগ্রন্থে এই বচনটির বিশিষ্টরূপ ব্যাখ্যা আছে যথা, “যুবা,” অর্থাৎ পিতা অতীতবয়স্ক ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না “ধীমান্” অর্থাৎ জড়নতি বৈদ্য গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তি বিবাহের উপযুক্ত নহে “জনপ্রিয়” অর্থাৎ কর্কশস্বভাব ব্যক্তিকে কন্যাদান নিষিদ্ধ। এই বচন দৃষ্টে তৎকালে বর পরীক্ষার নিয়ম ছিল জাহাও জানা যায়। যদি বর সর্বপ্রকারে শাস্ত্রসম্মত হয় তবেই তাহাকে কন্যাসম্প্রদান করিলে পিতার পুণ্যসঞ্চয় হইবে। মহু আরো বলিয়াছেন যদি শাস্ত্রানুমোদিত বর না পাওয়া যায় তবে বর কন্যা দাবজ্জীবন

পিতৃগৃহে বাস করিবে তথাপি অমুপযুক্ত বরে কন্যাদান করিবে না।

অনেকে বলিতে পারেন বর ও কন্যা পরস্পর মনোনীত না করিয়া লইলে অনেক সময়ে পতি পত্নীর অপ্রণয় নিবন্ধন নানাপ্রকার সাংসারিক কষ্ট হইত এবং ঈশ্বরাজ্ঞ জাতিমধ্যে যেরূপ কোর্ট সিপ প্রচলিত এরূপ কোন প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। এরূপ বলা একান্ত ভ্রমের কর্ম। বাস্তবিক আমাদের দেশে স্বামী ও স্ত্রী মনোনীত করিবার যে প্রথা ছিল তাহা কোর্টসিপ অপেক্ষাও সুন্দর। প্রথমতঃ কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কন্যা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারিত এবং যদি বাগ্দানেব পর বরের মৃত্যু হয় এবং বরের ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ হয় তবে কন্যার সম্মতি অপেক্ষা করিত। দ্বিতীয় গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত থাকায় বর ও কন্যা ইচ্ছামত পরস্পর প্রণয় জন্মিলেই বিবাহ করিতে পারিত। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এই বিবাহ অপ্রশস্ত। ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অপ্রশস্ত হইবার কারণ আছে। ব্রাহ্মণদিগের চতুর্বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্বে বিবাহ নিষিদ্ধ। গান্ধর্ব্ববিবাহ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চলিত থাকিলে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। আর ইন্দ্রিয়সংযম ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কর্তব্য। ইন্দ্রিয় সংযমও নিরন্তর গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন ভিন্ন হইতে পারে না সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে ইচ্ছা-

মত বিবাহ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধই ছিল। নির্দিষ্ট বয়সের পর তাহারা স্বাভাসম্মত কন্যা মনোনীত করিয়া লইতেন। তৃতীয়তঃ অতি প্রাচীন কালে বর ও কন্যা পরস্পর মনোনীত করিবার আর এক চনৎকার প্রণালী ছিল। কন্যার পিতা বিবাহযোগ্য কালে কন্যাকে অস্থান করিয়া কহিতেন বৎসে তোমার বিবাহ সময় উপস্থিত। তুমি আমার বিশ্বস্ত লোকের সহিত গমন কর। তোমার বাহাকে ইচ্ছা হইবে সে যদি কুলশীলে আমাদের অপেক্ষা নীচ না হয় তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব। পতিপরায়ণা সাবিত্রী এইরূপে আপন স্বামী মনোনীত করেন। অনেকে মনে করিতে পারেন এরূপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না কিন্তু সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বৎসে এইটাই প্রকৃত আগমোক্ত বিধি এবং এইরূপে বচনতর কন্যা মনোমত পতিলাভ করিয়াছেন। বোধ হয় এরূপ স্বামী মনোনীত করিবার প্রথা পরিণামে স্বয়ম্বর রূপে পরিণত হয়। পুরুষেও কন্যা মনোনীত করিবার জন্য বহির্গত হইয়া ইচ্ছামুসারে মনোমত কন্যা বিবাহ করিতেন। দশকুমারচরিতে তাহার এক সুন্দর উদাহরণ আছে। ৪র্থ স্বয়ম্বর প্রথা। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী বোধ হয় আর কোত্রাপি প্রচলিত ছিল না। কন্যার বিবাহ সময় উপস্থিত হইলে সমান কুলশীল ব্যক্তিমাত্রকেই আহ্বান করা

হইত। সকলে উপস্থিত হইলে মহা-
সমারোহে একসভা হইত। কল্পা শিবি
কারোহণ পূর্বক সভামধ্যে প্রবেশ করি-
তেন। একজন প্রগল্ভা স্ত্রীলোক একে
প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে শিবিকা লইয়া
তাহাদের গুণাগুণ কীর্তন করিত এবং
শেষে দ্বিজ্ঞাসা করিত “কেমন. এবব
তোমার মনোনীত হয়!” মনোনীত
হইলে কল্পা আপন গলাদেশ হইতে মালা
লইয়া ববের গলায় অর্পণ করিত। অনেক
স্থলে স্বয়ংবরের পূর্বেই সকলের গুণা-
গুণ কল্পাকে শুনান থাকিত। বড়
স্বয়ংবরস্থলে যে কোন পরাক্রান্ত ব্যক্তি
বিবাহে নিবাশ্বাস হইয়া কোনরূপ উৎ-
পাত করিবেন তাহার যো ছিল না।
কারণ স্বর্গপতি ইন্দ্রের মহিষী স্বয়ংবরের
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিন্তু এরূপ হইলেও
বহুলোকসমাগম প্রযুক্ত নানা বিশৃঙ্খলা
ঘটিত এজন্য পূর্ণপূর্বক বিবাহ প্রথার
স্থিতি হয়। উহাতে যে কোন ব্যক্তি
কোন একটি নির্দিষ্ট দুরূহ কাৰ্য্য করিবে
সেই বিবাহ করিবে এই পণ থাকিত।
মধ্যসময়ে ইয়ুরোপেও নাইটেবা লেডি
দিগেব সমষ্টির জন্য নানাবিধ দুরূহ কাৰ্য্য
সাধন করিতেন। এইরূপ নানাবিধ
বিবাহ থাকিতেও মুনি ঋষিরা ও রাজাবা
উচ্চামত নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া
কন্যা মনোনীত করিতেন। মহর্ষি অগস্ত্যা
একটি দুই বৎসববয়স্ক কল্পাকে লইয়া
একজন রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া
কহিলেন তুমি ইহাব লালনপালন ও

শিক্ষাকার্য্য সুন্দররূপে নির্বাহ করিবে।
পরে সে কল্পা বিবাহযোগ্যবয়স্ক হইলে
স্বয়ং আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন।
অতএব এক্ষণকার অনেকে যে বলেন বর
কল্পা পরস্পর মনোনীত করিবার প্রথা
ছিল না সে কেবল তাঁহাদের ভ্রমমাত্র।

[ডাইভোস বা পরিত্যাগ।]

স্ত্রী যদি গুরুচারিণী ও পতিব্রতা হন,
তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে পতিত হই-
তে হইবে। ব্যাস বলিয়াছেন, “অতুষ্ঠাং
পতিতাং ভাৰ্য্যাং ত্যক্তা পততি ধৰ্ম্মতঃ”
রঘুনন্দনও গুরুচারিণী স্ত্রী ত্যাগের প্রায়-
শ্চিত্ত ব্যবস্থা কবিয়া দিয়াছেন। পতিত
হওয়ার অর্থ আমবা এক্ষণে ভাল বুঝিতে
পারি না, কিন্তু পূৰ্বকালে পতিত ব্যক্তির
সহিত কেহ আলাপ কবিত না, কেহ
উহাব মুখ দেখিত না, উহাকে এক প্র-
কার জীবন্ত তের ন্যায় থাকিত হইত।
স্ত্রী ত্যাগ কবিলে তাহাব ঐরূপ ভয়ানক
অবস্থা হইত। কিন্তু ঋষিরা নানা কা-
বণে স্ত্রী ত্যাগেব বিশেষ নিয়ম করিয়া
দিয়াছেন, যথা বাজবল্ল্য বলিয়াছেন,
সুবাপী ব্যাধিতা ধৃষ্টা বক্ষ্যার্থপ্রাপ্তিষদা
স্ত্রীপ্রহৃষ্টাধিবেত্তব্য পুরুষদেবিনী তথা ॥

মদ্যপায়ী ব্যাধিতা ধৃষ্টা বক্ষ্যামিত-
ব্যাকারিণী অপ্ৰিয়বাদিনী কন্যাশ্রম-
বিনী পুরুষদেবিনী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া
অন্য বিবাহ করিতে পারিবে। মন্ত প্রভৃ-
তিরও ঐরূপ বচন আছে। এই সকল
কারণ বশতঃ বাহাদিগকে ত্যাগ করিবে;

তাহাদিগকে আজীবন প্রতিপালন করিতে হইবে; যেহেতুক যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, “অধিবিদ্যাস্ত ভর্তব্যং ব্রহ্মদেনো-নাথা ভবেৎ” তাহাদিগকে ভরণ না করিলে বড় দোষ হয়। মিতাক্ষরা বলিয়াছেন, ঐ সকল স্ত্রী স্বামীর সহিত সহবাস করিতে পারিবে না এবং গৃহ-কর্ত্তী হইতে পারিবেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রকারদিগেব বিলক্ষণ বোধ ছিল, স্ত্রীলোক নিঃসহায়, এই জনা তাঁহারা বলিয়াছেন, বাভিচারিণীকেও বাটী হইতে বহিষ্কৃত কবিতা না দিয়া, উহাকে নানা-বিধ প্রকারে কষ্ট দিয়া বাহ্যতে উহার চরিত্র সংশোধন হয়, তাহার চেষ্টা করিবে।

হুতাধিকারিণী মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপ-

জীবিনীং।

পরিভূতামধঃ শয্যাং বাসয়েদ্বাভিচারিণীং॥

এটিও যাজ্ঞবল্ক্যের বচন। এই পর্য্যন্ত পুরুষের পক্ষে। স্ত্রী কিন্তু পতিত কুষ্ঠ রোগী স্বামীকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কেবল পতিত হইলে যত দিন তাহার শুদ্ধি না হইবে, ততদিন উহার সহবাস করিবে না “আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যাহি মহাপাতকদূষিতঃ।” এ সকল সত্য জ্ঞেতা স্বাপর যুগের ব্যবস্থা। কলিযুগে স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তরকে বিবাহ করিতে পারিবে।

নষ্টে যুতে প্রব্রজিতে স্ত্রীবেচ পতিভে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধী-

য়তে।

অতএব কলিযুগে পুরুষ যেমন কারণ

বশতঃ স্ত্রীত্যাগ করিয়া বিবাহ কবিত্তে পারেন, স্ত্রীও তেমনি কারণবশতঃ স্বামীকে ছাড়িয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন।

[স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার।]

“পিতা মাতা ভ্রাতা পতি দেবর প্রভৃতি আত্মীয় লোকে যদি ইহলোকে সম্মান ইচ্ছা করেন, তবে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করিবেন। এবং তাহাদিগের বেশ ভূষা কবাইয়া দিবেন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করা হয় সেখানেই দেবতারা সন্তুষ্ট হন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগেব অমর্যাদা করা হয়, তথায় সকল কর্ম্মই নিফল। যে কুলে স্ত্রীরা শোক কবে সে কুল শীঘ্র নাশ পায়। যেখানে উহার সন্তুষ্ট থাকে, সেখানে সর্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব ভূতীইচ্ছুক লোকেরা উৎসবে ও সংকার্য্যে ভূষণ আচ্ছাদন ও অশন দ্বারা উহাদিগের “পূজা” করিবে। যে কুলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট সে কুলে কল্যাণ হয়।” ইত্যাদি। মনুর এই সকল বচন পাঠ করিলে, বোধ হয় পূর্বকালে স্ত্রীলোকের প্রতি সকলে সম্মানবাহার করিতেন তাহাদিগকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন। মনু আরও বলিয়াছেন। মাতা পিতার অপেক্ষা সহস্র গুণে পূজনীয়া, ভার্য্যা আপনার দেহ। অতএব ইহাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ কোন রূপেই বিধেয় নহে। এদেশীয় কুলীনদিগের মধ্যে কন্যা হইলে, তাঁহারা

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাজপুতানার রাজ-পুত্রদিগের মধ্যে বালিকাহত্যা প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মনু বলিয়াছেন, “কন্যাপোষঃ পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।” আর এক জন বলিয়াছেন, কন্যা পুত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই বরং কন্যা সংপাত্রে দান করিলে পরলোকে মঙ্গল হয়। জীলোকের শারীরিক কষ্ট দেওয়া মহাপাপ বলিয়া আজিও গণ্য হইয়া থাকে। গুরুত্ব পূর্ণে আছে “অবধ্যাক্ত স্ত্রিয়ং প্রোহু স্ত্রীযাক্ জাতিগতেষপি” মনু বলিয়াছেন, পবণস্বীকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবে। আপত্ত্ব বলিয়াছেন, উহাদিগকে মাতৃবৎ দেখিবে। জীলোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করার প্রথা ছিল, তাহার এক প্রকার উল্লেখ করা হইল।

উপরি লিখিত প্রবন্ধে বোধ হইবে যে, সভ্যজাতীয় লোকেরা জীলোকের প্রতি যেসকল সদ্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদের পূর্ব পিতামহগণও তাহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তবে যে নানা স্থানে দেখা যায় “জীলোক অতি হেয় পদার্থ উহার সঙ্গ সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। রুদয়ে ক্ষুরধারাভা মুখে মধুবভাষিণী জীর অস্ত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায় না অতএব তাহাকে বিশ্বাস

করিবে না।” (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ) এ সকল সংসারবিরাগী বোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি; তাহাদের মন অন্য দিকে আসক্ত, জীলোক পাছে তাহাদিগকে সংসারে বন্ধ করে, এই ভয়ে তাহারা বনে বাস করিতেন, অথবা তাহাদিগের কথা শুনিয়া পূর্বকালের মত পুরুষেরা জীলোকদিগকে ঘৃণা করিতেন অথবা তাহাদিগের প্রতি অসদ্যবহার করিতেন এরূপ বলা অন্যায়। বরং নিম্নলিখিত যাজ্ঞবল্ক্যবচন দৃষ্টে বোধ হইবে যে, প্রাচীন ঋষিরা জীলোকদিগকে অতি পবিত্র পদার্থ মনে করিতেন। যাহারা সতী তাহাদের ত কথাই নাই, “যেখানে যেখানে তাহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেই স্থানে সেইখানেই পৃথিবী মনে করেন যে আমার আর ভার নাই আমি পবিত্র-কারিণী হইলাম।” (কাশীখণ্ড) কিন্তু সামান্যতঃ পাপচারিণী ভিন্ন অপর জীলোকও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। “সোম তাহাদিগকে শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব তাহাদিগকে মধুরবাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে পবিত্র করিয়া দিলেন। অতএব যোষিদগণ সর্বপ্রকারে পবিত্র হইল।”

ক্রমশঃ



ভারতমহিলা।

[স্রীলোকের কর্তব্য কর্ম।]

স্রীলোকের পক্ষে কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্তব্য। স্বামী কাণা হউন গোঁড়া হউন অকর্মণ্য হউন দুষ্ট হউন তথাপি স্রীলোকের তিনিই গুরু, পূজা ও ইষ্ট দেবতা তাঁহার চরণ সেবা করিলেই স্রীলোকের পরকালে পরম গতি লাভ হইবে। স্বামীর পর শুশ্রূষার পিতামাতার সেবা দেবরাদির প্রতিপালন তাঁহার কর্তব্য। তিনি সমস্ত গৃহকার্যে দক্ষ হইবেন। বায়ে সর্কদাই কুণ্ঠিত হইবেন, স্বামী পুত্রের বিরহ কখনই কামনা করিবেন না—আপন ইচ্ছাতে কোন কার্য করা তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়। তাঁহার ব্রত ধর্ম উপাসনা উপবাস কিছুই নাই। শিল্পাদি কার্যে দক্ষ হউন, সে তাঁহার কর্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের মধ্যে। কিন্তু তাহা দ্বারা যে ধনসঞ্চয় হইবে তাহাতে তাঁহার নিজের কোন অধিকার নাই। সে ধন তাঁহার স্বামীর। পূর্বেই বলা হইয়াছে গৃহকার্যে দক্ষ হওয়া তাঁহার প্রধান কর্তব্য। সে সকল গৃহ কর্ম কি বহি পুরাণে তাহার এক সংগ্রহ পাওয়া যায় যথা

“স গৃহা প্রাতঃস্থায় নমস্কৃত্য পতিং

স্মরং।

প্রাজ্ঞেন মণ্ডনং লল্যং গোমরেন

জলেনবা ॥

গৃহকৃত্যং চ কৃষ্ণাচ স্নাত্যগস্তৃণং সতী।
স্মরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদগৃহদেবতাং ॥
গৃহকৃত্যং স্ননির্বৃত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং

সতী।

অতিপীন্ পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভুক্তে স্বখং
সতী ॥

এইস্থলে সংক্ষেপে স্রীলোকদিগের অবশ্য কর্তব্য কর্ম উল্লেখ করা হইল। ইহা ভিন্ন অনেক কর্ম আছে তাহা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য নহে অথচ করিলে তাঁহাদের প্রশংসা হয়। তাহার উল্লেখ তৃতীয় অধ্যায়ে করিব। স্রীলোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করা হইয়াছিল জানিতে গেলে তাঁহাদের কর্তব্য কি কি জানা নিতান্ত আবশ্যিক কাবণ তাঁহারা ঐ গুলি যদি স্মরণরূপে সমাধা করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের চরিত্র উত্তম বলিতে হইবে। তাহাব পর অমায়িকতা সরলতা প্রভৃতি যে সকল গুণে জগতে মাননীয় হওয়া যায় সেই সকল গুণ থাকিলেই তাহাকে অতি উন্নতচরিত্র বলিতে হইবে। অতএব এক্ষণে সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনায় সেই সকল কর্তব্য বিস্তার বর্ণনা না করিয়া সংক্ষেপে করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

[স্রীর ধনাধিকার।]

স্রীলোকের সামাজিক অবস্থা যে তত ভাল ছিল না তাহার এক প্রধান প্রমাণ এই যে স্রীলোকের ধনাধিকার নাই।

নিজে উপার্জন করিলে স্বামীর হইবে। স্বামী যদি দেন, ২০০০ টাকার অধিক দিতে পারিবেন না। তবে পিতামাতা, কণ্ঠার কষ্ট না হয় বলিয়া যে ধন দিবেন তাহা তাঁহার আপনায়। পিতামাতা বা স্বামীর ধনে তাঁহার নিগূঢ় স্বত্ব নাই অর্থাৎ দানবিক্রয় ক্ষমতা নাই। কেবল যাবজ্জীবন ভোগ মাত্র। সে ভোগ আবার স্ত্রী বস্ত্র পরিধানাদি দ্বাৰা নহে। সে ধন কেবল স্বামীর পারলৌকিক কার্য্য ও অন্ত্যস্ত্র সংকার্য্যে নিয়োগ কবিবার জন্য। পিতার ধন আবার যদি দৌড়িত্ত পাঁকে তবেই পাঠিবেন বন্ধা বা বিধবা হইলে সে ধনে তাঁহার অধিকার নাই। এইরূপে জীলোক ধনাধিকার ও ধন উপার্জনে বঞ্চিত। তথাপি তাঁহার পিতৃদত্ত যে নিজ ধন তাহাতে স্বামীরও অধিকার নাই। সে ধন স্বামী লইলে তাঁহাকে স্ত্রী দিতে হইবে। না দিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে। আর সচ্চরিত্রা বিধবার প্রতি যদি কেহ অত্যাচার করে রাজা তাহার শাস্তি দিবেন। জীলোকের ধনাধিকার নাই, কারণ তাহার স্বাধীনতা নাই।

[বিধবার কর্তব্য।]

মহুর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর জীলোকে ব্রহ্মচর্যা অবলম্বন করিবে। স্বামীর ধন পাইলে স্বামীর পারলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। স্বামিকূলে বাস করিবে। স্বামীর বংশে কেহ থাকাতে পিতৃবংশীর দিগকে ধনদান করিবে।

না। স্বামীর বংশ নির্মূল হইলে পিতৃগৃহ আশ্রয় করিবে। সহমরণ মহুর অমুমোদিত নহে কিন্তু মহাভারতের মধ্যে সহমরণ প্রথার বহুল প্রচার দেখা যায়। পাণ্ডু মহিষী মাতী সহগমন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, মৃত বীরের বৃন্দের মহিষীরা অনেক স্বামীর অমুমোদিত গমন করেন। বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস এমন কি মহু ভিন্ন প্রায় সকল ঋষিরাই সহমরণের অমুমোদন করিয়াছেন এবং অমুমোদিতগণের বিস্তার প্রশংসা করিয়াছেন। একজন বলিয়াছেন “যে স্ত্রী সহমৃত্যু হয় সে স্বামীর সহস্র পাপ সৰ্ব্বোপকার স্বামীর সহিত সার্বিক জিকোটা বৎসর স্বর্গ বাস করিবে।” পরাশর(কেহ কেহ বলেন অঙ্গিরা) আর একজন বলিয়াছেন যে, সর্পগ্রাহী ব্যাধ যেমন বলপূর্বক সর্পকে গর্ত হইতে উত্তোলন করে, সেইরূপ সহমৃত্যু নারী আপন স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গে আনন্দ প্রমোদ করে। (দক্ষ।) কিন্তু সহমরণ জীলোকদিগের অবশ্য কর্তব্য নহে। করিলে পুণ্য ও প্রশংসা হয় মাত্র। আমরা তৃতীয় অধ্যায়েও একবার উল্লেখ করিব। সহমরণ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। উহা ভারতবর্ষীয় জীলোকদিগের পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। সত্য বটে সহমরণ পরিণামে অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছিল, সত্য বটে ছুই লোকে ষড়যন্ত্র করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেককে অলজিতায় নিঃক্ষপ

করিত। কিন্তু এই প্রথা যাহাদের দৃষ্টান্তে প্রথম প্রচলিত হয় তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বামীর জন্য, পরলোকেও বাহাতে স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ না হয় সেই জন্ত, আপনার জীবন স্বামীর চিত্তার সমর্পণ করিতেন। কলিযুগে বিধবারা বিবাহ করিতে পারিবেন ব্যবস্থা আছে।

[ছুট্ট চারিআদিগের দণ্ড,]

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে অগ্নিযবাদিনী ক্রীকে স্বামী সদাঃ পরিত্যাগ কবিত্তে পারিতেন। ক্রী যদি গৃহকার্য্যে অবহেলা করিত বা মুক্ত হস্তে ব্যয় করিত স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। সূরা-পান্বিনী ক্রী পরিত্যাগার্য্য। এই সকল ক্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দারাস্তর পরিগ্রহ করার ব্যবস্থাছিল কিন্তু তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে হইত। ক্রীলোক যদি পিতৃধনগর্ভে গর্ভিতা হইয়া স্বামীর অবহেলা করে এবং পুরুষান্তরকে আশ্রয় করে তবে রাজা তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবেন এবং তাদৃশ পারদারিক পুরুষকে গোড়াইয়া ফেলিবেন। ক্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তবে সে পিতৃধনে অধিকারিণী হইবে না। ব্যভিচারিণী দিগের ইহকালও নাই পর কালও নাই তাহা বা আরজ পুত্র উৎপাদন করিয়া উভয়কুল অপবিত্র করে।

ক্রীষু ছুট্টাস্ত্র বাক্যেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ ।
সংকরো নরকায়ৈব কুলপ্লানং কুলম্যচ ॥

পতন্তি পিতরো হোষাং লুপ্ত শিশো-

দকক্রিয়াঃ । ভগবদগীতা

ক্রীলোক যদি সমাজনিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করে তাহা হইলে সে ইহকালে পুরুষের ভ্রায় দণ্ড পায়। আর পরোলোকে পুরুষাপেক্ষা দ্বাবিংশতি গুণ অধিক যন্ত্রণা ভোগকরে। কুন্তিবাস নরকবর্ণনার অবসানে বলিয়াছেন “এহতে বাইশ গুণ নারীর যন্ত্রণা” যমু ক্রীলোক দিগের অনেক স্থানে অন্ন প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন কিন্তু ছুট্ট একস্থলে অধিক ব্যবস্থাও দিয়াছেন। যাহারা ক্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে এবং উহাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া অধর্ম্ম পথে আনয়ন করিবার জন্ত চেষ্টা করে তাহাদিগের “উত্তম সাহস” দণ্ড হয়। প্রাচীন কালে যত শাস্তি ছিল উত্তম সাহস দণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক।

তৃতীয় অধ্যায় ।

[মন্তব্য কথা ।]

পূর্ব্ব প্রস্তাবে ক্রীলোকের কর্তব্য কর্ম্ম সকল এক প্রকার সংক্ষেপতঃ উক্ত হইয়াছে এক্ষণে বিস্তাররূপে ঐগুলির নির্দেশ করা আবশ্যিক। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চরিত্রের বিশুদ্ধিই বিশেষ সমাদরণীয় ছিল। কার্য্যকারিণী প্রবৃত্তি অর্থাৎ উন্নতিবিষয়ে তাঁহাদের তাদৃশ আস্থা ছিলনা। সর্ব্বপ্রকারে শাস্তিস্থ অমুভব করা এবং প্রাণিসাত্ত্বের

হুঃখবিমোচন করাই তাঁহাদের মতে মনুষ্যের প্রধান কর্তব্য। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে কেন; প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্র মাত্রেই এইদোষ। পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রেও স্বদেশোন্নতি, সমাজোন্নতি প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণেরা যে আপনাদিগের মধ্যে নির্দোষ নির্মল চরিত্রকেই অধিক আদর করিতেন হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিলে তাহার আর কোন সন্দেহ থাকেনা। তাঁহারা যত নিয়ম করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই কিরূপে পাপ স্পর্শ নাহয় তাহারই জন্ত। এখন যেমন অশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই মনে স্বদেশের বা মনুষ্য সমাজের উন্নতি করিব বলিয়া আকাঙ্ক্ষা হয় সেরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে অতিবিরল, তাঁহারা জীলোক দিগের যে সকল কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহাতেও এই দোষ। জীলোক সর্ব প্রকারে পাপশূন্য হইবে, স্বামীপুত্রের অধীন হইবে, ইত্যাদি শত ২ নিয়ম কেবল তাঁহাদের চরিত্রবিশুদ্ধিকামনায় মাত্র। এই সকল নিয়ম একরূপ কঠিন যে তাহা প্রতিপালন করা নিতান্ত দুঃসহ। কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টে বোধ হয় যাহারা এই সকল কঠিন নিয়মের অধিকাংশ পালন করিয়া উঠিতেন তাঁহাদের গুরুতর দোষ সন্দেহ প্রশংসা হইত। তাহার এক প্রমাণ অহল্যা। তিনি চিরদিন স্বামিভক্তা এবং গৃহকার্যে সম্পূর্ণ মনোযোগবতী ছিলেন। তাহাব পর ইচ্ছাপূর্বক ব্যক্তি

চার পক্ষে নিপতিত হন।* কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এক্ষণে প্রাণঃস্বরণীয়া দিগের মধ্যে প্রথম বলিয়া পবিগণিত হইয়াছেন। আবার দেখা যায় অনেকে এই দুঃসহ নিয়ম সকল যথাযোগ্য রূপে প্রতিপালন করিয়াও স্বীয় বুদ্ধিমত্তাদি গুণে আরো অনেক সংকার্য্য করিয়াছেন। জৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের সেবা ও সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়াও পাণ্ডব দিগকে সর্বদাই নীতি শাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। বাস্তবিকও পাণ্ডবদিগেব বনবাস সময়ে কৃষ্ণার ত্রায় বিচক্ষণ মন্ত্রী আর কেহই ছিল না।

[সাক্ষীদিগের শ্রেণীবিভাগ।]

মুনিরা যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন যাহারা সেই সকল নিয়ম স্মরণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহাবাই আমাদিগের প্রথম চিত্র। যাহারা কোনরূপে প্রলোভনে পতিত না হইয়া যশস্বিনী হইয়াছেন তাঁহাদের চরিত্রই আমবা প্রথম পর্যালোচনা করিব। তাহার পরে যাহারা মানাবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের জীবনাবলী বর্ণনা করিব। হিন্দুদিগের মধ্যে এই জীবনভাবের উৎ-

*কৃষ্ণিবাস বলিয়াছেন অহল্যা নির্দোষী; সমস্ত দোষ ইচ্ছের। কিন্তু বাস্তবিক তাহা বলেন না। যদিও বাস্তবিক কবিতা দ্বারা করা যায় কিন্তু টীকাকারেরা অহল্যাকেও দোষী করিয়া দিয়াছেন।

কষ্ট নিদর্শন। পাণ্ডববধু দ্রৌপদী রাম-গেহিনী সীতা এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান রূপে গণনীয়। সাবিত্রী শকুন্তলা প্রভৃতি মহিলারা চরিত্র রক্ষার জন্য নানাবিধ কষ্ট পাইয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের প্রলোভন সামগ্রী অল্পই ছিল। তাঁহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর তাঁহারা কেহই নহেন। গ্লাড-ষ্টোন ইংলণ্ডের একজন সুদক্ষ মন্ত্রী হইলেও উইলিয়ম পিট অপেক্ষা অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোক: কারণ পিট অনেক প্রলোভনেও ভুলেন নাই। গ্লাডষ্টোনের সময় সে সকল প্রলোভন একেবারেই নাই।

স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্তব্য কর্ম পতিসেবা। পতি তাঁহাদিগের সর্বস্ব তাঁহাদিগের দেবতা তাঁহার সেবাই তাঁহাদিগের প্রধান কর্তব্য। তাঁহাদিগের দ্বিতীয় কর্তব্য গৃহকর্ম। গৃহস্থের যত কার্য আছে তাহার সমুদয়েরই ভার স্ত্রী লোকের হস্তে। সন্তানপালন স্ত্রীলোকের কর্তব্য কর্মের মধ্যে কোন স্থলেই উল্লেখ নাই কিন্তু মল্ল বলিয়াছেন, উৎপাদনমপত্যস্ত জাতস্য পরিপালনং। প্রত্যং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী

নিবন্ধনং ॥

অতএব পুত্রের পালনভারও স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পিত ছিল। ইহার পর কবিদিগের সময়ে স্ত্রীলোকের আরো একটা কর্তব্যকর্ম হইয়া উঠিয়াছিল।

কজ্রিয়াদি সমস্ত ভদ্র পরিবারের মহি-লারাই উহা শিক্ষা করিতেন। উহার নাম কলা শিক্ষা। ঋষিদিগের সময়ে লোক সকল সরল ছিল। বাবুগিরি উহাদের তত মনোমত ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে স্ত্রীলোকের যে নৃত্য গীতাদি শিখিতে হইত এরূপ কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু কালিদাসাদির সময়ে যখন আর্ঘ্যগণ পূর্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাসসুখে মগ্ন হইয়াছেন তখন নৃত্যগীত ভদ্র মহিলাদিগের নিত্যকর্ম মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তখনই কালিদাস লিখিলেন,

গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয়শিষ্যা

ললিতে কলাবিধৌ।

করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা স্বাং বদ কিং
ন মে হৃতং ॥ রঘুঃ

কিন্তু মহর্ষি ব্যাস স্বকৃত সংহিতায় লিখিয়াছেন।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।

দানীবাদিষ্টকার্যোন্মু ভাৰ্য্যাত্তৰুঃসদা-

তবেৎ ॥

এই দুইটা বচনের মধ্যে প্রথমটীতে প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ এই বিশেষণটী অধিক আছে। ইহা দ্বারা বোধ হইল ঋষিদিগের সময়ে নৃত্যগীত শিক্ষা চলিত ছিল না। আবার দ্বিতীয়টীতে “ছায়ে বানুগতা” এই বিশেষণটী আছে। তাহাতে বোধ হইতেছে প্রাচীন ঋষি-দিগের সময়ে নারীগণ স্বামীর সহিত সর্বত্র গমনাগমন করিতেন।

একশ্রেণী স্থিরীকৃত হইল পতিসেবা গৃহ কার্য, এবং ঋষিদিগের পর, নৃত্যগীতা-দিও, জীলোকের কর্তব্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। সংক্ষেপতঃ এই স্থির হইল কিন্তু বিশেষ পর্যালোচনা করিতে গেলে আবার সংহিতাকর্তাদিগের শরণ লভিতে হইবে। অষ্টাদশ খনি সংহিতার মধ্যে ৮৯ খনি অতি স্বল্পায়তন তাহাতে জী চরিত্রের কোন উল্লেখ নাই। আর কয়েকখানির মধ্যে, মনু যেরূপ বৃহৎ গ্রন্থ উহাতে জীধর্ম্য ভাদৃশ বিস্তারক্রমে কথিত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য কয়েকটি নাত্র কবিতা গৃহস্থ ধর্মের মধ্যে বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। দক্ষ ব্যাস ও বিষ্ণু বিস্তাররূপে জীধর্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। এই তিন খানির মধ্যে আবার বিষ্ণুই সর্বাধিক প্রাঞ্জল। বিষ্ণুর বচনে অর্থ ঘটিত কোনরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দায়ভাগকার জীমূতবাহন বিষ্ণু যত্র অবলম্বন করিয়াই অতি দুর্লভ অপূত্র-ধনাধিকার অধ্যায় নির্ণয় করিয়াছেন। আশ্বমেধেরও সেই বিষ্ণুবচনই প্রধান আশ্রয়। জীধর্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুর বচন যথা

১ম। জীলোক স্বামীর সমান ব্রত-চারিণী হইবেন। বিষ্ণুযন্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার নন্দ পণ্ডিত লিখিয়াছেন স্বামী যে সকল বিষয়ে সংকল্প করিবেন জী লোকেরও সেইই কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। এবং স্বমত সংস্থাপন জন্য কাশীখণ্ড হইতে “যত্র যত্র কুর্চির্ভুক্তত্র

শ্রেয়বতী সদা” এই বচনটা উদ্ধার করিয়াছেন। গৌতম বলিয়াছেন ধর্ম্য কর্মে জী স্বাধীন নহেন। বশিষ্ঠও এই কথা বলিয়াছেন এবং এতৎসমর্থক আরো এক বচন আছে যথা জীতিঃ ভর্তৃ-বচঃ কার্য্যমেষ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥

২য়। স্বর্গ স্বর্গের দেবতাতিথিদিগের সেবা। টীকাকার লিখিয়াছেন পূর্বোক্ত গুরুজনের পাদবন্দনাদি দ্বারা সন্তোষ সম্পাদনই সেবা বা পূজা শব্দের অর্থ। দেবতা শব্দে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা নহেন কারণ জীলোক ইচ্ছামত দেবোপাসনা করিতে পারিলে ১ম বচনটির সহিত বিরোধ হয় অতএব উহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন দেবতা “সৌভাগ্য দাত্রী গোষ্ঠাদিঃ।” সৌভাগ্যই জীলোকের গৌরবের বিষয়। যেমন বিদ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা; বলে ক্ষত্রিয়ের। সেইরূপ সৌভাগ্যে নারীর শ্রেষ্ঠতা হয়। যাহার সৌভাগ্য নাই সে জীর মুখদর্শন করিতে নাই। সৌভাগ্য শব্দের অর্থ স্বামীর ভালবাসা। স্বামী যে জীকে ভাল বাসেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৩য়। অতিথি সেবা। মনু গৃহস্থের যে সকল প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে অতিথি সেবা একটা। উহার নাম ন্যজ্ঞ, উহাতে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। কিন্তু গৃহস্থ ত নিজের অতিথি সেবা করিতে পারেন না। উহা তাঁহার গৃহিণীর উপর ভার। গৃহিণী যদি সুল্লর রূপে অতিথিসেবা করিতে

পারিলেন সে তাঁহার অন্ন প্রাশংসার বিষয় নহে। পূর্বকালে গৃহস্থ মহিলারা প্রাণপণে অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। কুস্তী বাল্যকালে অতিথিদিগের সেবা করিতে অত্যন্ত ভাল বসিতেন। এক দিন দুর্ভাসা ঋষি আসিয়া তাঁহার নিকট উত্তপ্ত পায়স ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুস্তী নিতান্ত অতিথিবৎসলা; তিনি সেই উত্তপ্ত পায়সপাত্র হস্তে করিয়া ঋষিকে থাওয়াইয়া দিলেন। তাঁহার হস্ত দৃষ্ট হইয়া গেল তথাপি তিনি কোনরূপে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। দুর্ভাসা তাঁহাকে বহুতর প্রাশংসা করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

৪র্থ। গৃহসামগ্রীর সুসংস্কার। কেশব বৈজয়ন্তীকার এই সূত্রের পোষক শংখ লিখিত একটি সুদীর্ঘ বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু হৃৎথের বিষয় এই যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত শংখলিখিত সংহিতার মধ্যে সে বচনটি পাওয়া যায় না। বচনের অর্থ এই।

প্রাতঃকালে পাকপাত্রের সংস্কার। গৃহস্থার পরিকার করা। অগ্নিচর্য্যার আয়োজন। গ্রাম্যাদি দেবতার পূজোপহারোদ্যোগ। স্বামী পূর্বে গাত্রোথান করিয়া শয়ন সামগ্রীর যত্নপূর্ব্বক রক্ষা। পাকক্রিয়াকোশল, পরিবারবর্গকে পরিতোষ করিয়া আহার করান। ইত্যাদি। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা বহুপুরাণের একটি বচনোদ্ধার করিয়াছি তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ।

৫ম ৬ষ্ঠ। অমুক্ত হস্ততা ও সুত্তপ্ততা। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে জীলোকের ধনাধিকার 'নাই। কিন্তু স্বামীর সমস্ত ধনই তাঁহার। স্বামি সঞ্চিত ধন তিনিই রক্ষা করিবেন। আর বায়ের তিনিই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অনভিমতে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। সকল ঋষিই বলিয়াছেন জীলোকে ব্যয়কুষ্ঠ হইবেন। “বায়ো চামুক্তহস্তয়া” “বায়বিরজ্জিতা” “বায়পরাক্ষুণী” সকল সংহিতা মধোই পাওয়া যায়। যদি অধিক ব্যয় করেন স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেন। লক্ষ্মী বলিয়াছেন আমি ব্যয় কুষ্ঠিতা জীলোকের গৃহে বাস করি। সুতরাং ব্যয়কুষ্ঠতা জীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণিত হইবে। বাস্তবিকও যাহারা অন্ন আয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদের পক্ষে, শুদ্ধ তাঁহাদিগের পক্ষেই কেন গৃহস্থ মাত্রেরই পক্ষে জীলোকের ব্যয়কুষ্ঠতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৭ম। “মূল ক্রিয়াস্বনভিকৃতিঃ। এই বচনটির প্রকৃত অর্থ অবগত হওয়া দুর্ঘট। পণ্ডিতবর নন্দকুমার বলিয়াছেন মূল ক্রিয়ার অর্থ বশীকরণাদি কার্য্য বাহাকে আমরা এক্ষণে ডাকিনীর কৰ্ম্ম বলিয়া থাকি। কিন্তু বিষ্ণুর সময়ে কি লোকে ডাকিনী যোগিনী বিশ্বাস করিত? ডাকিনী যোগিনী ত তত্ত্ব ও পুরাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কি উহা দ্বারা

অর্থক্স বেদোক্ত মারণাদি কার্য্য বুঝাইবে? তাহা হইতে পারে না, জীলোকের ত বেদে অধিকার ছিল না। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পান, অটন, দিবাস্প্রজী-গণের কর্তব্য নহে করিলে দোষ হয়। বিষ্ণুর বচনে হয় ত তাহাই বুঝাইবে।

৮ম। মঙ্গলাচারতৎপরতা। মঙ্গল্য জ্রব্য হরিদ্রা কুঙ্কুমাদি ব্যবহার করিবে। এবং বুদ্ধ জীলোকদিগের নিকট যেসকল আচার শিক্ষা করিবে তাহার পালনে সৰ্ব্বদা যত্নবতী হইবে। এই আচার গুলি শংখ লিখিত বচনে উল্লিখিত আছে। যথা না বলিয়া কাহারও বাটী যাইবে না। কোথাও যাইতে হইলে উত্তরীয় ছাড়িয়া যাইবে না, জ্রুতপদে কোথাও গমন করিবে না, পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবে না। বণিক্, প্রব্রজিত, বুদ্ধ ও বৈদ্যকে নাস্তি দেখাইবে না। বিস্তৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনাবৃত শরীরে কখন থাকিবে না ইত্যাদি।

৯ম। স্বামী বিদেশে গেলে শরীর-সংস্কার ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। এস্থলে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন। প্রোষিত ভর্তৃকা নারী শরীর সংস্কার বিবাহ ও উৎসবদর্শন হাস্য ও পরগৃহগমন পরিত্যাগ করিবে। মনু বলিয়াছেন:—

যদি স্বামী কোন রূপ বন্দোবস্ত না করিয়া বিদেশে গমন করেন। তবে জীলোক অনিন্দনীয় শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবন নির্বাহ করিবে। এই সূত্রের

ব্যাখ্যায় টীকাকার শংখলিখিতের একটী সুদীর্ঘবচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধ বহুল্যভয়ে সেটীর অমূবাদ করি-লাম না। পরগৃহ শব্দে টীকাকার লিখিয়াছেন, পিতা মাতা ভ্রাতা স্বশু-রাদির গৃহ ভিন্ন অস্ত গৃহ বুঝার। স্ততরাং স্বামী স্বদেশে থাকিলে জীলোকেরা য-থা ইচ্ছা গমন করিতে পারিত তাহার এক প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রোষিত ভর্তৃকাদিগের কি কর্তব্যকর্ম্ম তাহা যিনি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত পাঠ করি-য়াছেন তিনিই সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছেন। পতিপ্রাণা যক্ষপত্নী সংবৎ-সর পর্য্যন্ত একবেণী ধরা হইয়া যে কষ্টে সময় যাপন করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে সকলেরই মনে কল্পণ রসের আবির্ভাব হয়। যখন যক্ষ রাম গিরিতে মেঘকে বলিতেছেন”

“আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলি-
ব্যাকুলাবা

মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগমাং
নিগন্তী।

পৃচ্ছন্তী বা মধুবচনাং সারিকাং পঞ্জ-
রস্থাং

কচ্চিভূতুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তন্ত
প্রিয়েতি।”

তখন বোধ হয় যেন আমরা গবাক্ষ পথে বলি ব্যাকুলা দেহলী-দন্ত-পুষ্প-গগনা-তৎপর আধিক্ষামা সেই যক্ষ পত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার শরীর ক্লেশ তিনি বিস্তৃত শয্যার এক

পার্শ্বে শয়ানা আছেন বোধ হইতেছে যেন প্রাচীমূলে এক খণ্ড চন্দ্রকলা বহি-
রাছে। উহাতে আবাসের বিশেষ শোভা
হইতেছে না, কিন্তু দেখিবামাত্র অন্তঃ-
করণ শোকে আগ্রত হইতেছে।

১০ম। দ্বারদেশ গবাক্ষ ইত্যাদি স্থানে
অবস্থিতি কবা ক্রীলোকদিগেব অনাগ্য।
কাশীখণ্ডে ইহার বিস্তাব দেখিতে পা-
ওয়া যাইবে।

১১শ। কোন কর্ণে ক্রীলোকের স্বা-
ধীনতা নাই। মনু বলিয়াছেন, বালিকাট
হউক, যুবতীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক,
কোন কর্ণেই ক্রীলোক আপন ঈচ্ছামত
চলিতে পারে না। ক্রীলোক তিন অব-
স্থায় পিতা ভর্তা ও পুত্রের অধীন হইয়া
চলিবে। কোন কালেই ক্রীলোকের
স্বাধীনতা নাই।

১২শ। স্বামীব মৃত্যুর পর ক্রীলোকে
হয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে,
না হয় সহগামিনী হইবে। কেশব টৈ-
জরস্বামী প্রণেতা নন্দকুমার এই স্থলে ব্রহ্ম-
চর্য্যের কঠোর নিয়মগুলি উল্লেখ করি-
য়াছেন। নন্দকুমার আপন মত সংস্থাপ-
নার্থ কাশীখণ্ড হইতে বচন তুলিয়াছেন।
কাশীখণ্ডের ব্রহ্মচর্য্য ও স্মৃতিকারদিগেব
ব্রহ্মচর্য্য অনেক প্রভেদ। ঋষিবা ব্রহ্ম-
চারীর কর্তব্য কর্ত্ত্বগুলিকে ব্রহ্মচর্য্য
আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠা-
বস্থায় ব্রাহ্মণের যেরূপ শুদ্ধাচারে থাকে
বিধবারাও স্বামীর মৃত্যুর পর সেইরূপ
শুদ্ধাচারে থাকিবে, এই তাঁহাদের অভি-

প্রায়। কিন্তু কাশীখণ্ডকার কহেন,
বিধবারা ভূমিশয়া আশ্রয় করিবে।
অসময়ে আহার কবিবে। পবিত্রী
করিয়া আহাব কবিলে, তাহাদিগের নরক
দর্শন হইবে ইত্যাদি। ইহাব নাম ব্রহ্ম-
চর্য্য নহে। ইহাকে সন্ন্যাস বলিলেও
বলা যায়।

বিষ্ণুসংহিতা প্রায়ই সরল গদ্যে লি-
খিত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কবিতাও দেখা
যায়। ক্রীধর্ম্ম নির্ণয়েব উপসংহারে নিম্ন-
লিখিত শ্লোকত্রয় দেখা যায় যথাঃ—

নাস্তি ক্রীণাঃ পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং

নাপ্যুপাসনং।

পতিং শুশ্রুষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

পতৌ জীবতি যা যোষিছুপবাস ব্রতং

চরৎ।

আয়ুঃ সা হরতে পতুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥

মৃতে ভর্ত্তরি সাক্ষী ক্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।

স্বয়ং গচ্ছতাপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

এই পর্য্যন্ত বিষ্ণুসংহিতায় ক্রীধর্ম্ম প্রক-
রণ শেষ হইল। এই প্রস্তাবের মধ্যে
আমরা দক্ষ ও ব্যাস ভিন্ন আর সকল
সংহিতাবই সমালোচন করিলাম। দক্ষ
সংহিতায় ক্রীলোকের কর্ত্তব্য নির্ণয় নাই।
কিসে ক্রীলোকের প্রশংসা হয়, তাহা
বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে। ব্যাস
সংহিতা যদিও বিষ্ণুর ন্যায় প্রাঞ্জল নহে,
তথাপি বিষ্ণুর অপেক্ষা অনেক বিস্তার
ক্রমে ক্রীচরিত্র বর্ণনা আছে। আমরা
এই দুই সংহিতার বচনগুলি অমুবাদ
করিয়া দিয়া, তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপন
করিব। পূর্বে প্রবন্ধে কাত্যায়নেরও

কোন কথা উল্লেখ করি নাই। কাভ্যায়ন সকল সংহিতার পরিশিষ্টরূপ। যে সকল স্থান অন্য সংহিতায় অক্ষুট, কাভ্যায়ন তাহার বৈশদ্য সম্পাদন করিয়াছেন। আর অন্য সংহিতায় বাহার উল্লেখ নাই, কাভ্যায়ন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বীপ কর্তব্যেব মধ্যে বিদেশগত স্বামীর অগ্নিরক্ষা একটি প্রধান কার্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সৌভাগ্য দ্বারাই জীলোকে জ্যোষ্ঠতা লাভ করে। সেই সৌভাগ্য আবার অগ্নিরক্ষা দ্বারা লাভ হয়। আর সৌভাগ্যবতীর মুখ যদি কেহ প্রাতঃকালে দেখে, তাহার সমস্ত দিম মঙ্গল হয়। দুর্ভাগ্যর মুখ দেখিলে, সেদিন বিবাদ বিসংবাদে পড়িতে হয়। বিষ্ণুসংহিতার শেষভাগে নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে লক্ষ্মি! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে বাস কর। এই প্রশ্নেব উত্তর হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কীদৃশ জীলোকের গৃহে থাকিতে ভালবাস। তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করিলেন।

নারীষু নিত্যং স্তুতিভূষিতাসু পতিব্রতাসু
প্রিয়বাদিনীষু
অমুক্ত হস্তাসু স্তন্যদিতাসু স্তম্ভপুণ্ড্রাণ্যসু
বলিপ্রিয়াসু ।
সম্বৃষ্টবেশ্যাসু জিতেজ্জিয়াসু বলিবা-
পেতাষু বিলোলুপাসু
ধর্মব্যাপেক্ষিতাসু দয়াদিতাসু স্থিতা
সদাঃ মধুহৃদনে তু ।

উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, পূজ্যদিতা, অর্থসঞ্চয়ে

যত্নবতী, দেবতাদিগের, পূজাপ্রিয়া গৃহ পরিমার্জনতৎপর, জিতেজ্জিয়া, কলহবিবতা, বিলোলুপা, ধর্ম কক্ষে অভিনিবিষ্ট হৃদয়া, দয়াদিতা নারীতে আমি বাস করি। যেমন মধুহৃদন আমার প্রিয়, টেহারাও সেইরূপ। অতএব আমরা এই লক্ষ্মীর বাক্যে দ্বীচরিত্রের এক অতি সুন্দর চিত্র প্রাপ্ত হইলাম। পূর্ব প্রবন্ধে জীলোকের যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিলে ও কলহবিরতা, পূজবতী, ইজ্জিসংযমবতী, দয়াদিতা হইলে, লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে চিরদিন বিরাজমানা থাকিবেন। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ যে সময়ে মহু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ সংহিতাকরণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন দ্বীচরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল। ঐ ঋষিগণ সত্যমাত্র আশ্রয় করিয়াই স্মৃতিসংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা দ্বীচরিত্র যতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহার উত্তম উত্তম চিত্র দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিকগণ সত্যের প্রতি তাদৃশ আস্থা না করিয়া, অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন। পুরাণসম্মত উন্নত চরিত্র জীলোক কেবল কবিদিগের মানসমধ্যে থাকিতে পারে। রক্ত মাংস-ময় সংসারে সেরূপ রমণী থাকিতে পারে না।

স্মৃতিসংহিতার আর একটি উৎকৃষ্ট দ্বীচরিত্রের বিবরণ বাসলিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। আমরা এই স্থলে তাহার

সবিস্তার অনুবাদ কবিয়া দিব।

“পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞতি, মাতা বয়স বিদ্যা ও বংশে সদৃশ বরে কন্যাসম্প্রদান কবিবেন। পূর্ক পূর্কের অভাবে পর পর ব্যক্তি দান কবিবেন। সকলের অভাবে কন্যা স্বয়ম্বব কবিবেন। * * * পূর্ককালে স্বয়ম্বু আপনাব দেহকে দ্বিধাপাটিত করেন। অর্দ্ধের দ্বারা পত্নী ও অপব অর্দ্ধের দ্বারা পতির উৎপত্তি হয়, এই ঋতি আছে। যত দিন পর্যাস্ত বিবাহ না কবা যায়, তত দিন পুরুষকে অর্দ্ধ কলেবব বলিতে হইবে। ঋতি আছে অর্দ্ধ দেহ জন্মে না কিন্তু জন্মাটতে পাবে। * * * বিবাহা নস্তব অগ্নি ও পত্নীব সহিত, গৃহনির্মাণ কবত বাস কবিবে। আপনাব ধনে জীবিকা নির্বাহ করিবে এবং বৈতান অগ্নি নিষ্কাশন হইতে দিবে না। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্ণলাভে স্ত্রী পুরুষ সর্বদা একমনা হইবে। এবং একরূপ নিষম কবিয়া চলিবে। স্ত্রীলোকের পরাক্রম বর্ণ সাধনব কোন স্বতন্ত্র পথ নাই। শাস্ত্রবিধিব ভাবার্থ সংগহ কবিসা অথবা অতি দ্রেষ কবিয়াও স্বতন্ত্র পথের উল্লেখ পাওবা যায় না। স্ত্রী স্বামীর পূর্ক শয্যা হইতে গাবোথান কবিয়া আপনাব দেহশুদ্ধি করিবে। শয্যা তুলিয়া বাধিবে এবং গহমার্জ্জন কবিবে। অগ্নি শালা ও অঙ্গানব মার্জ্জন ও লেপন কবিবে। তাহার পর অগ্নি পরিচর্যা বাধ্য কবিবে ও গৃহ সামগী সকলব

তত্ত্বাবধারণ কবিবে * * * এইরূপে পূর্কাকৃত্য সমাপন কবিয়া গুরুদিগেব পাদবন্দনা কবিবে এবং গুরুজন প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার সকল ধারণ কবিবে। কায়-মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইবে। নির্ম্মলচ্ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত থাকিবে। স্বামীর হিতকার্য্যে সখীর ন্যায়, অদ্বিষ্ট কার্য্যে দাসীর ন্যায় নিয়ত তৎপরা হইবে। তাহার পর অন্ন প্রস্তুত কবিয়া, স্বামীকে এবং অন্যান্য ভোক্তৃ বর্গকে ভোজন কবাইবে। পবে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া, অবশিষ্ট যে কিছু অন্নাদি থাকিবে, স্বয়ং ভোজন কবিয়া দিবসের শেষভাগে আয় ব্যয় চিন্তায় নিযুক্তা থাকিবে। এইরূপ প্রতাহ কবিবে। স্বামীকে উত্তমরূপে আহাব কবাইবে। আপনি অনতিহৃৎকপে আহার কবিয়া গৃহ নীতি বিধান কবিবে এবং সাধু শয়ন আত্মীর্ণ কবিয়া পতির পরিচর্যা কবিবে। স্বামী শয়ন কবিলে, তাঁহারই নিকটে তাহারই পাদ মনোনিবেশ কবিয়া শয়ন কবিবে।” এই পর্যাস্ত স্ত্রীলোকের নিত্য কন্ম গেল। ইহাচ পূর্ক প্রবন্ধ হইতে কিছুই নূতন নাই। কেবল কিছু বিস্তার আছে মাত্র। ইহাব পরে স্ত্রীলোকের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় গুণের কথা উল্লেখ আছে; যথা—“স্ত্রীলোকের মনে কোন বিষয়ে অনবধানতা না থাকে। তাহার যেন মনে থাকে তাহাব নিজের কোন কামনা নাই। ইঞ্জিয় সংযম্ তিনি যেন সর্বদা যত্নশীলা থাকেন। তিনি

কখনই উচ্চস্বরে কথা কহিবেন না। অধিক কথা কহা পরুষ বাক্য ব্যবহার ও স্বামীর অপ্রিয় কহা তাঁহার পক্ষে দূষণ্য বহ। তিনি যেন ক্রাহার সঙ্গে বিবাদ না করেন এবং নিরর্থক প্রলাপ বাক্য ব্যবহার না করেন ব্যয় অধিক না করেন এবং ধর্মার্থ বিরোধী কোন কার্য না করেন। সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে প্রমাদ, উদ্ভাদ, কোপ, দ্রোহ, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ততা, নাস্তিক্য সাহস, চৌর্য ও দস্ত পরিবর্জনীয়। এই সকল পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপর হইলে ইহকালে যশঃ ও পর কালে স্বামীর সহিত ব্রাহ্ম সালোক্য প্রাপ্তি হয়।”

ব্যাস সংহিতায় এই সুন্দর পরিষ্কার দীর্ঘবর্ণনার পর আমাদিগের আর মন্তব্য প্রকাশ বৃথা। ইহা পাঠ করিলেই স্মৃতি সংহিতা কারেরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কত দূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট রূপে সন্দেহহীন হইবে। এক্ষণে সর্বগুণ সম্পন্ন রমণী অতি বিরল হইলেও ইহার মধ্যে বহুতর গুণশালিনী রমণী প্রাচীন ভারত বর্ষে, এমন কি এখনও অনেক দেখা যায়। কতকগুলি অধুনাতন বাবুদিগের সংস্কার আছে আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম ছিল না সুতরাং এতকাল* স্ত্রীলোকে কেবল দাসীবৃত্তি ও

কলহ করিয়া সময়ান্তিপাত করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের একবার অন্ততঃ ব্যাস সংহিতার বচন কয়েকটি পাঠ করা কর্তব্য। স্ত্রীলোকের হস্তে গুরু দাসীর কর্ম মাত্রের ভার ছিল না তিনি আর ব্যয়ের চিন্তা করিতেন তাহার নাম দেওয়ানী। ব্যাস সংহিতা পাঠ করিয়া বরং বোধ হয় স্ত্রীলোক যদি দেওয়ান হইতে দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই কার্য করিল পুরুষের কার্য কি? স্ত্রীলোকের মানসিক উন্নতি কিরূপ ছিল তাহারও কতক প্রমাণ স্মৃতি শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। ব্যাস স্পষ্ট বলিয়াছেন স্ত্রীলোকে যেন নাস্তিক না হয় এবং আর একজন বলিয়াছেন স্ত্রীলোক যেন হেতুবাদ শাস্ত্র শিক্ষা না করে। হেতুবাদ করিতে বারণ করায় ও নাস্তিক্য নিষেধ করায় স্পষ্ট অবগতি হইবে যে নারীগণ পূর্বকালে হেতুবাদ কবিত্তে শিখিত এবং অতি গুরুত্ব ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে সময়ের চিন্তা করিত। দক্ষসংহিতা সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ্মরূপে স্ত্রীলোকের কর্তব্য বা গুণ নি-গণ্যে যত্ন করেন নাই। তিনি উহাদের প্রধানতঃ গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। এবং সংক্ষেপতঃ উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের একটা উদাহরণ দিয়াছেন। “পত্নী যদি স্বামীর মন বুঝিয়া চলেন এবং তাঁহার বশাশ্রুতা হন তবে গৃহশ্রমের ন্যায় আশ্রম আর নাই। তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক দ্বারাই ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ফল লাভ হয়। যদি বর্তমান সময়ে মেহবশতঃ

* D. N. Bose's Lecture in the Student's Association.

স্ত্রীদিগকে স্বচ্ছানুরূপ ব্যবহার হইতে নিবারণ না করা যায় তবে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় সে পশ্চাৎ কঠোর করণ হয়।” স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার কথা মনুতে উক্ত আছে আর পুরুষের ন্যায় উহাদিগকে তাড়ন করার কথাও শংখ সংহিতায় আছে। যথা—“লালনীয়া সদা ভার্যা তাড়নীয়া তথৈবচ। লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতি নানাথা।” এবং এই নিমিত্ত দক্ষও বলিলেন প্রথম অবধি স্ত্রীলোককে শাসন করা কর্তব্য। “অমুকুল কারিণী মিষ্টভাষিণী দক্ষা সাক্ষী পতিব্রতা জিহ্বে-
জিয়া স্বামিভক্তা নারী দেবতা, সে মামুখী নহে।” “যাহার রমণী অমুকুলকারিণী তাহার এইখানেই স্বর্গ * * * এইরূপ পরস্পর গাঢ়ানুরাগ স্বর্গেও দুলভ। কিন্তু যদি একজন অমুরাগী ও আর জন অন-
মুরাগী হয় তাহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। গৃহে বাস সুখের জন্য সে সুখের পত্নীই মূল। সেই পত্নীর বিজ্ঞা বিনয়বতী ও স্বামীর বশানুগ হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। যদি রমণী সর্বদা খিণ্না হয় এবং যদি উভয়ের একমন না হয় তাহা অপেক্ষা দুঃখ আর নাই। * * *
জলোকা কেবল রক্ত শোষণ করে কিন্তু ছুটা রমণী ধন, বিত্ত, বল, মাংস, বীৰ্য, সুখ শোষণ করিতে থাকে। বলাকালে সাশঙ্কা, আর যৌবনে বিমুখী হয় এবং আপনার বৃদ্ধ পতিকের তৃণতুল্য জ্ঞান করে। অমুকুলা, মিষ্টভাষিণী, দক্ষা,

সাক্ষী, পতিব্রতা রমণীই লক্ষী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি নিত্য হৃষ্টমন হইয়া যথাকালে যথোপরিমাণে স্বামীর প্রীতিকর কার্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ভার্যা। ইতরা জরা।”

[২য় ও ৩য় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তার্থ।]

এতদূরে ঋতিশাস্ত্রীয় স্ত্রীধর্ম সমালো-
চনা সমাপন হইল। এই সমুদায় পাঠ করিলে প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদিগের কি রূপ সামাজিক অবস্থা ছিল এবং কি কি গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকে প্রশংসনীয় হইতে পারিতেন তাহা কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যাইবে। প্রথমতঃ অতি প্রাচীন কালে বিবাহের নিয়ম ছিল না। বিদ্যা-
সাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ দ্বিত্ব শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতনাব উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। আমাদের সে কথার কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহা আলোচনা করি নাই। বিবাহের নিয়ম সংস্থাপন হইলেও অনেক দিন পর্যন্ত কন্যার উপর বর মনোনীত করি-
বার ভাব থাকিত। এবং যদিও পিতা যাহাকে হয় কন্যা দান করিতে পারিতেন তাঁহাকেও শাস্ত্রকথিত গুণশালী বরকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হইত। অত্যা-
দলে তাঁহার পাপ হইত ও ইহলোকে অপযশঃ হইত। বর ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের উপর যে কেবল দাস্য কার্য্য মাত্রেরই ভার থাকিত এমন নহে গৃহস্থের যে

গুরুতর কার্য, সাংসারিক আয় ব্যয়চিন্তা ও ধনসঞ্চয় তাহার ভারও স্ত্রীর উপর অর্পিত হইত। এবং বিদেশগত স্বামীর অগ্নি রক্ষায় কেবল স্ত্রীরই অধিকার ছিল। যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না তাঁহারা ইচ্ছামত সমাজাদি হলে যাঠিতে পারিতেন। তাঁহারা যদিও সর্বত্র দায়ী দিকারিণী হইতে পারিতেন না তাঁহাদের নিজের ধন কেহই কোশল বা বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে পারিত না; করিলে চোরের ছায়া দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। স্বামী যদি স্ত্রীর ধন গ্রহণ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হন, তাহাইলে সূদৃশ টাকা রাজা দেওয়াইবেন। যদিও শাস্ত্রে কোনস্থানে স্পষ্ট লেখা নাই যে বহুবিবাহ করিও না তথাপি বহুবিবাহের এত নিন্দা আছে যে বহুবিবাহ না কবাই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। রামায়ণের আযোধ্যা কাণ্ড, একপ্রকাল বহুবিবাহকারীকে গালি দেওয়ার জন্য বলিলেই হয়। কালিকা-পুবাণে চন্দ্রের বাজ যক্ষ্মা রোগোৎপত্তি বহু বিবাহ পাণের প্রতিফল। ধ্রুবোপাখ্যানেও বহুবিবাহেব দোষ স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বিধবাবিবাহ যদিও কলিযুগের জন্য মাত্র কিন্তু অন্যান্য যুগে ব্রহ্মচর্য্য মাত্র ব্যবহৃত। পৌরানিক ঋষিরা এবং সংহিতা সমূহের টীকা-কার মহাশয়েবা বিধবাদিগের যে কঠোর ব্রত নির্দেশ কবিয়া দিয়াছেন প্রাচীন ঋষিরা তাহাব দিক্ দিয়াও যান নাই। নিষ্ঠুর সতীদাহ মনুসংহিতায় পাওয়া যায়

না যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে। বোধ হয় সতীদাহ অনার্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের বাড়ী মিথিলায়, মিথিলায় অন্যাপি অনার্য্য জাতির ভাগ অধিক। তিনি যে দেশের জন্য সংহিতা রচনা করেন, তথায় উহার প্রচার দেখিয়া, উহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বিষ্ণুসংহিতায় নারায়ণ লক্ষ্মীসম্মত দেবদেবীমধ্যে গণ্য হইয়াছেন। মনুর সময়ে বা বেদে বিষ্ণুর নামও নাই। সুতরাং বোধ হয়, মনুর অনেক পরে বিষ্ণুসংহিতা রচনা করা হয়, যখন রচনা হয়, তখন আর্য্য জাতীয়েরা অনেকাংশে অনার্য্যদিগের আচাব ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা যে লেখা পড়া শিখিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রের সর্বত্রই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্ভাবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাদের উপর অসম্ভাবহার করিলে, সে গৃহে লক্ষ্মী থাকেন না। অন্যান্য অনেক জাতির মধ্যে যেমন বিবাহ ইন্দ্রিধ স্ব-ভোগেব জন্য, আত্মাদিগেব মতে তাহা নহে, তাঁহারা সন্তানলাভ মাত্রেব অন্য বিবাহ করিতেন। নৈষ্ঠিক একচারীরা অবিবাহিত থাকিতেন, কিন্তু অগত্য ও জরংকার উপাখ্যান পাঠ করিলে বোধ হয়, ইহারা কেবল পিতবংশ রক্ষার জন্য বিবাহ করিয়াছিলেন।

[স্মৃতিসম্মত উৎকৃষ্ট নারী চবিত্র।]

বিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর অবাধ স্ত্রীলোকে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরু

যের সহবাস কবিত্তে পারিতেন না। করিলে তাঁহার ইহকালে দ্বেষ শাস্তি-ভোগ করিতে হইত, এবং পরকালে অনন্ত নরকের ভয় থাকিত। জীলোকে স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন। স্বামীর গৃহকাৰ্য্য, অতিথিসংকার, দেব-পূজা ইত্যাদিতে তাহাদের আসক্ত থাকিতে হইত। স্বামী পতিত বা পলাতক হইলে, অন্য বিবাহ করিবার যদিও বিধি দেখা যায়, সে শুদ্ধ কলিযুগের জন্য। অন্যান্য যুগে স্বামী পতিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেও যে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহাকে কুকুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া জী যদি সরলস্বভাবা দয়ালু গুরুজনে ভক্তিমতী পুত্রাদিতে স্নেহ-শালিনী এবং পতিপরায়ণা হইলেন, তবে তিনি জীলোকদিগের মধ্যে প্রধানা ও পূজনীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। হেতুবাদ ও নাস্তিক্য জীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণা হইবেন। তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং হৈতুকী দিগের অর্থাৎ যাহারা ধর্ম বিষয়ে হেতু-বাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ও যাহারা স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগের সঙ্গ সাধু জী সর্ব-তোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কোন রূপ সাহসকর্মে জীলোক কখন প্রবৃত্ত হইবেন না। স্বামী পুত্রাদির হস্ত হইতে আপনাকে স্বাধীন করিতে কখন চেষ্টা করিবেন না। সংস্কৃতে স্বৈরিণী

অর্থাৎ স্বৈচ্ছাচারিণী এবং ব্যভিচারিণী এক পর্যায়ে শব্দ। কুমটা শব্দ যদিও এক্ষণে দুই অর্থে ব্যবহার হয়, তথাপি অধুনা উহার অসদর্থই বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

অত্যন্ত অভিমান, সকল কার্যে অনভি-নিবেশ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ত্যাগ করিলেই জীলোক জগতেব মাননীয়া হইবেন। বঞ্চনা, হিংসা, অহঙ্কার, জীলোকের সর্ব-প্রকায়ে পরিহরণীয়। লজ্জা জীলোকের ভূষণ, পরহুঃখ দর্শনে কাতর হওয়া ও পরের ছন্দানুবর্তন করা জীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণনীয়। পরি-কার থাকা প্রাচীন ঋষিরা বড় ভাল-বাসিতেন। তাঁহাদের ঋষিগণীরাও সর্বদা আপন শরীর ও গৃহদ্বার ও তৈজস পত্র পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। অপরি-কার ও অশুচি গৃহে লক্ষী কখনই আসেন না এই তাঁহাদের সংস্কার। জীলোক যে অলঙ্কারপ্রিয় হয় তাহা ঋষিরা সম্যক-রূপে অবগত ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতি জীলোকের আত্মীয় বান্ধব ও অভিভাবকেরা সর্বদা তাঁহাদিগকে অলঙ্কা-বাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবেন। কিন্তু তাঁহারা আরও নিয়ম করিয়াছেন যে, জীলোকে নিজে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। ব্যয়কুষ্ঠতা জীলোকের প্রধান গুণ বলিয়া তাঁহারা নানা স্থানে নির্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম বিষয়ে স্বামী ও জীৱ ঐকমত্য অতীব প্রয়োজনীয়।

যদি স্বামী শাক্ত হন ও স্ত্রী বৈষ্ণবী হন, তাহাইলে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটে এদেশীয় কাহারই অবদিত নাই। এজন্য ঋষিরা নিয়ম করিয়াছেন, (এমন কি বিষ্ণুর প্রথম সূত্রই এই) যে, স্ত্রীলোক স্বামীর সমান ব্রতকারিণী হইবেন। যেমন অন্যান্য বিষয়েও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, সেইরূপ ধর্ম বিষয়েও তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। মুনরা যেমন সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন যে, লজ্জাশীলা গৃহকার্য্যতৎপরা পতিপারাবণা স্ত্রীলোকের স্বামী হওনাও অল্প পুণ্যের বলে হয় না। স্ত্রী যদি বাধা ও বশীভূত হইলেন, ওবে স্বর্গে ও মর্ত্যে প্রভেদ কি? যদিও তাঁহারা স্ত্রীলোককে সংস্কার শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বলিয়াছেন, সন্ধ্যাবহার দ্বারা, যাহাতে স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় আপন আপন কার্য্য করিতে যত্ন করে তাহাই করিবে। যদি তাহারা আপন ইচ্ছায় না কবে, তবে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কে সুনীতি শিক্ষা দিতে পারে? “কামমনোবাক্যে বিমুক্তা রমণী ভাষার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিবেন সখীর ন্যায় হিত কশ্মে তৎপরা হইবেন দাসীর ন্যায় আজ্ঞা পালনে যত্নবতী হইবেন।” কেহ যে বলিয়াছেন কলহ করা আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকের কার্য্য সেটী তাঁহার

অন্যায় বলা হইয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রে কলহ-বিরতাদিগের ভূরি ২ প্রশংসা গুণিতে পওয়া যায়। প্রিয়বাদিনী ও কলহ-শূন্য রমণী লক্ষীর আবাস ভূমি।

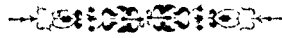
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে আমাদের দেশে অদ্যাপি ভোগের জন্য বিবাহ করা হয় না। বংশরক্ষাই বিবাহের মূখ্য উদ্দেশ্য। ঋষিগণ স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ আরো দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পাপ পুণ্যের অংশভাগী। একজন নিয়ম আর কোথাও নাই। নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিধাও করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়। “অস্থিভিরহীনি মাংসৈর্মাসানি” এই ঋতি। স্বামীর স্মৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হইলে স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন।

[তুলনা।]

প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ নারী চরিত্রের ঔৎকর্ষ বর্ণনা করা গিয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলে স্মৃতিকার দিগের নারী-চরিত্র কোন অংশেই ন্যূন নহে। স্নেহ প্রবৃত্তির উপর ব্যাসের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। দয়া, পতিভক্তি, পিতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ যতই অধিক থাকিবে ততই তাহাদের চরিত্র অধিক উৎকৃষ্ট হইবে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি বিষয়ে ঋষিরা কোন মতেই অসম্মত নহেন। তাঁহারা সংসারের আয়ব্যয় চিন্তার ভার

স্রীলোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন এবং বহুতর উহাদিগের কর্তব্য কর্মের মধ্যে নির্দেশ করিয়া উহাদের কর্মক্ষমতা বিলক্ষণ উত্তেজিত করিয়াছেন। কিন্তু স্রীলোক দিগের স্বাধীনতা নাই। সুতরাং স্বাধীনতা থাকিলে যে সকল মনোবৃত্তির আবির্ভাব হয় তাহার একটিও উহাদের নাই। এমন কি ধর্ম বিষয়েও স্রীলোকেরা আপন মতানুসারে কার্য্য করিতে পারেনা। সুতরাং যে ধর্মনিষ্ঠতার জন্ত বহুতর ইউরোপীয় নারী বিখ্যাত।

হইয়াছেন সে প্রবৃত্তি উহাদের প্রবল হইতে পার্য্য নাই। জন হাউর্ডের গৃহিণী স্বামীর সহিত দেশে ভ্রমণ করিয়া যেরূপ পরহিত ত্রুতে সমস্ত জীবন বাপন করিয়াছেন তাদৃশ রমণী আমাদের দেশে একটীও দেখা যায় না। আমাদের দেশের স্রীলোকেরা স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে পারেন না। সুতরাং যে সকল গুণে কুইন এলিজাবেথ বিখ্যাত হইয়াছেন আমাদের দেশীয় রমণীদিগের সে গুণ থাকা অসম্ভব।



বৌদ্ধ মত ও তৎসমালোচন।

কুশী নগরের সন্নিকটস্থ কানন মধ্যে শাক্যসিংহ মৃত্যুশয্যায শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যু যন্ত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুর্দিকে স্থবিরমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মুষ্টি প্রশান্ত ও গম্ভীর—দৃশ্যটা দেখিলে বোধ হয় যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্য্যে নিবৃত্ত হইয়াছেন। কানন নিস্তব্ধ, চরাচর নিস্তব্ধ, চতুর্দিক গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, এমনত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন “ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম, সত্য এবং মার্গ সন্মুখে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া লও,” ভগবান বারংক্রম এই কথা বলিলেন কিন্তু কেহই তাহার

প্রত্যুত্তর করিল না, ভিক্ষুবৃন্দ নিস্তব্ধে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব পুনর্বার বলিলেন, “হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে এষ্ট শেষবার উপদেশ দিতেছি যে পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর অজ্ঞান্য তোমরা নির্দোষ কামনায় জীবনক্ষেপকর।” তিনি এই শেষ বাক্য বলিয়া ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পর অর্হত গণ কহিলেন বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর একদা নাগসেন মগলাধিপতি মহারাজ মিনিন্দকে* কহিলেন “বহুগুণসম্পন্ন ভগ-

* ইনিঘোন বা যখন রাজ্য মিনিন্দ (Bactrian king Menander) ভারতবর্ষীয় কোন স্থলে ইনি খ্রীষ্ট জন্মের ২০০

বান্ জীবিত আছেন।” তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন “তবে তিনি কোথায়?” আচার্য্য নাগসেনই কহিলেন “ভগবান্ নির্ঝাণ প্রাপ্তি হইয়াছেন, তাঁহার আর জন্মগ্রহণ করিয়া ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। তিনি এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্থানেই বর্তমান নাই। অগ্নি নির্ঝাণ হইলে তাহা কি এখানে বা সেখানে আছে বলা যাইতে পাবে? এইরূপ আশাদিগের ভগবান্ নির্ঝাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চিরকালের জন্য অন্তগত হইয়াছেন, আর উদ্ভিত হইবেন না। তিনি আর কোন স্থলেই বর্তমান নাই কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্মচক্রে বর্তমান আছেন এবং তাঁহার সেই প্রদর্শিত ধর্ম মধোই তিনি সজীব রহিয়াছেন।” আমরা এক্ষণে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহাতে বৌদ্ধধর্মের সারাংশের আলোচনা করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে অন্যতর বিষয় আমাদের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ শাক্যসিংহের প্রধান বিহাব স্থান শ্রাবস্তী† তথা হইতে তিনি সকল

বৎসর পূর্বে রাজ্য করিয়াছিলেন। দেবামানস্বিয় (Demetrius) ইহার পারিষদ ছিলেন। মিনিন্দ্রের সহিত নাগসেনের ধর্মসম্বন্ধে প্রস্তোত্তর পালিভাষার “মিনিন্দ্রপত্নে” লিখিত আছে।

† মহাভারতে লিখিত আছে শ্রাবস্তী ইক্ষাকুবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী।

লোকে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন, একজ্ঞ উহার অপর নাম ধর্মপত্তন। এই স্থলেই সকল লোক তাঁহার উপদেশ কদম্ব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন কি দেবতারও তাঁহার ধর্ম ঘোষণা শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ উক্তি দ্বারা স্তুত করিয়াছিলেন।

“উৎপন্নো লোক প্রদ্যোতো লোকনাথঃ
প্রভক্ষরঃ।”

“অক্ষীভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দাতা
রণঞ্জহঃ।”

“ভগবান্ জিতসংগ্রামঃ পুণ্যো পূর্ণ
মনোরথঃ।”

“সম্পূর্ণৈঃ শুক্লধর্মৈশ্চ জগন্তি তপস্বিয্যসি।”

“চিরম্ সুপ্তমিমং লোকং তমঃসন্না-
বঙষ্ঠিতং।”

“ভবান্ প্রজ্ঞা প্রদীপেন সমর্থঃপ্রতি-
বোধিতুং।”

“চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশাঘাতি-
প্রপীড়িতে।”

“বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাদি
প্রমোচকঃ।”

মহাপুত্র ইক্ষাকু হইতে অষ্টম পুরুষ শ্রাবস্তক উহার নির্মাতা যথা মহু—ইক্ষাকু—নাশক—ককুৎস্ত—আননাঃ—পুথু—বিশ্বগম্ব—অত্রি—যুধাম্ব্য—শ্রাব—শ্রাবস্তক—এই শ্রাবস্তক রাজা উহা স্বনামে বিখ্যাত করিয়া দক্ষিণদিকে স্থাপন করেন। “অদ্রেস্ত যুবনাশস্ত শ্রাবস্তস্তায়জো-
ভবেৎ।”

তস্ত শ্রাবস্তকো জেয়ঃ শ্রাবস্তী যেন
নির্মিতা।” (বনপর্ব)

“ভবিষ্যন্তাক্ষণাঃ শূভাশুভমি নামে

সমুদগতে।”

“মমুখ্যা শৈব দেবাশ্চ ভবিষ্যন্তি পুণা

মিতাঃ।”

“পণ্ডিতাশ্চাপ্যরোগাশ্চ ধর্মশ্রেষ্ঠস্তি

চেপিতে।” ইত্যাদি

অর্থাৎ “আপনি লোক ভাস্কর, লোক-নাথ এবং অক্লীভূত লোক সকলেব চক্ষু-দ্বারা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন, কামজয়ী, পূর্ণ মনোরথ, এবং আপনি এই জগৎ গুরুধর্ম* দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। জগৎ বহুকাল পর্যন্ত অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত আছে, তমঃ রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছে—আপনি ইহাকে জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ। এই জীব লোক ক্লেশ ব্যাধিতে প্রপীড়িত আছে দেখিয়া আপনি বৈদ্যবাজ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন আপনাব দ্বাবাই এই জীব-লোকের সকল পীড়ার অন্ত হইবে, এই জীবলোক এতকাল চক্ষুহীন হইয়াছিল, আপনি উদিত হওয়াতে তাহা সচক্ষু হইবে, কি দেব, কি মনুষ্য সকলেই সুখী হইবে। বাহারা আপনাব এই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা পণ্ডিত হয় এবং গতিব্যাধি হয়।” ইত্যাদি

* গুরুধর্ম অর্থাৎ অহিংসা ধর্ম। অহিংসা ধর্মের গুরু সংজ্ঞা বৌদ্ধ ভাষায় অন্তর্গত নহে। ইহা সংস্কৃত ভাষায় অন্তর্গত। বেদ হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ বাস, তৎপরে পতঞ্জলি, ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ধ্যান নিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্য সিংহ ভাবিলেন, হয় কি কষ্ট! এই জীবলোক কেবল কষ্টময়। কুম্মাইতেছে—বাঁচিতেছে—মরিতেছে—চাত হইতেছে ইত্যাদি—লোক সকল এই মহা দুঃখ স্কন্দের মধ্য হইতে নিম্নত হইতে জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রিয়া অবগত নহে। এই গভীর চিন্তার পর শাক্যসিংহ ভাবিলেন “কি হেতু জরামরণ হয়? জরামরণ কিং মূলকং?” এই প্রশ্নোদয়ের পরক্ষণেই উদয় হইল “জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণং।” জাতি সত্তাই জরামরণের কারণ। “কিং মূলকং জাতিঃ?” জাতির মূল কি? “জাতির্ভবতি ভব প্রত্যয়া।” ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই জাতির মূল। এইরূপ উৎপত্তির বীজ উপাদান, (অর্থাৎ পৃথিবী ধাত্বাদি) উপাদানের মূল তৃক্ষা—তৃক্ষার মূল বেদনা—বেদনার মূল স্পর্শ—স্পর্শের বীজ ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের বীজ নাম রূপ—নামরূপের বীজ বিজ্ঞান—বিজ্ঞানোৎপত্তিব বীজ সংস্কার—সংস্কারের বীজ অবিদ্যা।* দুঃখ স্কন্দের এই হেতু ভাব

* পালিভাষার দ্বাদশ নিদানের মতও এইরূপ যথা “অবিজ্ঞা পস্সেয় সজ্জাব, সজ্জাব পস্সেয় বিন্নানম্, বিন্নানপস্সেয় নামরূপম্, নামরূপপস্সেয় ষড়ায়তনম্, ষড়ায়তন পস্সেয় ফাস্সো, ফাস্সপস্সেয় বেদনা, বেদনা পস্সেয় তষিণা, তষিণা পস্সেয় উপাদানম্ উপাদান পস্সেয় ভাবো, ভাবপস্সেয় জাতি, জাতিপস্সেয় জরামরণম্ শোকা পরিদেব দুঃখ” ইত্যাদি

অবগত হইয়া বোধিসত্ত্ব, ঐ হেতু ভাবের উচ্ছেদ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল যে “অবিদ্যায়া মসত্যং সংস্কারা ন ভবন্তি অবিদ্যা-নিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ। সংস্কার নিরোধাদিহ্মাননিরোধঃ। যাবজ্জাতি নিরোধাজ্জরা মরণ শোক পরিশেষ ছুঃখ দৌর্গন্ধনস্তৌপায়াংশা নিরুদ্যান্তে। এবমস্ত্র কেবলমস্ত্র মহতো ছুঃখ স্কন্দমস্ত্র নিরোধো ভবতীতি। ইতিহি ভিক্ষুবো বোধি সত্ত্বস্ত্র পূর্ব্ব মশ্রুতেষু ধর্ম্মেযুযোঃনিশো মনশিকো বা দ্বলোককারাজ্ঞান মুদপাদি চক্ষুবদ-পাদি—বিদ্যোদপাদি ভূবিরুদপাদি—মেষোদপাদি প্রেজ্জোদপাদি আলোকঃ প্রোজ্জ্বলভূব—অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়; এইরূপ ক্রমে সমস্ত ছুঃখ স্কন্দ নিরুদ্ধ হইতে পাবে। অতএব ছুঃখ নিবোধেব নাম নির্ক্ষাণ। নির্ক্ষাণ হইলে স্ত্রুথ ছুঃখাদি থাকে না, আত্মাও থাকে না, একবারে অতাব হইয়া যায়। শাক্য সিংহ এইরূপ চিন্তার চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি “জবা মরণ বিঘাতী ভিষগুর” বলিয়া খ্যাত হইলেন।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য দার্শনিক দিগেব মধ্যে যেমন জগত্তেব মূল তত্ত্ব কোনমতে ২৫, কোন মতে ১৬, কোন মতে ৭—তেমনি পুরাতন বৌদ্ধদিগের মতে জগ-তের মূলতত্ত্ব ২, চিত্ত ও ভূত। চিত্ত হইতে পঞ্চ স্কন্ধাঙ্ক চৈতন্যপদার্থ, ভূত

হইতে ভৌতিক পদার্থ, এই উভয়বিধ পদার্থ দ্বারা বাহু ও অভ্যন্তর ঘটত সমস্ত ব্যাবহাবান্ধিম হইতেছে।

“ভূতং ভৌতিকং চিত্তং চৈতন্যঞ্চ”

(শঙ্কবাচার্য্যদ্বত বুদ্ধ বাক্যঃ)

“খর মেহোক্ষেরণস্বভাবান্তে পৃথিবী

ধাষাদমশ্চতারঃ”

বুদ্ধদেবের মতে ভূত ৪টী, ইনি মূল পদার্থকে ধাতু শব্দে উল্লেখ করিতেন। তদনুসারে পৃথিবী ধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু বায়ুধাতু। এই চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণু সত্তা বৌদ্ধদিগের মতে হইতেছে। আকাশ কোন পদার্থ নহে। আবরণাতাব অর্থাৎ যেখানে কিছু নাই, সেই অবকাশময় স্থানের নাম আকাশ, তাহা কোনও পদার্থ নহে।

উক্ত চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবী ধাতু খর অর্থাৎ কঠিন স্বভাব। পৃথিবীর স্বভাব সেই বস্তুতে কাঠিনা জন্মে। আপ্যধাতু মেহ স্বভাবাপন্ন তেজোধাতু উষ্ণস্বভাব বায়বীয় পরমাণু দীর্ণ অর্থাৎ চলনশীল। “অনাদপি স্বভাব্যমন্তরা ঞ্জতেষাম্” উক্ত ঐ প্রকার স্বভাবাপন্ন ৪ প্রকার ধাতুর অন্য প্রকার স্বভাবও আছে। তাহা আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া ধর্ম্মবস্তাদি অনেক প্রকার। এই ৪ প্রকার পরমাণু রাশির নানাদিক ও তারতম্য ভাবে সংহত হওয়ার নাম স্কুল সৃষ্টি। ইহা ভূত হইতে জন্মলাভ কবে বলিয়া ভৌতিক নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ভূত

ভৌতিক সমুদায় জগতেব এক অবয়ব। অবশিষ্ট অবয়ব পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈতন্যপদার্থ দ্বারা পূরণ হয়। যথা—

“কপ বিজ্ঞান বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার
সংজ্ঞকাঃ পঞ্চ স্কন্ধাশ্চিত্ত চৈতন্যকাঃ”

(শঙ্কবাচাৰ্য্যপুত বুদ্ধ বাক্য)

সবিষয় ইন্দ্রিয়কে কপ স্কন্ধ বাল্যবিষয় সকল বহিঃস্থ হইলেও অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় দ্বাবাই উহাব উপলব্ধি।) বাহ্য বস্তু কিছু নাই, সমস্তই অন্তঃস্থ বিজ্ঞান ধাতুব পরি নাম এই মতেব উত্থান এই স্থান হই তেই হইয়াছে।

“অহ মহিমিত্যালয় বিজ্ঞানং কপস্কন্ধঃ”

আমি আমি, আমার আমার, এবং প্রকাব অহং ভাবাপন্ন সৰ্বদা উৎপন্ন জ্ঞান প্রবাহেব নাম বিজ্ঞান স্কন্ধ। স্মৃণ দুঃখাদিব অনুভব হওবাব নাম বেদনা স্কন্ধ। ঈহা গো, ঈহা মত্ৰি, উহা অশ্ব, এই প্রকার ভেদ ব্যবহাব সম্পাদক নাম বিশিষ্ট বিকল্পাত্মক প্রতীতি নাম সংজ্ঞা স্কন্ধ। বাগ, দেহ, মোহ, ধর্ম, অধর্ম চিত্তাদি অন্তর্বিণ ভাবসমূহকে সংস্কার স্কন্ধ বলে। (বৌদ্ধ মতে ধর্মাদি কেবল চিত্তগত সংস্কার মাত্র)

“বিজ্ঞানস্কন্ধাশ্চিত্ত মায়াচ অন্যচ্ছাবস্কন্ধা
শৈবোচ সকললোকযাত্রা নির্বাহকাঃ”

উক্ত পঞ্চস্কন্ধেব মধ্যে যেটি বিজ্ঞান স্কন্ধ, তাহাব অপব নাম চিত্ত এবং আত্মা। অপব ৪ স্কন্ধেব নাম চৈতন্য।

এই মতে আত্মাব নিত্যতা নাই, স্থিতি-তাও নাই। জগতেব সকল ভাবই

ক্ষণিক, তবে স্থিতি বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা প্রবাহেব শক্তিতে। বর্তমান দেহে প্রতিক্রমেই স্রোতেব ন্যায় বিজ্ঞানধাতুব উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে। যদি মধ্য ব্যবধানকাল থাকিত তাহাহইলেই প্রতীতি হইত, ব্যবধান নাই বলিয়াই যেন বাল্য হইতে মরণ পর্যন্ত এক আত্মাষ্ট ভোগ কবিত্তেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

“এয়োদনাং সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ”

(শঙ্কবাচাৰ্য্যপুত বোধিচিত্ত বিবরণ)

আগাদিগেব মতে যেমন ভাব বিকাব ৬, বৌদ্ধদিগেব মতে ভাববিকাব বিংশতিবও অধিক। যথা

“অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নামকপং
ষডাযতনং স্পর্শো বেদনাতিক্ষোপাদানং
ভবোজগতি জবামবণং শোকে পবিবেদনা
দুঃখং দুর্ম্মনস্তাইতোব জাতীয়কাইতবেতর
হেতুকাঃ—(শঙ্কবাচাৰ্য্যপুত বৌদ্ধ সূত্রম)

ক্ষণিক বস্তুত স্থিতিব বুদ্ধি নাম অবিদ্যা। জগতেব সকল পদার্থই ক্ষণিক, কিছু ৩ ১০০ বৎসব ও ১০ বৎসব আছে বা থাকিবে ইত্যাদি বুদ্ধিই আমা দেব অবিদ্যা (এই অবিদ্যাব বাগ, দেহ, মোহ জন্মে—পশ্চাৎ সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায়। গর্তস্থ আলয় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান। এই আলয় বিজ্ঞান ক্রমশঃ শবীবন্ত ৪ প্রকাব ধাতু উপযুক্ত তাপে সংহত কবে তাহাবাব পবম্পাব পবম্পাবেব স্বভাব প্রকাশ কবিয়া পবম্পাবেক পবিপাক কবে। তৎপবে কপ

নিম্পত্তি অর্থাৎ গুরু শোণিতের নিম্পত্তি হয়। এইরূপে নামরূপ শব্দে গর্তস্থ সকল বুদ্ধব্দ্য অবস্থা পর্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে যড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান ৪ ধাতু ও রূপ এই দুইটির সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম যড়ায়তন। নাম, রূপ, ও ইন্দ্রিয় এই তিনেব সংযোগ হওয়ার নাম স্পর্শ। স্পর্শ হইতে স্খাৎকারা বেদনা, বেদনা হইতে বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়তৃষ্ণা হইতে প্রবৃত্তি এই প্রবৃত্তিঅনুসারে ধর্ম্মা-ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে জাতি অর্থাৎ নানা দেহোৎপত্তি। এতদ্বরে পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তির কথা বলা হইল। এই উৎপন্ন পঞ্চ স্কন্ধের পরিপাক হয়, সেই পরিপাকের নাম বার্কিকা (ইহাকে জরাস্কন্ধ বলে।) তৎপরে নাশ হয়। অর্থাৎ যে বলে স্কন্ধ সমুদয় সংহত ছিল সে বলের লয় হইলে সকলই লয় হইল—থাকিল সেই মূল ধাতু মাত্র। ঐরূপ নাশ হইলে তৎপ্রতি স্নেহ ভাবাপন্ন জীবের অন্তর্দাহ জন্মে। এই অন্তর্দাহের নাম শোক। শোক উপস্থিত হইলে “হা পুত্র!” বলিয়া বিলাপ করে। এই বিলাপের নাম পরিবেদনা। যাহা ইষ্ট নয়, অর্থাৎ মনের অন্তকূল নয়, তাহার অন্তভব হওয়ার নাম দুঃখ। এই দুঃখ হইতে দুর্মনস্তা অর্থাৎ মনোব্যথা জন্মে। এতদ্ভিন্ন মান অপমান প্রভৃতি বিকারান্তর জন্মিয়া থাকে।

এই সকল গুলি পরস্পর পরস্পরের হইয়া হেতু সদ্ভাবে অবস্থান করিতেছে

অর্থাৎ যেমন অবিদ্যা সংস্কার উৎপত্তির প্রকৃতি হেতু, তেমনি আবার সংস্কারও অবিদ্যাস্তম উৎপত্তির হেতু। এইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধগণ জগৎপরীক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই। বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য। বিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর এজগতে নাই। এই বিজ্ঞান নিরোধের নামই মুক্তি। ক্ষণিকই বুদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা ধ্যান করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্রীয় ভাষার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৌদ্ধদর্শন	আর্য্যদর্শন (গৌতমাদি)
খর	কার্টিন্য
ধাতু	ভূত
হেতুক	প্রকার
প্রত্যয়	কারণ
আলয় বিজ্ঞান	গর্তস্থজীবের
	প্রথম জ্ঞান
পুদ্গল	দেহ
প্রতীত্য	} কার্য্য
প্রতীয়হেতুক	
ভাব উৎপাদ	উৎপত্তি
নিরোধ	ধ্বংস
প্রতিসংখ্যা	} হনন
নিবোধ	
অপ্রতিসংখ্যা	} স্বয়ং বিনাশী
নিরোধ	
আবরণাভাব	আকাশ

সস্তানী	হেতুক ফলভাব
সম্মিশ্রয়	অধিকরণ
জীব	
অজীব	ভোগ্য
আশ্রব	বিষয় প্রবৃত্তি
সংবর	যম নিয়মাদি
নির্জর	প্রায়শ্চিত্ত
বন্ধ	কর্ম
মোক্ষ	কর্মনাশ
অস্তিকায়	তত্ত্ব বা পদার্থ
ঘাতিকর্ম	শ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধক
ভঙ্গিনয়	যুক্তিরীতি
	ইত্যাদি

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর (৫৪৩ খৃঃ জন্ম গ্রহণের পূর্বে) তদীয় কাশ্যাপ নামক ব্রাহ্মণ শিষ্য অভিধর্ম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সূত্র, এবং উপালী নামক শূদ্র বিনয় নামক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। এই “রত্ন ত্রয়ে” শাক্যসিংহেব সমুদায় বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসার মধ্যে সজীব রহিয়াছেন, এই গ্রন্থ ত্রিতয়ের প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য বলিয়া সাদরে ভিক্ষুগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধ ঘোষ কহেন “এসকল বুদ্ধবচন, এজন্য ইহার সকল অংশই অপরিবর্তনীয় কেন না বুদ্ধদেব ইহার মধ্যে একটী বাক্যও বুঝা ব্যবহার করেন নাই।” এই “রত্নত্রয়” সূত্র, নিয়ম,

অভিধর্ম, ত্রিবিধ গ্রন্থকে ত্রিপিটক কহে, পালিভাষায় উহার নাম “তিপিটকম্।” ভিল্লাসুপ গ্রন্থকার কনিংহাম সাহেব কহেন বিনয় ও সূত্রপিটকে শ্রাবক ও সাধারণ বুদ্ধমণ্ডলীকে সোধোদন করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল এজন্য উহা প্রাকৃত এবং অভিধর্মপিটক বোধিসত্ত্বগণকে বলা হইয়াছিল, উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সমুদায় পালেয় বা পালী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, কেননা বুদ্ধদেব মাগধী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন নাই। তিনি ভিক্ষুবৃন্দকে সোধোদন করিয়া কহিয়াছিলেন “আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষাগ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবা।” সূত্রাং ইহা নিঃসংশয় স্থির হইতেছে ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং ইহার টীকাকারও কহেন “বুদ্ধবাক্য সকল স্কলিকৃষ্টি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত।” মহাবংশের লিখনানুসারে সূত্ৰতিনামক সিংহল দেশীয় বৌদ্ধাচার্য্য অনুমান করেন ত্রিপিটক ঋতির ন্যায় পূর্বে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল তৎপরে অনুমান খৃষ্ট জন্মের ১০০ একশত বৎসরের পূর্বে ভট্ট গমনীর রাজ্যকালে গ্রন্থবদ্ধ হইয়া লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ৩০৭ খৃঃ পূঃ মহারাজ মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থ

কথা সিংহল দ্বীপে প্রচার করেন এবং তিনি সাধারণ বৌদ্ধগণের জন্য তাহার সিংহলীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন এই সিংহলীয় ভাষায় অনুবাদ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ চারিশত খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরায় পালি অনুবাদ করিয়া ছিলেন, তাহা সিংহল ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। বিনয়পিটকে শাক্যসিংহের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দের নিমিত্ত সর্বসংকল্প-পদ্ধতি লিখিত আছে, সূত্রপিটক বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যান পরিপূর্ণ এবং অভিধর্মপিটকে বিজ্ঞানাদি ঘটিত বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ত্রিপিটকের গ্রন্থ বিভাগ যথা।

বিনয় পিটকম্।

পরাজিকা, পাসিত্তি, মহাবগ্গো, সুলবগ্গো, পরিবারপাঠো।

সূত্র পিটকম্।

দীঘঘ নিক্কয়, মঝিম্ব নিক্কয়, সামুত্ত, অঙ্গুত্তর নিক্কয়, ক্ষুদ্রক নিক্কয়,। শে-ষোক্ত গ্রন্থ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত—খু-দ্দক পাঠো, ধম্মপদম্ উদানম্ ইতিবুত্তকম্-হত্তনিপাত, বিমানবাথু, পেট বাথু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতকম্, নিদ্দেশো, পতিসমভিদ মাগ্গ, আপাদানম্, বুদ্ধ-বংশ, সারিয়পিটকম্ ॥

অভিধর্ম পিটকম্।

ধম্মসঙ্গনি, বিভাঙ্গম, কথাবাথু, পুণ্ণল পামুত্তি ধাতুকথা, যমকম্, পাঠনম্ ॥

নির্বাণ কামনাই বৌদ্ধ জীবনের মুখ্য

উদ্দেশ্য। এই নির্বাণ প্রাপ্তির জন্তই তাহারা শারীরিক নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে এবং শাক্যসিংহ পুনঃ জন্ম গ্রহণেব কষ্টহইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত, বৌদ্ধগণকে এক মাত্র নির্বাণ লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণই কষ্টদায়ক। সাংকার্য্য-দ্বারা পুনর্জন্ম না হইয়া নির্বাণ লাভ হয় তাহাই বৌদ্ধগণের পরমসুখ। বৌদ্ধ শাস্ত্রকহে—“জিঘৃষচা চবম রোগ সঙ-খার পরম সুখ। এতম্ নতা যথা ভূতম্ নির্বাণম্ পরমম্ সুখম্”। অর্থাৎ যেমন ক্ষুধা রোগ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক, সেই মত জীবন দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক কিন্তু এক মাত্র নির্বাণই পরমসুখ। নির্বাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত অর্হতগণকে এই সকল গুণবিশিষ্ট হইতে হইবেক যথা দানশীল, ক্ষান্তি, বীৰ্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বন, প্রণিধি, জ্ঞান, ইহাকে পারামিতা কহে। বৌদ্ধেরা নাস্তিক, তাহাদিগের ধর্ম্য গ্রন্থে ঈশ্বরের নামমাত্র উল্লেখ নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থমধ্যে আদিবুদ্ধশব্দের উল্লেখ আছে। কেহ তাহার অর্থ ঈশ্বর অনুমান করেন কিন্তু সেটা ভ্রম, উহার অর্থ পূর্ব পূর্ব কল্পের দীপঙ্কারাদিবুদ্ধ। বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। তত্ত্ববিৎ কাণ্ট ও কোমং, ঘেসকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অধি-কাংশ শাক্য সিংহের মুখহইতে সহস্রং বৎসর পূর্বে বিনির্গত হইয়াছে। বৌদ্ধ

ধর্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছিল। একসময় “ভুঁ মণি পদোহুঁ” এই মন্ত্রে পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে যবন জাতি আমাদের এক্ষণে অসভ্য অর্দ্ধ-শিক্ষিত বলিয়া ঘণা করিয়া থাকেন, সেই জাতির পিতামহ গ্রীকগণ আমাদের নিকট বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়া এই ধর্মের উন্নতি সাধন কবিতেন।*

* যোনধর্ম রক্ষিত অল সেননা নগর হইতে ১৫৭ খৃষ্ট জন্মের পূর্বে সিংহল দ্বীপে ধর্ম প্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন

আমরা সেই আৰ্য্য জাতি। এবং ভারত বর্ষের মৃত্তিকা হইতে সকল জ্ঞান বীজ-অঙ্কুরিত হইয়াছিল কিন্তু সেদিন কোথায়! তেহি নো দিবসা গতঃ” সেদিন গত হইয়াছে! আমাদের সেই অসীম বুদ্ধিবল কালের তরঙ্গে চির কালের জন্য বিলীন হইয়াগিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা কবিতো গিয়া হৃদয় শোকে আপ্ত হইয়া উঠিল স্তবরাং অন্য এই পর্য্যন্ত!—

শ্রীরামদাস সেন

যথা মহাবংশ “যোনান গরল সন্দ যোণ মহাধম্ম বন্ধিতো” ॥*॥—



প্রেম নিমজ্জন।

রম্য উপবনে রম্য জলাশয় ধারে
দেখিছু কে যেন এক রয়েছে বসিয়া
পাগলের মত বেশ
পাগলের মত কেশ
পাগলের মত কর ভূতলে পাতিয়া
একদৃষ্টে বারিপানে রয়েছে চাহিয়া।

কভু কঁাদে কভু হাসে
কভু বা করুণ ভাষে
অহুরাগে গলে যেন সন্তাষি কাহাবে
আপন মনের কথা—
আপন মরম ব্যথা—
কত মতে কত ভাবে জানায় তাহারে।

সহসা সে ভাব গত,
আবার পূর্বের মত,
একদৃষ্টে বারিপানে চাহে হেরিবারে—
না জানি কি খনি-ঘোনি
অমূল্য রতন-মণি —
নাজানি কি বিধি-নিধিসেহল মাঝারে;—
না মিলে ডুবিলে যাহা সংসার পাথাবে।
বিজন প্রদেশ সেই বিজন কানন!—
সকলি পাদপময়—অতি স্নোভন!—
বিটপে বিটপী নত,
তাঁহে পুষ্প নানা মত,
একটীক ফল কিন্তু না করে ধারণ

একটি মুকুল নাহি হয় কদাচন।
 কেবলি কুসুম ফুটে,
 কেবলি সুবাস ছুটে,
 কেবলি ঝরিয়া পড়ে বনেব রতন
 কে করে গোবব তার—কে করে ঘটন।
 বসি পাখী ডালে ডালে
 এক সুরে একতালে
 মধুব করুণ কণ্ঠে গায় অমূল্য
 বিচিত্র বিহঙ্গ তারা বন অভরণ!—
 বন ছাড়ি নাহি যায়,
 বনেতেই স্মৃতি পায়,
 বনের বরণ পাখী বনের মতন,
 সেই তার স্মৃতি-ধাম—সেই নিকেতন।
 তথায় সমীচ অতি করুণ নিশ্বাস।—
 অবিরত কাঁপাইছে তরুলতা গণ ;—
 অবিরত বহিতেছে,
 সুসৌভে ভরিতেছে,
 গুরুপত্র উড়াতেছে,—
 অবিরত নাচাতেছে তড়াগ-জীবন ;—
 জলজসুন্দরীদলে দিয়া আলিঙ্গন।
 জলের শব্দ তথা,
 বিহঙ্গ অক্ষুট কথা,
 সমীর নিশ্বাস যথা—
 নাহি ত স্বতন্ত্র কেহ শুনায় কখন,—
 এক শব্দে পরিনত—চিত্র নিমোহন!
 নদী উপবনে এই জলাশয় ধাবে
 দেবদেব রয়েছে যুবা একাকী বসিয়া ;—
 স্থিরভাবে নত শিরে,
 একদৃষ্টে দেখে নীরে,—
 জগত সংসার যেন জলে পাসরিয়া
 পাগলের মত তথা রয়েছে বসিয়া।

বড়ই কৌতুক মনে জন্মিল তখন
 জিজ্ঞাসিল যুবাবরে করি সম্ভাষণ—
 “কেহ কে স্মৃজন ভূমি
 “আমি এ বিজন ভূমি
 “একাকী সরসী তীরে বসিয়া এমন
 “একদৃষ্টে দেখিতেছ সরসী-জীবন?”
 সুধাইলু বারম্বার,
 তবু কথা নাহি তার,—
 তবু না উত্তর গোবে করিল অর্পণ
 ভাবিলু পাগল বৃক্কি হবে সেই জন।
 তাই ভাবি পুনরায়
 জিজ্ঞাসিলু ডাকি তায়
 “কেন এ বিচিত্র ভাব কবি বিলোকন?—
 কেন এ নিরর্থ কার্যো মুগ্ধ তব মন?
 অমনি ক্রকুট করি
 ধ্যান-ধর্ম্য পরিহারি
 রোষ-বিস্ফারিত নেত্রে করি নিরীক্ষণ
 দারুণ মনের ভাব জানায় আগুন।
 ক্ষণপরে পুনরায়
 চিত্রিত পুতুলি প্রায়
 সবসী-সলিল ধ্যানে হইল মগন,—
 আবার ভুলিল সব জগত-স্মৃজন।
 ক্রমে মম কৌতুহল
 হৈল অতি সুপ্রবল,—
 উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তাবে কহিলু বচন ;
 অমনি গর্জিয়া উঠি সরোষে সে জন
 ধাইল আমার পানে,
 অকারণ শত্রু জ্ঞানে ;—
 নিকটে আইল যবে করি আফালন
 করিলু তাহারে আমি মিষ্ট সম্ভাষণ,—

নহি তব রিপু আমি
 আমি তব শুভকামী—
 আমি তব অভিলাষ করিব পূরণ,—
 কহ মোরে কিবা তব মানস মনন।
 উচ্চ হাসি হাসি যুবা কহিল তখন
 “তুমি মোর অভিলাষ করিবে পূরণ!—
 “তুমি সে রতন দিবে?
 “কহ কত মূল্য নিবে?
 “কোন সিদ্ধ মাঝে কহ তাহার জনন?—
 “কাহার কিরীট পরে
 সেরত্ন সুষমা ধবে,—
 “কোন ভাগ্যবান্ ধনী-হৃদয়শোভন!
 “সেরত্ন আকাশে জলে!—
 “কিসা থাকে বন স্তলে?—
 “অথবা অতল তলে লুকায় বদন!—
 “কোন নিধি দিতে তুমি করেছ মনন?
 * * * * *
 “গগন সাগরে পশি—
 “তুলিয়া গগন শশী—
 “কখন কি তুমি মম করে আনি দিবে!—
 “এমনেব সাধ তব
 “নারিবে পুরাত্নে কভু—
 “এ বাসনানল তব কভু না নিবিবে।
 সেরত্ন নাহিক নভে,
 “সেরত্ন নাহিক ভবে,
 “সেরত্ন রতনাকরে নাহিক মিলিবে!—
 “শুদ্ধ এ আঁখীর পাশে—
 “ভুবন মোহিনী হাসে,—
 “আর ওই জলাশয়ে বামারে হেরিবে।
 “সেয়গি অলিছে যাই—
 “জলাশয়ে শোভা তাই—,

‘তার অদর্শনে সব আঁধার হইবে!—
 “কুমুদ কল্লার যত
 “রক্তপদ্ম শত শত
 “আর এ সরজে নাহি কখন ফুটিবে
 “আর না মরাল কুল কভু সন্তরিবে”।
 “এত বলি ধরি করে
 “লয়ে মোরে সরোবরে
 কহিলেক, “ওই দেখ সরসী-বাসিনী!—
 “ওই দেখ হাসে জলে,
 “ওই যে কি কথা বলে
 “ওই দেখ অশ্রু ধারা ফেলে বিবাদিনী—
 বলিতে বলিতে তার
 আঁখি জল আপনার
 বেগেতে বহিল বক্ষে যেন প্রবাহিনী;
 বিষাদে ডুবিল চিত আঁধারে মেদিনী!
 “কহ প্রিয়ে কিবা হুঃখ!—
 “কেন আজি স্নান মুখ?—
 “কে ডুবাণে স্নাত্তরী বিষাদ সাগরে?
 “যখনি যে ভাবে চাই;
 “তখনি দেখিতে পাই;
 “হাসির হিল্লোল সদা খেলে বিষাদধরে!
 “সে হাসি কোথায় আজি
 “কোথা কুন্দ দন্ত রাজী—
 “কিআলা পশিল প্রিয়ে মরম ভিতরে?—
 “কহ মোরে রূপা করি
 “এ হুঃখে কেমনে তরি,—
 “কোন মন্ত্রে আমি তোমা হৃদয় উপরে?”
 “জগত সংসার আমি করিহু ভ্রমণ—
 “কোথা না পেলাম প্রিয়ে তব দরশন!
 “তবে এ জীবন ভার
 “কিকাজ বহিয়া আর

“আজি এই বারি মাঝে দিব বিসর্জন”!

এত বলি যুবা জলে হইল পতন ।

* * * *

কাঁপিল প্রকৃতি কায়—

সুন্দর প্রকৃতি যায়—

দেখিতে দেখিতে সব হইল স্বপন!—

বন শোভা লুকাইল,

জলাশয় শুকাইল,

মরু সম হ'ল সেই রম্য উপবন ।

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ঘোষ ।



নীতিকুসুমাজলি ।

দ্বিতীয় অঞ্জলি ।

১

কার্যকালে জানা যায় ভূত্যা-পরিচয় ।

কুটুম্বের পরিচয় বাসন-সময় ॥

মিত্রের পরীক্ষা হয় বিপদ উদয়ে ।

ভাৰ্য্যার পরীক্ষা হয় বিভবের ক্ষয়ে ॥

২

চক্ষুর বাহির হলো কার্য্য ক্ষয়কারী ।

সম্মুখেতে কথা গুলি মধুমাখা ভারী ॥

গরলেতে ভরা কুন্ত মুখে মাত্র ক্ষীর ।

হেন মিত্রে পরিহার করিবে সুধীর ॥

৩

অকালে না মরে জীব, শত শরপাতে ।

কাল প্রাপ্তে মরে, কুশ কণ্টক আঘাতে ॥

৪

বহুগুণ সত্ত্ব এক দোষের কারণ ।

নিমজ্জিত শশধর, কহেন গেজন ॥

কভু নাহি দেখিলেন সে কবি নিশ্চয় ।

দরিদ্রতা দোষ, গুণরাশি-নাশী হয় ॥

৫

কৃতকর্ম্মে পুনরায় নাহিক করণ ।

মৃত যেই তার পুন নাহিক মরণ ।

সেইকপ গত বিষয়ের নাহি শোক ।

এই তত্ত্ব কন যত বেদবিদ্ লোক ॥

৬

হেমাচল কিম্বা রজতাচল-সমুত ।

ভরুগণ কখন স্বভাব নহে চ্যুত ॥

প্রণমি মলয়াচলে, যাহার কৃপায় ।

শেওড়া, কুড়চী, নিম, চন্দনত্ব পায় ॥

৭

সম্পদে কোমল চিত্ত, আপদে কর্কশ ।

বসন্তে কোমল পাতা, নিদাঘে নীরস ॥

৮

যদি উচ্চ পদলাভে হয় অভিমত ।

তবে আগে চিন্তা করি হও তুমি নত ॥

কেশরী প্রথমে নত করিয়া শরীর ।

মহা তেজে উঠে গিয়া মস্তকে করীর ॥

৯

উদার হৃদয়, সুপ্রসন্ন হয়,
ক্রোধ যবে পরিগত।
অলস অঙ্গার, বিভূতি আকাব,
ভস্মে যবে পবিগত ॥

১০

সজ্জনের গুণবুদ্ধি সজ্জনেই কবে।
কুসুম সুরতি বায়ু দিগন্তে বিস্তবে ॥

১১

শীলতাই সদগুণের শোভাব ভবন।
যৌবনই যোষাদেব ভূষণ শোভন ॥

১২

জড়ের প্রভাবে পায় হুঃখ সাধুদলে।
চন্দ্ৰের উদয়ে পদ্ম সঙ্কুচিত জলে ॥

১৩

কাক প্রতি কেহ হয়, বিহিত মঙ্গলময়,
কাক প্রতি হুঃখের আকর।
দিনকব নিজকরে, কমলে প্রকল্প কবে,
কুমুদেব মুখ স্নানকর ॥

১৪

যেখানেই অবস্থিত হোন গুণবান্।
সর্বত্র হবেন তিনি শোভার নিধান ॥
দেখ নগি শরে, গলে, বাহুতে বিরাজে।
পাদপীঠে থাকিলেও অপক্লপ সাজে ॥

১৫

উৎসব আগতে কত প্রমোদ প্রবাহ।
বিগত হইলে আর না থাকে উৎসাহ ॥
কিবা শোভা পায় শশী প্রদোষ সময়।
প্রভাত আগত ক্রমে প্রভাশূন্য হয় ॥

১৬

গুণ থাকিলেই লোকে করয়ে পূজন।
শুধু বড় জাতি নহে পূজাব ভাজন ॥
স্ফটিকের পাত্র যবে চূরমার হয়।
পাঁচগুণা দিয়ে কেহ নাহি করে ক্রয় ॥

১৭

থাকিলে বিভব, না হয় গোবব,
দ্রবদৃষ্ট ভয়ঙ্কর।
দেখহ গোনয়, কমলা আনয়,
কভু নহে মনোহর ॥

১৮

যাতে সমুদ্ভব দোষ, তাতেই নিবাবে।
অগ্নিতেই অগ্নিদোষ বিস্ফোটক মাবে ॥

১৯

পরবুদ্ধি লয়ে যার জীবিকা-বিধান।
বুদ্ধিমান বলি তার কেন অভিমান ॥
অস্ত্রে ধবি পরেব প্রদত্ত অলঙ্কার।
কখন কি সমুচিত হয় অহঙ্কার ॥

২০

যদি ছোট সন্নিধান, বড় কভু কিছু চান,
তাঁহে তাঁর নাহি যায় মান।
আবাধিয়ে জল নধি,কৌস্তভাদি নানানিধি,
প্রাপ্ত হন বিষ্ণু ভগবান্ ॥

২১

সাধুগণ স্তবে ভুষ্ট, অবমেরা ধনে।
যথা স্তোত্র দেবতাব, বলি ভূতগণে ॥

২২

পরান্নে জীবন, করিতে যাপন,
বিরত মনস্বিচয়।
বায়স আবলী, লুটে থায় বলি,
পিক তাহে রত নয় ॥

২৩
আকস্মিক ধনে, পুরুষের মনে,
সন্তোষ বিধয় পায় ।
সরসীর সেতু, ভাঙ্গিবার হেতু,
অচির বর্ষার দায় ॥

২৪
এই আত্মা কভু মর্ত্যে, কভু স্বর্গে যান ।
শ্মশান উদ্যান হই, উদ্যান শ্মশান ॥

২৫
নিজাশয় যেন প্রকাব, অপরের তদাকাব,
জ্ঞান করে যত নবগণ ।
প্রতিমার মুখশশী, আপন ফলকে অসী,
দীর্ঘরূপে করয়ে ধারণ ॥

২৬
পণ্ডিত সমাজে, কভু নাহি সাজে,
গুণহীন লোকচয় ।
বিগতে তিমির, আগতে মিহিব,
দীপপ্রভা কভু রয় ॥

২৭
দুর্গে প্রবেশিলে পবাভূত বীরবর ।
গাঢ় পক্ষে মগ্ন অঙ্গ মাতঙ্গ ফাঁফর ॥

২৮
স্বকার্য উদ্ধার তবে, অপবের প্রতি নরে,
অনিশ্চয় প্রণয় আচরে ।
প্রচুর লোমের আশে, গাড়লে নবীন ঘাসে
গাড়লের দেহ পুষ্ট করে ॥

২৯
এককালে যেই গুণ হয় অতি মিষ্ট ।
সময়াস্তে নহে তাহা সে রসবিশিষ্ট ॥
শৈশবের স্বাভাবিক লাবণ্য স্নানর ।
যৌবন সময়ে কভু নহে মনোহর ॥

৩০
অলভ বস্তুতে কভু না থাকে আবর ।
স্বদার তেজিয়া পবদাবে মজে নর ॥

৩১
যেই ধন আহরণ ধর্ম্মের কারণ ।
কিহা পোষ্যগণের ভরণে প্রয়োজন ॥
আর যেই ধনে হয় আপদ বারণ ।
সেই সব ধন সদা হয় ধর্ম্ম-ধন ॥

৩২
কপ, কুল, বিদ্যা, বল, যৌবন বিভব ।
আর ইষ্টলাভে হয় অবজ্ঞা উদ্ভব ॥
সেই অবজ্ঞার হয় গর্ক অভিধান ।
তদানন্দ মোহ মদ, মদিরা সমান ॥

৩৩
বীরত্ব-বিহীন নীতি ভীকৃত্য বিষম ।
নীতি-হীন শৌর্য্য হয় পশুর বিক্রম ॥

৩৪
মহৎ বাড়িলে কভু অপথে না যায় ।
সমুদ্রে জোয়ার এলে নদীমুখে ধায় ॥

৩৫
তীব্রভয় দেখাইয়া মৃদুরূপে সাজা ।
হেন যুক্ত* দণ্ডপ্রদ হইবেন বাজা ॥

৩৬
করী জানে কেশবীব বল কতদূব ।
সেবল জানিতে ক্ষম না হয় ইন্দুর ॥

৩৭
বিদ্যাই নবের হন সমধিক কপ ।
বিদ্যাই প্রছন্ন গুপ্ত ধনের স্বরূপ ॥
বিদ্যা অথভোগ প্রদা, যশোবিধানী ।
বিদ্যাই গুরুর গুরু, কল্যাণ দায়িনী ॥

* যুক্তিবিশিষ্ট ।

বিদ্যা হন বকুজন বিদেশ গমনে।

পূজনীয়া হন বিদ্যা ভূপতি সননে ॥

পরম দেবতা বিদ্যা, সর্বধন সর্ব। *

বিদ্যাহীন যত নর পশুর আকার ॥

৩৮

গুণীর যে গুণ জানে যে গুণপ্রবীণ।

গুণিগুণ কেমনে জানিবে গুণহীন ॥

বলী যেই সেই জানে বলী কি বল।

দুর্বল সে বল কিসে জানিবেক বল ॥

কোকিল বিশেষে জানে বসন্তে কি রস।

সেই রস অনুভবে অশক্ত বাযস ॥

৩৯

গুণগণ গুণীস্থানে গুণগণ বয়।

নিগুণী স্থানে সেই গুণ দোষ হয় ॥

সুমধুর জলে জাত সবিৎ স্রোতসী।

সে পয় অপেয় হয় সাগর পরশি ॥

৪০

কি আশ্চর্য সাধুগণে, দোষকেও গুণগণে,

দুর্জনের মুখে গুণগণ দোষ হয়।

সাগবেব লোণা জল, মিষ্ট কবে মেঘ দল,

ক্ষীৰ পান করি ফণী বিষ ববিষয় ॥

৪১

বিবাদেব জ্ঞান বিদ্যা, দর্প হেতু ধন।

শক্তি প্রয়োজন পরপীড়ার কারণ ॥

খলের এ রীতি, বিপরীত সাধুজনে।

পরিণত জ্ঞান, দান, পর প্রয়োজনে ॥

৪২

জ্ঞাতি ভাজ্য নহে, চোরে না করে হরণ।

দানে ক্ষয় হীন বিদ্যা রত্ন মহাধন ॥

৪৩

সকলেই গুণ খুঁজে, রূপ নাহি চায়।

পুষ্পরাজ* মণি বটে গন্ধ নাহি তায় ॥

৪৪

আপনারে ভাবি মনে অভাব অমব।

বিদ্যা আব ধন চিন্তা কবিতক নর ॥

কেশে ধরি বসিয়াছে মৃত্যু ভয়ঙ্কর।

এই ভাবে ধর্ম সাধে যত সুধিবর ॥

৪৫

শবীবাব বল চেয়ে বড় বুদ্ধিবল।

তদভাবে হেন দশা প্রাপ্ত হৃদিদল ॥

মাছতে কদাচ করী মারিবাবে পারে।

এই কথা গজঘটা ঘোষে বারে বাবে ॥

৪৬

ঐতিব শোভন ঐতি, কুণ্ডলে না হয়।

কবেব ভূষণ দান, কঙ্কণেতে নয় ॥

পব প্রতি দয়া আব তিত আচরণে।

শবীবাব শোভারন্ধি, নহে ত চন্দনে ॥

৪৭

কুলেব কল্যাণে একজনে পবিত্র।

গ্রামের কল্যাণে কুল পরিত্যাগ কব ॥

জনপদহিতে গ্রাম করহ বর্জন।

পৃথিবী কবহ ভাগ আশ্রাব কারণ ॥

৪৮

স্বজাতীয় বধে মানুষ্যের বাড়ে রক্ত।

শিক্রে বিহঙ্গ মাবে, না মারে ভুজঙ্গ ॥

৪৯

গুরু প্রয়োজন, সাধন কারণ,

পূজা আয়োজন, ভক্তির সম্পর্ক নাই।

জ্ঞানের কাবণ, সহিত যতন,

গোধন পূজন, ধর্মহেতু নহে ভাই ॥

* পোথবাজ হিন্দী।

৫০

মত্ত মাতঙ্গের কুন্ত দলনে চতুর ।
কিছা সিংহ বধে দক্ষ আছে কত দূর ॥
কিন্তু আমি বলি, বলী আছে যত জন ।
অশক্ত কন্দর্প দর্প করিতে দলন ॥

৫১

যার নাম শুনা মাত্র, সস্তাপেতে দহে গাঁজ,
দেখা মাত্র উদ্ভাদ বাড়র ।
পরশিয়া যার কায়, সকলেই মোহ যায়,
তাহারে দয়িতা* কেন কয় ॥

৫২

তদবধি কৃতীন্দের হৃদয়কন্দরে ।
বিমল বিবেক দীপ চারু প্রভাধরে ॥
যদবধি কুবঙ্গনয়না বালা গণ ।
চকল অপাঙ্গ নাহি করে সঞ্চালন ॥

* দয়াবতী ।

৫৩

ক্রান্তিতে মুখর, পণ্ডিত নিকর,
'কেবল বচনে পটু ।
কহে ছাড় সঙ্গ, নারী রতিরঙ্গ,
কার্যকালে কিন্তু হটু ॥

নীলাঙ্গ নয়না, জঘন শোভনা,
রসনা† মগ্নিমগ্নিত ।
করে পরিহার, শকতি কাহার,
কে আছে হেন পণ্ডিত ॥

৫৪

বিজাতীয় বাণী কভু শোভিত না হয় ।
বিতর্কে বেদের প্রভা কখন না রয় ॥
অধরে অঙ্গন-রেখা কেবল দৃষণ ।
নয়নের হয় কিন্তু অপূর্ব ভূষণ ॥

† চন্দ্রহার ।

চৈতন্য ।

অষ্টম অধ্যায় ।

গৃহে নামসংকীর্তন ।

চৈতন্য যে সময় পুরীবরের নিকট
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, তখন তাঁহার
বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র ।

শিষ্যদিগের অনুরোধে চৈতন্যদেব
গয়া হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন ।
বহুবাক্যবগণ তাঁহাকে দেখিয়া যারপর
নাই প্রীত হইলেন । শচী পুত্রকে
দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন । আত্মীয়
বহুগণ তীর্থযাত্রার বিবরণ জিজ্ঞাসা করি-

লেন । চৈতন্য আদ্যোপান্ত সমুদয়
বর্ণন করিতে লাগিলেন । বর্ণন করিতে
করিতে ঈশ্বরপুরীর নাম উল্লেখ করা-
মাত্র ভাবসংসর্গ শুণে কৃষ্ণপ্রেমে বিগ-
লিত হৃদয় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হা কৃষ্ণ!
হা কৃষ্ণ! বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন ।
সকলেই বিস্মিত হইলেন । কেহ ভাবি-
লেন বায়ুর কার্য্য । কেহ ভাবিলেন
অপদেবতায় দৃষ্টি । বৈষ্ণবগণ তখনই

বুলিলেন, চৈতন্যের জীবনসম্বন্ধে একে-
বারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। চৈতন্য
কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়া তদ্ব্যবস্থা* প্রাপ্ত
হইয়াছেন।

শ্রীমান্ পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ ॥
চতুর্দিকে নয়নে বহয়ে অশ্রুধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিলা অবতার ॥
মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার।
এমন ইহারে কত না দেখি যে আর ॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব পথে বা হইল দরশনে ॥

প্রভু + বৈষ্ণবদিগকে আগামী কল্য
গুণাধর চক্রবর্তীর গৃহে সমাগত হইতে
অনুরোধ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে বৈষ্ণবগণ নিত্যকৃত্য
সমাপন করিয়া চৈতন্যদেবের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে গুণাধর চক্রবর্তীর গৃহে
সমাগত হইলেন। গুণাধর তাঁহাদিগকে
বলিলেন, নিম্নাঞ্জন পণ্ডিত গয়া হইতে
পরম বৈষ্ণব হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন।
ইহা শ্রবণ করিয়া সকলেই যারপর নাট
প্রীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে
একত্র মিলিত হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন

* বেদান্তসারে ইহাকেই জীবমুক্ত বা
জীবিতাবস্থায় কর্মজাল সূত্র হইতে মুক্ত
বলে। বৈষ্ণবেরা বলেন ইহা প্রেম
ভক্তিতে হয়, পক্ষান্তরে বেদান্তের মতে
ইহা জ্ঞানে হয়।

+ বৈষ্ণবদিগের অনুকরণে আমরা
চৈতন্যদেবকে প্রভু অথবা মহাপ্রভু
বলিব।

আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে ষিঙ্ক-
রাজ চৈতন্য তথায় উপস্থিত হইয়া ভাগ-
বতদিগকে একত্র সমাগত দেখিয়া প্রেমে
অচেতন হইয়া পড়িলেন।

প্রভু বলে মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দঘোষের নন্দন ॥
বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রেম ও সাত্বিক ভাব
দেখিয়া মোহিত হইয়া প্রেমাবেশে অশ্রু-
জল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব-
মণ্ডলী বিদায় হইলে, শিষ্যগণ অধ্যয়ন
কবিতাে আসিল। তাহাদিগের মধ্যে
যে যে শ্লোক উচ্চারণ করিল, চৈতন্য
প্রেম-বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণপক্ষে তাহার
ব্যাখ্যা করিলেন।

দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খড়ক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে ॥
পরং ব্রহ্ম বিশ্বস্তর শব্দ মৃতিময়।
যে শব্দেতে যে বাথানে সেই সত্য হয় ॥

চৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড পৃ ১২৮।

ক্ষণেক পরে চৈতন্য বাহুজ্ঞান লাভ
করিলেন, এবং প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলেন
এজন্ত গজ্জিত হইলেন। সে দিবস
অধ্যাপনকার্য্য বন্ধ করিয়া সশিষ্যে গঙ্গা-
স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তে আত্মিক
সমাপন করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন।
শচী অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, বৎস! অদ্য কি বিষয়ের ব্যাখ্যা
করিতে ছিলে?

চৈতন্য বলিলেন—মাত! অদ্য কৃষ্ণ
নামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেছিলাম।
মাতঃ ভাগবতে লিখিত আছে—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিতত্ত্বিণ
দৃশ্যতে ।
ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং
বদেৎ ॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাঃ সুধাপগা ন সাধবো
ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ ।
ন যত্র যজ্ঞেশকথা-মহোৎসবা সুরেশ
লোকোহপি সঠৈব ন সেব্যতাং ॥
সদাঃ সদ্ভিঃপথিপুনঃ সিয়োদর কৃতো-
দ্যমৈঃ ।
আস্থিতো মরমতে যজ্ঞুরেক বিংশতি
পূর্ববৎ ॥
অনায়াসেন মরণং বিনা দৈগ্জেন জীবনং ।
অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ ॥
মাতা চণ্ডাল কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলে
চণ্ডালত্ব ‡ অতিক্রম কবে এবং বিপ্র
কৃষ্ণনামবিহীন হইলে বিপ্রত্ব হারায় ।
কালচক্র কৃষ্ণ সেবকের নিকটে যায় না ।
কৃষ্ণসেবক কৰ্ম্মজাল-স্বত্বজনিত পুনঃপুনঃ
শ্রমমুত্থর যন্ত্রণাতীত ।* কৃষ্ণভক্তি বিহীন
মমুষা স্রীম কৰ্ম্মফলে পুনর্বার গর্ভবন্ধনা
সহ করে; গর্ভে সপ্তম মাসে তাহাব

‡ “চণ্ডালোপি দ্বিষ্যশ্রেষ্ঠঃ * ”

এইরূপ শাস্ত্রবাক্য চৈতন্য এতদিনে
জীবনে পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়া
ছিলেন ।

* চৈতন্যের এই বাক্য বেদান্ত বিরোধী
বৈষ্ণবদিগের এই মূলমত ভাগবতমূলক ।
ত্রিকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন “ভক্তি
পরিভ্যাগ করিয়া যে জ্ঞানমাত্র লইয়া
বাস্ত, সে যে কৃষ্ট তত্ত্ব পরিভ্যাগ করিয়া
তুমাত্র গ্রহণ করে তাহার তুল্য ।”

জ্ঞানোদয় হয় এবং তখন বৃথা দ্বারাস্থতের
অন্য জীবনে পাপাহুষ্ঠান করিয়াছে এজন্ত
অমৃতাপ করে † কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইলেই
মারাতে সমুদয় বিস্মৃত হয়, পুনর্বার কৃষ্ণ-
বিহীন জীবন ধাপন করিয়া গর্ভবন্ধনা
সহ করে ‡

অতএব মাতঃ ।

—ভজহ কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি ।

মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি ॥

ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায় ।

চৈতন্যের মাতা ও শিষ্যবৃন্দ এইরূপ
ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক উপদেশ শ্রবণ
করিয়া তাদৃশ জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড প্রধান
সময়েও ভক্তির পক্ষপাতী হইলেন ।
এবং অনতি দীর্ঘকালে চৈতন্যের আশ্রয়
এক নবীন বেশ ধারণ করিল । অনবরত
বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন ।
কেহ বা ভাগবতাদি গ্রন্থ তাললয়যুক্ত
স্বরে উচ্চারণ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমো-
হিত করিতেছেন । কেহ বা হরিনাম
কীর্ত্তন করিতেছেন । কেহ বা প্রেম-
পুলকিত হৃদয়ে লোমাঞ্চিত শরীরে নৃত্য
করিতেছেন ।

এইরূপে বৈষ্ণবগণ ভক্তিরসে বিগলিত
হইয়া হৃদয়ের আনন্দে হরিনাম সংকীৰ্ত্তন
করিয়া কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন ।
চৈতন্য কৃষ্ণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া
তন্মগ্ন প্রাপ্ত হইলেন । সকল বস্তুতেই
কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন, সকল কথা-

† এটি পৌরাণিক মত ।

‡ চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড ।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেই অবধি নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বাক্সণী পুঙ্খরিণীতে অল আনিতে যায়; নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকাননমধ্যে দেখিতে পায়, নিত্য স্মৃতি কুমতিতে সন্ধিবিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। স্মৃতি কুমতির বিবাদ বিষম্বাদ মনুষ্যের সহনীয়; কিন্তু স্মৃতি কুমতির সত্তাব অতিশয় বিপত্তিজনক। তখন স্মৃতি কুমতির রূপ ধারণ করে, কুমতি স্মৃতির রূপ ধারণ করে। স্মৃতি কুমতির কাজ করে, কুমতি স্মৃতির কাজ করে। তখন কে স্মৃতি কে কুমতি চিনিতে পারা যায় না। লোকে স্মৃতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।

যাই হউক, কুমতি হউক স্মৃতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অঙ্ককার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অঙ্ককার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক্ আমার পুরাতন কথা তুলিয়া কাজ নাই। রোহিণী, সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে, অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইলেন।

কেন যে এতকালের পর, তাহার এ হৃদশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি

না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে যালককাল হইতে দেখিতেছে—কখন তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা২ ঘটয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি—সেই দুই কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপী-তীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অত্যাচারণ—এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না,—আমি যেমন ঘটনাতে তেমনি লিখিতেছি।

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, এক বায়েই বুঝিল যে মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘৃণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখন তাহার জায়া মাড়াইবে না। হয় ত গ্রামেব বাহিব করিয়া দিবে। কাহাণ্ড কাছে, এ কথা বলিবার নহে। বোহিণী অতি বুদ্ধে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুকায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবন ভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্ট-

দায়ক হইল। রোহিণী মনে২ রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কত লোকে যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা বাথে? আমাব বোধ হয়, বাহারা সুখী, বাহারা দুঃখী তাহাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিক সরলতার সহিত মৃত্যু কামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখ-ময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এই জন্য অনেক সুখিজনে মৃত্যু কামনা করে—আর দুঃখী, দুঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যুকে ডাকে কিন্তু কাব কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, সে মরিতে চাহে না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এদিকে, মনুষ্যের এমনি শক্তি অল্প যে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র স্ত্রীবিদ্বানে, অর্কবিন্দু ঔষধভক্ষণে, এ নশ্বব জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিশ্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে—কিন্তু আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহই ইচ্ছাপূর্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্ক বিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী তাহা পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসঙ্কল্প

হইল—হরলালের বশীভূত হইয়া গো-বিন্দলালকে দারিদ্র্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্বস্ব হরলালকে দেওয়া হইতে পারে না—জাল উইল ঢালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল—কৃষ্ণকান্তকে বলিলে কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হইল যে মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে—দেবরাজ খুলিয়া যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেখুন। বোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—যেই চুরি করুক কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন—তাহা হইলেই জাল উইল দেখিয়া নতন উইল প্রস্তুত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তির বক্ষা হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে কে উইল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ—কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবে যে ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা—তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেবরাজে যে জাল উইল আছে ইহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব অর্থলোভে রোহিণী, গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্টসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও সে খুল্যাতাতের রক্ষাহুরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল

চুরি করিয়া জাল উটল রাখিয়া আসিয়া-
ছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উটল
রাখিয়া তৎপরিবর্তে জাল উটল লইয়া
আসিবে। এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া,
রোহিণী প্রথমতঃ হবি খানসামাকে হস্ত-
গত করিল।

হবি যথাকালে কৃষ্ণকান্তের শয়ন
কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া বাথিয়া যথেষ্ট
স্থানে সুখানুসন্ধান গমন করিল। নিশীথ
কালে, বোহিণী সুন্দরী, প্রকৃত উটল
খানি লইয়া সাহসে ভব কবিতা একা-
কিনী কৃষ্ণকান্ত বায়েব গৃহাভিমুখে যাত্রা
করিলেন। খড়কী দ্বার রুদ্ধ; সদর
ফটকে যথায় দরবানেরা চারপাইয়ে
উপবেশন করিয়া, অন্ধনিমিলিত নেত্রে
অর্দ্ধ রুদ্ধকণ্ঠে, পিলু বাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ
করিতেছিলেন, রোহিণী সেইখানে উপ-
স্থিত হইল। দরবানেরা জিজ্ঞাসা
করিল, “কে তুই?” বোহিণী বলিল
“সখী।” সখী, বাটীর একজন যুবতী
চাকরানী, স্ততরাং দরবানেরা আব
কিছু বলিল না। রোহিণী নির্ঝিয়ে
গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্বক, পূর্বপরিচিত
পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেলেন—
হরির কণায় পথ সর্বত্র মুক্ত। প্রবেশ
কালে কাণ পাতিয়া রোহিণী শুনিла, যে
অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জন হই-
তেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনাশকে
উটলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।
প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দীপ নিক্ষেপিত
কবিল। পবে পূর্বমত চাৰি সংগ্রহ

করিল। এবং পূর্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য
করিয়া, দেবাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাবধান, তত অতি
কোমলগতি। তথাপি চাৰি ফিরাইতে
থট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে
কৃষ্ণকান্তের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না,
যে কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন
না—কাণ পাতিয়া রহিলেন।

বোহিণীও দেখিলেন, যে নাসিকা
গর্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। বোহিণী
বুঝিলেন কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।
রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “কে ও?” কেহ
কোন উত্তর দিল না।

সে বোহিণী আব নাই। বোহিণী
এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয়
একটু ভয় হইয়াছিল—একটু নিশ্বাসের
শব্দ হইয়াছিল। নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণ-
কান্তের কাণে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হবিকে বাব কয় ডাকিলেন।
রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলা-
ইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে
গোবিন্দলালের প্রতিকার কবা হয় না।
রোহিণী মনো ভাবিল, “দুষ্কর্মের জন্ত
সে দিন যে সাহস কবিতাছিলাম, আজি
সংকল্পের জন্য তাহা করিতে পারি না
কেন? ধরা পড়ি পড়ি।” রোহিণী
পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয়বার হরিকে ডাকিয়া
কোন উত্তর না পাইয়া উপাধানতল

হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন। শলাকালোকে দেখিলেন, গৃহমধ্যে, দেৱাজের কাছে, জীলোক।

জালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত বাতি জালিলেন। জীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তুমি কে?”

বোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে গেল। বলিল, “আমি বোহিণী।”

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, “এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি কবিতেছিলে?” বোহিণী বলিল

“চুরি করিতেছিলাম।”

কৃষ্ণ। রঙ্গ রহস্য বাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, একথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোবের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

বোহিণী বলিল, “তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি তাহা আপনার সম্মুখেই কবি, দেখুন। পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না। পলাইব না।”

এই বলিয়া বোহিণী, দেৱাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেৱাজ টানিয়া খুলিল। তাহাব ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিয়া, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে জাল উইলখানি খণ্ড করিয়া কাড়িয়া ফেলিল।

“হাঁ হাঁ ও কি ফাড়! দেখে দেখি।” বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিল কিন্তু তিনি চীৎকার করিতেই, বোহিণী সেট খণ্ডে বিচ্ছিন্ন উইল, অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, “ও কি পুড়াইলে?”

বোহিণী, “একখানি কৃত্রিম উইল।” কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, “উইল! উইল! আমার উইল কোথায়?”

বো। আপনার উইল দেৱাজের ভিতর আছে আপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, “কোন দেবতা ছলনা কবিতে আসেন নাই ত।”

কৃষ্ণকান্ত তখন দেৱাজ খুলিয়া, দেখিলেন একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চসমা বাহির করিলেন; উইলখানি পড়িয়া দেখিলেন, তাহার প্রকৃত উইল বটে। বিস্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তুমি পোড়াইলে কি?”

বো। একখানি জাল উইল।

কৃ। জাল উইল? জাল উইল কে করিল! তুমি তাহা কোথা পাইলে?

বো। কে কবিল তাহা বলিতে পারি না—তাহা আমি এই দেৱাজের মধ্যে পাইয়াছি।

কৃ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান জানি-

লে যে দেবাজের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে!

রো। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

কু। কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎ কাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষ বলিলেন,

“যদি আমি তোমার মত জীলোকের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিব তবে এ বিষয় সম্পত্তি এতকাল রক্ষা করিব কি প্রকারে! এজাল উইল হরলালের তৈয়ারি। বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে! তার পর ধবা পড়িয়া, ভয়ে জাল উইলখানি ছিড়িয়া ফেলিয়াছ? ঠিক কথা কি না?”

রো। তাহা নহে।

কু। তাহা নহে? তবে কি?

রো। “আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন।

কু। তুমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই। নহিলে এপ্রকারে চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিশে দিবনা কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া বোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজি তুমি কয়েদ থাক।

রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

বেদ ।

বেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ এবং তাহা হইতেই অম্যান্য শাস্ত্র সংকলিত হইয়াছে। বেদে আর্ষাজ্ঞাতির অটল বিশ্বাস। আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সকল কার্যই বেদমূলক। বেদ অমাত্ত করিলে হিন্দুধর্মের জীবন নাশ করা হয়, সুতরাং সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বিগণের বেদ অমাত্ত করিবার অধিকার নাই। কি জেন্দ আবেস্তা, কি বাইবেল, কি কোরাণ, পৃথিবীর সকল প্রকার ধর্মগ্রন্থ মধ্যে বেদ প্রাচীন এবং শুদ্ধ ভূমণ্ডলের একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিদেশীয়

পণ্ডিতগণ ইহার যাহার পর নাই আদর করিয়া থাকেন।

বিদ ধাতু হইতে বেদ শব্দ, এজন্য ইহার প্রাকৃতিক অর্থ জ্ঞানলাভ অথবা শ্রেরোলাভ হয় যদ্বারা তাহাকেই বেদ কহে। বেদের অপর নাম ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ—ঋক্, যজু, সাম। ঋগ্বেদে এই ৩ বেদের উল্লেখ আছে যথা—

অহে বৃদ্ধি মন্ত্রংমে গোপায়া য মৃষয়
ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুঃসি সামানি ॥

ভগবান্ মম্বু কহেন—

অগ্নিবায়ু রবিভাস্ত ত্রয়ং ব্রহ্মা সনাতনং ।

ছন্দোহ যজ্ঞ সিদ্ধার্থ মুগ্ধযজ্ঞঃ সামলক্ষণং ॥

অর্থাৎ—“তিনি (ঈশ্বর) যজ্ঞকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে সনাতন ঋক্ বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন।†

উপনিষদের সময় চারি বেদ প্রচলিত ছিল, যথা—

“তস্মৈতস্যা মহতোভূতস্য নিধসিত

মেতদ্যদৃগ্বেদো

যজুর্বেদঃ সামবেদো ঋক্সাঙ্গিরস ইত্যাদি”

অর্থাৎ

প্রস্তাবিত পরমায়া হইতে নিশ্বাস যেমন পুরুষের প্রযত্ন ব্যতীত বহির্গত হয়, সেইরূপ ঋক্, যজু, সাম, অথর্বাস্থিরস প্রভৃতি শাস্ত্রও নির্গত হইয়াছে।

পৌরাণিক কালে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব চারি বেদই প্রচলিত ছিল, এজন্য মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই চারি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদসমূহ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাঙ্ক। মন্ত্রগুলি সংহিতা বদ্ধ হইয়া আছে, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ পদ্য ও ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদের ব্যাখ্যা যথা পানিনি “ব্রাহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানম্” এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অগ্রে মন্ত্রভাগ ও তৎপরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়াছিল, কেন না ব্যাখ্যা পরেই হইয়া থাকে।

† পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক অনুবাদিত। মন্ত্র সংহিতা ১২ পৃষ্ঠা।

বেদবাক্য সকল তিন শ্রেণীভুক্ত। লৌকিক বাক্য সকল যেরূপ পদ্য, গদ্য, গীত, এই তিন প্রকার ভিত্তি চারি প্রকার নাই। বেদেও সেইরূপ পদ্য গদ্য গীত এই তিন শ্রেণীর রচনা আছে। পদ্য গুলি ঋক্, গদ্য ভাগ যজুঃ, ও গীত ভাগ সাম যথা—ঐজমিনী সূত্র “তেষা মুগ্ধযজ্ঞার্থবশেনপাদবাবস্থা” “পীতিষু সামাখ্যা” “শেষে যজুঃ শব্দঃ।” যজুর আর একটি নাম নিগদ অর্থাৎ গদ্য। অথর্ব বেদের স্বতন্ত্র কোম লক্ষণ নাই, অপর তিন বেদের কোনও অংশ লইয়া অথর্ব নামক ঋষি ইহা প্রচার করেন। এই বেদ যাগ যজ্ঞের উপকারী নহে, ইহা সাংসারিক ব্যবস্থার উপকারী “অথর্বো দেবানাং প্রথমঃ সত্বঃ” ইত্যাদি উপনিষৎ চর্চ্চা করিলে প্রতীত হইবেক।

ঐজমিনী বেদকে পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষ নির্মিত বলেন না, ঈশ্বর নির্মিতও নহে। তাঁহার মতে বেদের নির্মাতা কেহ নাই। শব্দ অর্থ ও তদ্ব্ত্তরের সম্বন্ধ (বোধ্য বোধক ভাব) নিত্য। মনুষ্যের কণ্ঠে যে শব্দ হয় তাহা ধ্বনি মাত্র, তাহার নিত্যতা নাই। ধ্বনি সকল অনিত্য। আমরা বাস্তবিক শব্দের রূপ বিশেষ আবির্ভাব করিবার জন্য ধ্বনিমাত্র করিয়া থাকি। এই ধ্বনি দেশ, কাল, পাত্র ও প্রযত্ন ভেদে, মনুষ্যের বাক্ যন্ত্রের তার-তম্যাহেতু, শব্দ প্রকাশক সঙ্কেত ধ্বনি ভিন্ন প্রকার হইয়া যায়। আমি বলি-লাম লবণ, একজন বলিল লুণ, আর

একজন ধ্বনি করিল ডুব—লক্ষ্য সকল
 লেরই এক। একজন বলিল মাতৃ,
 একজন বলিল মা, আর একজন বলিল
 “মাতারি,” অপরে বলিল “মাদান,”
 ইহাতে সকলেরই সেই ভ্রমণীবোধক শব্দ
 প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইল। এই মর্মে
 জৈমিনী মীমাংসার প্রমাণ পালে কহিয়া-
 ছেন “ঐপত্তিকস্ত শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধ
 তস্যজ্ঞানমুপদেশোহব্যতিরেকস্চার্থেচুপ-
 লভ্যে তৎপ্রমাণং বাচরায়ণস্যানপেক্ষ-
 ণং,” (১ম পাদ ৫ সূত্র) এই সূত্র হইতে
 ইহার অনন্তর ৩১ সূত্র পর্যন্ত সমুদায়
 সূত্রে শব্দ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন।
 অপিচ উক্ত প্রকার শব্দের রূপ প্রকাশ
 করিবার জন্য লোকে নানাবিধ সংকেত
 করণা করায়, লৌকিক শব্দ অনেক
 বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই লোক
 কৃত সাংকেতিক শব্দের প্রামাণ্য নাই।
 লৌকিক শব্দই পৌরুষেয়, কেন না
 পুরুষে ইহার সংকেত করিয়াছে। বৈদিক
 শব্দ কাহারও সংকেত দ্বারা স্থাপিত
 হয় নাই, কেন না উহার সংকেতকর্তা
 কেই দৃষ্ট হয় না, অত্মমিত্তও হয় না।
 “ঐবদ্যষ্টকৈ সন্নিবর্ত্য পুরুষাখ্যা (২৭
 সূত্র) “অনিত্য দর্শনাত” (২৮ সূত্র)
 আরম্ভত পুঙ্ক্তং (অর্থাৎ সমস্ততী প্রণীত)
 কঠ শাখা—কঠ নামক ঋষি প্রণীত
 শাখা, এইরূপ পৈতৃপল্লাদক, মোহন,
 প্রজ্ঞতি বেদভাগের বক্তা বিবেচনা এক
 “বহু প্রবাহী রকামমত,” “উদ্বালকি
 রকামমত,” এই সকল ব্যক্তি ঘটত

আখ্যায়িকা দেখিয়া ব্যক্তি বিশেষের
 বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত সূত্র
 দ্বারা বৈদ, পুরুষনির্মিত এবং বেদের
 বিষয় বিশেষ ও অনিত্য অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ
 ছিল, এখন নাই, এইরূপ পূর্ব পক্ষ
 করিয়া পরিশেষে “উক্ত শব্দ পূর্বতঃ
 (২৯) “আখ্যা প্রবচনাৎ” (৩০) ইত্যাদি
 সূত্রে জৈমিনী তাহা বিশ্বাসের ব্যাঘাত
 জন্মাইয়া দিয়াছেন। এই বিচারের সং-
 ক্ষেপ মর্ম্ম এই যে কঠক প্রভৃতি আখ্যায়
 কেবল কঠাধি উহা প্রথমে বা প্রাচীন
 ক্রমে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া একপ
 সমাখ্যান হইয়াছে। সাংখ্যিক কপি
 “নত্ৰিতিরপৌকষেরদ্বায়েদস্য তদর্থস্তা-
 তীত্রিরদ্বাৎ” (৫ অ ৪১ সূত্র) এই সূত্রে
 আরম্ভ করিয়া “ন পৌরুষেয়তঃ তৎ-
 কৰ্ত্ত্বঃ পুরুষস্য সম্ভবাৎ” (৫ অ ৪৬ সূত্র)
 এবং অজ্ঞাত বচন সূত্রদ্বারা নানা প্রকার
 আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত
 করিয়াছেন, যে বেদ কোন পুরুষ বৃদ্ধি
 দ্বারা নির্মাণ করে নাই, চিবকালই আছে
 —তবে কল্পান্তকালে যে ব্যক্তি প্রথম
 শরীরী হন অর্থাৎ হিরণ্যগর্ত বা ব্রহ্মা
 প্রকাশ করেন মাত্র। সুপ্ত ব্যক্তি প্রভি-
 বুদ্ধ হইলে যেমন পুরুষের তাহার জাগ-
 তিক পদার্থ ভাণ হয়, সেইরূপ বেদ
 তাহার ভাণ প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ যেমন
 শ্বাস প্রশ্বাস উচ্চারণ করিতে বৃদ্ধি বা
 বহু অপেক্ষা কবে না, সেইরূপ বেদ
 উচ্চারণ করিতেও তাহার বৃদ্ধি বা বহু
 অপেক্ষিত হয় নাই। বেদান্তও এইরূপ

বলেন। গৌতম বলেন বেদ জন্ম বটে, কিন্তু তাহা প্রমাণ অযোগ্য নহে, কেন না জন্ম প্রমাদাদি রহিত আপুৰ্ব ইহার বক্তা। “মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎ প্রামাণ্যম্” এই হুত্রাচার বেদের প্রামাণ্য পরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখান। “মন্ত্র ও আয়ুর্বেদ” গৌতম যদিও স্পষ্টাভিধানে ঈশ্বরপ্রণীত বলেন না কিন্তু গতিকে তাঁহার ঈশ্বর প্রণীত বলা হইয়াছে। তাঁহার মতে তাদৃশ আপুৰ্ব ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই। মনু প্রভৃতি ঋষিও এই নত। আন্তিক আৰ্য্য ঐহিকার দিগের মতে আপৌরুষেয় বাক্যের নাম বেদ, কেহই তাহা মনুষ্যপ্রণীত স্বীকার করেন না।

এসকল শাস্ত্রীয় তর্ক ত্যাগ করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবেক বৈদিক ঋষিগণই স্তোত্র গ্রন্থেতা। তাঁহারা ই আপনাদের অভীষ্ট সাধনের জন্য দেবতাদিগের নিকট ছন্দোযুক্ত স্তোত্র লইয়া গমন করিয়াছিলেন যথা—“অর্থ পশ্যাব ঋষয়ো দেবতাঃ ছন্দোভিরভ্যধাবন্।” বৈদিক স্তোত্রানিচয় এক সময়ের রচিত নহে, তাহা সময়ে ঋষিগণ দ্বারা এক এক অংশ রচিত হইয়াছে। বর্তমান বেদ যাহা আমরা ব্যবহার করি তেছি, ব্যাসের পূর্বে তাহা একরূপ ছিল না। পরাশর নন্দন কৃষ্ণ বৈপায়ন কুরু পাণ্ডব দিগের যুদ্ধের পর সমুদায় বেদ হুপ্রণালী বদ্ধ করিয়া প্রচার করেন, এজন্য তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে।

তিনি চারিজন শিষ্যকে চারি বেদ উপদেশ দিয়াছিলেন যথা—বহুচ নামক ঋগ্বেদ সংহিতা পৈলকে, ত্রিগদাধ্য বজ্রর্কেদ সংহিতা বৈশম্পায়নকে, ছন্দোগ নামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনীকে, এবং আজীরসী নামক অথর্ব সংহিতা হুমন্তকে, শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে “পৈল স্বীর সংহিতা দুই ভাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাঙ্কলকে করিলেন এবং বাঙ্কল তাহা চুতর্থা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অন্নিমিত্র এই চারি শিষ্যকে উপদেশ দিলেন এবং ইন্দ্র প্রমতি ও স্বীর পুত্র মাণ্ডকের ঋষিকে ও মাণ্ডকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র সৌভর্যাদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাণ্ডকেয়ের পুত্র সাকলা সেই সংহিতাকে পাঁচভাগ করিয়া বাস্য, মুদগল, শালীয়া গোথল্য, ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করিলেন এবং সাকল্যের শিষ্য জাতকর্ণ স্বীর সংহিতাকে পাঁচভাগ করিয়া নিকুন্তের সহিত বলাক, পৈল, জাবল, ও বিরজ এই চারিজনকে শিক্ষা দিলেন। পরে বাঙ্কলের পুত্র বাঙ্কলি উক্ত সর্বশাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক খানি বালখিল্য নামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং বালারনি, ভদ্রা ও কাশার এই তিন দৈত্য তাহা ধারণ করিল”† ঋগ্বেদ সংহিতার সাকলা শাখা প্রচলিত।

† পণ্ডিতবর ৮ আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশের অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত।

উহা ৮ অষ্টকে বিভক্ত এবং তাহা পুনরায় ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০৬ বর্গ আছে, তাহাতে ১০৪১৭ ঋচ দৃষ্ট হয়। অন্যামতে ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডলে এবং ১০০ শত অঙ্কবাক্যে বিভক্ত, তাহাতে ১০০০ এক সহস্র স্তুত আছে। এই সংহিতায় সর্গশ্লোক ১৫৩৮২৬ পদ বর্তমান সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শৌনক মুনিকৃত “চরণ-বৃহ” গ্রন্থানুসারে বেদের অনেক অধ্যায় এসময় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা লোপ হইয়াছে সুতরাং তাহাব উল্লেখ এখানে করা গেল না।

ঋগ্বেদেব দুই খানি ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ও শাখ্যায়ন বা কোষিতকী ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ পঞ্চিকায় বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক ৫ টী কবিতা অধ্যায় আছে। এই সমুদায় অধ্যায়ে ২৮৫ পাণ্ড আছে। শাখ্যায়ন বা কোষিতকী ব্রাহ্মণে ৩০ অধ্যায় আছে। ঋগ্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণেব টীকাকাব মাধবাচার্য্য।

যজুর্বেদ সংহিতা কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই দুই অংশে বিভক্ত। হঠাৎকৈ তৈত্তিরীয় ও বাজসেনেয়ী সংহিতা কহে। ইহাব শাখার নাম তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন ও কাষ। কৃষ্ণ যজুর্বেদেব ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয়, এবং শুক্ল যজুর্বেদেব শত পথ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ও ব্রাহ্মণেব টীকাকাব মাধবাচার্য্য এবং শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার টীকাকার মহীধর এবং উবাত, ও উহার ব্রাহ্মণেব টীকাকার শায়নাচার্য্য।

সামবেদ সংহিতা পূর্ব ও উত্তর ভাগে বিভক্ত। ইহার শাখার নাম কৌথুম এবং রান্যায়ন। সাম বেদেব ৮ খানি ব্রাহ্মণ আছে তাহার নাম যথা—প্রৌঢ় বা পঞ্চ-বিংশ, ষড়্ বিংশ, সাম বিধান ব্রাহ্মণ, আর্ষেয়, দেবতাখ্যায়, বংশ. এবং সংহিতোপনিষদ ব্রাহ্মণ।—সায়নাচার্য্য এই ৮ খানি ব্রাহ্মণেব উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তিন সামবেদের অদ্বিত ব্রাহ্মণ নামক আর একখানি ব্রাহ্মণ বর্তমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম অধ্যায় ১২ স্কন্ধে লিখিত আছে “অথর্কবিং স্মন্ত কবন্ধ নামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন, এবং কবন্ধ তাহাকে দুইভাগ কবিতা পণ্য ও বেদদর্শ সংজ্ঞক শিষ্য-দ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। বেদদর্শেব চাবিশিষ্য সৌকায়নি, ব্রহ্মাবলী, যোদোষ পিপ্পয়নি। পণ্যেব তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক, ও চাকালি ইহাবা সকলেই অথর্ক বিং। অঙ্গিবার পুত্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগ কবিতা বন্ধ ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, সৈন্ধবায়নেব শিষ্য সাবর্গি প্রভৃতিবাও পবে তাহা গ্রহণ করিলেন। পবে নক্ষত্রকল্প, শাস্তিকশ্যপ ও অঙ্গীরস প্রভৃতি সকলে অথর্কবেদেব আচার্য্য হইয়াছিলেন।” + অথর্কবেদের সৌনক শাখা মাত্র বর্তমান আছে। ইহার ২০ কাণ্ডে ৬১৫ শ্লোক প্রাপ্ত

+ শ্রীমদ্ভাগবত। ৬/অনন্দ চন্দ্র বেদান্ত বাগীশের অনুবাদিত।

হওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ব-বেদের ব্রাহ্মণ।

মহামুনি যাক্ষের নিরুক্ত অহুসারে বেদ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্ত বিরুক্ত বেদ ব্যাখ্যা বৃধ মণ্ডলীর অপাঠ্য। যাক্ষের পূর্বেও বেদ শাক্ষের নিরুক্ত বর্তমান ছিল, তাহা যাক্ষই বলিয়া গিয়াছেন যথা—“স্থলোষ্ট্রীর্বাণীকপয়তি ন মেহয়তি—ত্রিভ্য আখ্যাতোভ্যো জায়তে ইতি শাক পুনি:—উর্গনাতনামকো মুনিজুহোতি ধাতো কংপন্নো হোতৃশ বেদা মজ্জতে” স্থলোষ্ট্রীবি, শাক পুনি, উর্গনাত প্রভৃতি নিরুক্তকার যাক্ষের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। আমবা যাক্ষ মুনির নিরুক্তেব সাহায্যে নিম্নে দেবতা ও বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

ঋগ্বেদের দেবতা—প্রথমতঃ দেবতা হই শ্রেণী—যাগাক্ষ দেবতা এবং স্তোত্রাক্ষ দেবতা। স্তোত্র বা শব্দ + যাহার গুণ মাহাত্ম্যাদি বর্ণনা পূর্বক প্রশংসা করা যায়, সে সকল স্তোত্রাক্ষ দেবতা। যজ্ঞ কালে ঘৃত, মধু, দধি, পাশব মাংস প্রভৃতি যাহা দেব উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা বাগাক্ষ দেবতা। ঋক সন্নিহিত এবং যজুঃ সংহিতায় বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। ইদানীন্তন কালেও

+ স্তোত্র এবং শব্দ উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ, যে গীতের উপযুক্ত মন্ত্র দ্বারা যে স্থানে দেবতার প্রশংসা করা যায়, সেই স্থানেই স্তোত্র আর বাহা গীতের অমুপযুক্ত মন্ত্র তাহা শব্দ।

বহুতর অবৈদিক দেবতার নাম কপ মাহাত্ম্য বর্ণনা দৃষ্ট হয়, ঐ সকল দেবতা না শব্দাক্ষ না যাগাক্ষ, কেবল পূজা বা উপাসনার অহুকমজ প্রভৃতি কার্যের নিমিত্ত পৌরাণিক সময়ে কল্পিত হইয়াছে। বৈদিক দেবতার সমস্ত নাম সংগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই, কতিপয় নাম সংগ্রহ করা যাইতেছে তাহাতেই পাঠক বর্ণ বৃত্তিতে পারিবেন।

অগ্নি, + বায়ু, ঈজ বায়ু, মিত্রাবরুণ, আশ্বিন, ঐজ, বৈশ্বদেব, সাবস্বত, মরুৎ, অগ্নি বিষোব, (হুসমিদ্ধ, ইতীশ্ব, সমিদ্ধ বাগ্নি, তনুনপাং, নবাশংস, ইল, বহি দেবী, দ্বাব, উজ্যাসো, নক্তা) দেবতা, হোতৃযুগল, প্রচেতা, দ্বয়, সবস্বতী, লাভাবত্য, অষ্টা, বনস্পতি, স্বাহাকৃতি, বৃহস্পতি, মিত্রাগ্নি, পূষা, ভগ, আদিত্য (সূর্য্য বিশেষ) মরুগণ, ব্রহ্মাণস্পতি, সোম, সদ সস্পতি, নাবাশংসী, দক্ষিণা, ঋভু, সবিতা, দ্য, বিষ্ণু ‡ অপ, ইজ্রাগী,

+ “অগ্নিবৈদেবা তস্মৈত্যানি নানানি—সর্ক ইতি প্রোচ্য অচক্ষত-তব তিতি যথা বাহিক পশুমাংস্পতি রুদ্রোহিগ্নিরিতি তান্ম স্যাসক্তানি নামানি অগ্নীত্যেব সত্তাশ্বাম্ ইতি শতপথ ব্রাহ্মণ।

‡ অতো দেবা অবন্তনে যশো বিষ্ণু-বিচক্রমে পৃথিব্যা সপ্তধামতিঃ। ইদং বিদুর্বিচক্রমে ত্রেবা নিদধে পদং। সমুচ মস্য পাংসুবে। ঋকবেদঃ ১ম মণ্ডলঃ। এই স্তোত্র পৌরাণিক চতুর্ভূজ বিষ্ণু বুঝা হইতেছে না। যাক্ষ ঋষি ঠহার অর্থ করিতেছেন “বিষ্ণুঃ আদিত্যঃ কথমিতি

পৃথিবী, অম্বারী, বরুণানী, বৈষ্ণবী, প্রজা-
পতি, উলুখল, মৃষল, হরিশ্চন্দ্র, অধিধ্বন,
উষঃকাল ইত্যাদি অনেক দেবদেবী আছে ।
এই সকল দেবদেবীর জ্যোত্ৰ মধুচ্ছল,
বিশ্বামিত্র, জেতা, মেধাভিধি, শুনশেষপ,
হিরণ্য স্তূপ, সব্য, গোতম, অঙ্গিরস,
প্রজ্ঞস্ব, কষ, (ঘোর ঋষির পুত্র) কুৎস,
প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক গায়ত্রী, উচ্চিক,
অমৃক্ষুপ, ত্রিষ্ণুপ, জগতী, অমৃজোবৃহতী,
প্রস্তার-পংক্তি, প্রভৃতি চন্দ্র গ্রথিত হই-
য়াছে । ঋকবেদের একটা স্তোত্র নিয়ে
অমৃবাদ করিয়া দিলাম ।

ইন্দ্র ।

১

আকাশের জ্যোতি—ভীম বজ্রধর ।
মহামতি ইন্দ্র সর্ক গুণাকর !
তব স্তুতিচয় মোরা নিরন্তর
মধুব স্তব্ধে করিব গান ।
কোমল, মধুর, নবীন গাথার
মাহাতে দেবের মানস ভুলার,
—সহজে যুড়ায় তাপিত প্রাণ ।

২

এস ২ দেব ছাড়াই সুর পূব
শুনিতে এহেন সঙ্গীত মধুব
যে সঙ্গীতে শোক, তাপ হয় দূর—

বগাৱহঃ ত্রিধা নিধায় পদং নিধন্তে পদং
নিধানং প ।”

এহেন সঙ্গীত কর শ্রবণ ।
শুভ্রময় অত্রি উৎসেয় সমান
বিমল আনন্দ করিব গ্রহান—
শুন—করষোড়ে করি বন্দন ।

৩

স্বর্ণময় রথে করি আরোহণ
এস ২ ইন্দ্র এমর্ত্য ভবন
করুক সারথি রথ সঞ্চালন
বেগে বজ্রনাদে বিমান পথে ।
ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে সুরবালা দলে
বিস্ময় উৎফুল্ল লোচনে সকলে,
হেরিবে তোমায় স্তব্ধ রথে ।

৪

বসো দর্ভাসনে লও উপহার
অন্ন বাজনাদি বিবিধ প্রকার
গন্ধ দ্রব্য নানা—সোম—সুধাধার—
(দেবের দুর্লভ অপূর্ণ ধন)
করষোড়ে মোরা তোমারে আহ্বান,
করিতেছি শুনি এই স্তবগান
বিপক্ষের ভয় কর ভঞ্জন ।

৫

অতীব কাতরে আমরা এখন
লয়েছি তোমার চরণে সুরণ
কর দেব কর অতীষ্ট সাধন
সুধা-সোম রস করিয়া পাণ ।
জয় ২ দেব বজ্রনাদ কর
বিপক্ষের ভয় আমাদের হর—
তব যশ মোরা করিব গান ।



কালিদাসের উপমা।

রঘুর পুল অজ, ঠিক পিতার মত
হইলেন।

রূপং তদোজস্বি তদেব বীৰ্য্যং
তদেব নৈসর্গিক মুগতত্বম্।
ন কারণাং স্বাবিভিদে কুমানঃ
প্রবর্তিতোদীপইব প্রদীপাং ॥

সেই উজ্জ্বল রূপ, বীৰ্য্যও সেই,
নৈসর্গিক উন্নতত্বও সেই, প্রদীপ চত্বিতে
উৎপাদিত প্রদীপের ন্যায় কুমান পিতা
হইতে কোন প্রকারে ভিন্ন নহে।

ইন্দুমতী স্বয়ম্বরে, দৌবারিকী ইন্দু-
মতীকে এক রাজার নিকট হইতে অন্য
রাজার কাছে লইয়া যাইতেছে।

তাং সৈব বেজগ্রহণে নিযুক্তা
রাজাস্তরং রাজস্বতাং নিনায়।
সমীরণোথৈব তবঙ্গলেপা
পদ্মাস্তরং মানসরাজহংসী ॥

সেই বেত্র গ্রহণে নিযুক্তা (দৌবারিকী)
ইন্দুমতীকে সমীরণে উথিত তরঙ্গলেখা
যেমন মানস রাজ হংসীকে পদ্মাস্তরে
লইয়া যায় তদ্রূপ অস্ত্র রাজার কাছে
লইয়া গেল।

সেবার সুনন্দা ইন্দুমতীকে অঙ্গেশ্বরের
নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচয়
দিতে লাগিলেন।

অনেন পর্য্যায়তাক্ষবিন্দু
মুক্তফলমূলতমান্ব স্তনেষু।
প্রতাপিতাঃ শক্রবিলাসিনীনা
মুদ্রাস্থা স্বত্রৈণ বিণের হারাঃ

ইনি শত্রুবিলাসিনী দেগেন স্তনে মুক্তা-
ফলবৎ মূলতম অক্ষবিন্দু সকল পাতিত
করিয়াছেন। যেন তাহাদের মুক্তাহার
কাড়িয়া লইয়া স্বত্রবিনা প্রত্যাৰ্পণ কৰি-
য়াছেন।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে যে রাজার কাছে
লইয়া যান, ইন্দুমতী তাহাকেই পরিত্যাগ
করিয়া যান।

সঞ্চারিণী দীপশিখৈব রাজ্যো
যং যং বাতীয়ায় পতিষরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপ্রেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥

কেহ রাজ্যকালে প্রদীপ হস্তে রাজ-
পথস্থিত প্রাসাদাবলীর নিকট দিয়া
যাইলে তখনকার প্রদীপের সহিত ইন্দু-
মতীর তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন।

রাজ্যকালে সঞ্চারিণী দীপশিখা রাজ-
মার্গস্থিত অট্টালিকার নিকট দিয়া গমন
করিলে পরে সেই অট্টালিকা যেমন স্নান
দেখায়, পতিষরা ইন্দুমতী যে বে রাজ্যকে
অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন, সেই সেই
রাজ্য তদ্রূপ বিবর্ণভাব ধারণ করিলেন।

পরে ইন্দুমতীর সহিত অজের পরিণয়
হইলে, তাহারা অযোধ্যাগমন করিলেন।
কালক্রমে ইন্দুমতীর মৃত্যু সময় উপস্থিত।
রাজা অজ এবং রাজ্ঞী ইন্দুমতী পুশো-
দ্যানে বিহার করিতেছিলেন। এমন
কালে দেবর্ষি নারদ দক্ষিণ সমুদ্র তীরে
বীণাবদ্রবোধে মহাদেবের স্তুতিগান ক-

করিতে গমন করিতেছিলেন। স্বর্গীয়
কুসুমদামে তাঁহার বীণাবস্ত্র শোভিত
ছিল। দৈবাৎ পবন চালিত হইয়া সেই
দ্বিবা মালা বীণাহইতে স্থলিত হইয়া
ইন্দুমতীর স্তনাগ্রভাগে পতিত হইল।
সেই মালাঘাতই ইন্দুমতীর মৃত্যুর কারণ
হইল।

ক্ষণমাত্র সখীঃ স্নজাতয়োঃ

স্তনয়ো স্তন্যবলোকা বিহ্বলা।

নিমিষমীল নবোত্তমপ্রিয়া

স্ততচক্সা তমসেব কৌমুদী ॥

সুন্দর স্তন যুগলেব ক্ষণমাত্র সখী
সেই মালা দৃষ্ট করিয়া বিহ্বলা বাক্যহীন
রাত্ৰগন্ত চক্সকিরণের তায় নিমীলিত
হইলেন।

বপুষা করণোজ্জ্বলিতেন সা

নিপতস্তী পতিমপাপাতয়ৎ।

নমু তৈল নিষেক বিন্দুনা

সহ দীপ্তার্চি রূপৈতি মেদিনীঃ ॥

ইন্দুমতীর ইন্দ্রিয়চেষ্টাশূন্য শরীর প-
তিত হইল এবং স্বামীকেও পাতিত
করিল। প্রদীপ্ত দীপশিখায় নিবিক্ত
তৈলবিন্দু দীপ্তার্চি সহিতই ভূতলে পতিত
হইয়া থাকে।

ইন্দুমতীর মৃতদেহ অজের ক্রোড়ে পতিত
রহিয়াছে।

পতি রক্তনিষ্প্রয়া তয়া

করণাপায় বিভিন্ন বর্ণয়া।

সমলক্ষ্যাত বিভ্রদাবিলাং

মৃগলেখা মৃষসীব চক্সমা ॥

প্রাণবিনাশ হেতু স্নান, ক্রোড়স্থিত সেই
ইন্দুমতী কর্তৃক অজ উষাকালে স্নান

মৃগচ্ছিদারী চক্সেরন্যায় দৃষ্ট হইয়াছি-
লেন।

অজ ইন্দুমতীজন্য বিলাপ করিতে ২
বলিতেছেন।

অথবা মৃদুবস্ত্র হিংসিতুং

মৃদুনৈবাবভতে প্রজ্ঞাস্তকঃ।

হিমষেক বিপত্তি রত্নমে

নলিনী পূর্ব নিদর্শনং মতা ॥

অথবা প্রজ্ঞানাশক কাল কোমল বস্ত্র
হিংসাজন্য কোমল বস্ত্রই অবধারিত করি
য়াছেন। হিমপাতে বিনশ্বব কমলই
আমার পক্ষে ইহাব প্রথমোদাহরণ।

অথবা মমভাগ্য বিপ্রবাং

দশনিঃ ক্লিত এষ বেধসা।

বদনেন তকর্ণপাতিতঃ

কপিতা তদ্বিটপাশ্রয়ালতা ॥

কিধা আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বিধাতা
এই পুঙ্খমালাকেই বজ্র কল্পনা করিয়া-
ছেন। যে হেতু এই বজ্রহার আশ্রয়
বৃক্ষ পাতিত হইল না কিন্তু তদাশ্রিতা
লতা বিনষ্টা হইল।

ইদমুচ্ছসিতালকং মুখং

তব বিশ্রান্তকথং হুনোতি মাং।

নিশি স্তপ্ত মিবেকপঙ্কজং

বিরতাভ্যন্তর যটপদম্বনং ॥

বায়বশে অলকাগুঞ্জিন চালিত হই-
তেছে অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ
রাত্রিকালে প্রমুদিত স্তব্বাং অভ্যন্তরে
ভ্রমর গুঞ্জনরহিত একটি পদ্মের ন্যায়
আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

ক্রমশঃ

বেদ।

পূর্ব প্রকাশিতের পর।

জৈমিনির মতে দেবতা নামক কোনও জৈব পদার্থ নাই। “ইজ্র” এই শব্দই দেবতা। তন্নিম্ন “ইজ্র” এই শব্দের অর্থ সহস্রাঙ্কাদি যুক্ত কোন জীব নাই। যাগ কালেব দ্রব্য ত্যাগের উদ্দেশ্যে ভূত দেবতার “ইজ্রায় স্বাহা” এই মন্ত্র মাত্র। মীমাংসা দর্শনের যষ্ঠাধ্যায়ে ইহার একপ্রকার বিচার করা হইয়াছে। “ফলার্থত্বাৎ কৰ্মণঃ শাস্তং সৰ্বাধিকারং ভ্রাতৃ” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দেবতাদিগের যাগযজ্ঞ করার অধিকার নাই, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দেবতাদিগের কোন প্রকার বিগ্রহ নাই। এই অংশে জৈমিনী যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বলা বাইতেছে। যুত প্রভৃতি দ্রব্য যেমন যাগের একটি অঙ্গ, দেবতাও তদ্রূপ একটি যাগের অঙ্গ। যাগকালে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে হয়, যদি দেবতা শরীরী হন, তবে তাঁহাদিগের আগমনকালে যজ্ঞমানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, আর যদি তাঁহারা মহিমা বলে অশ্বাদির অপ্রত্যক্ষ হইয়া অবস্থান করেন এমত হয়, তথাপি এক সময়ে বহু লোক যাগ করিতেছে এবং সকলেই এককালে আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার অন্যত্র গমন অসম্ভব এবং শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে সর্বত্রই অধিষ্ঠান থাকা

উচিত কিম্ব তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, আর যদি মন্ত্রই দেবতা হয়, তবে যে যে স্থলে যাগ করুক না কেন, “ইজ্রায় স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যজ্ঞ সিদ্ধি হইবেক। “বজ্র হস্তো পুরন্দরঃ” ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্য সকল স্ততিবাক্য মাত্র। জৈমিনি এইরূপ দেবতা ও যজ্ঞ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহা আধুনিক কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, এজন্য গ্রহণ করিলাম না।

সোমলতার উল্লেখ বেদমধ্যে বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ সোমের স্তুতি করিয়াছেন, তাহার রস স্বয়ং পান করিয়াছেন ও দেবতাগণকে অর্পণ করত পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। বেদে লিখিত আছে সোমলতার রস তৃপ্তিকর, হর্ষজনক এবং অতি মধুর। সোমলতা ‡ পার্শ্বতীয় লতা বিশেষ। সামবেদীয় ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণে এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে, যে, সোমলতা পৃথিবীমধ্যে আর উৎপন্ন হয় না, এজন্য সোম যাগ প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবেক। এক্ষণে পুন্য প্রভৃতি স্থান হইতে যে সোমলতা আনীত হয় তাহা বৈদিক কালের প্রকৃত সোমলতা নহে কিম্ব সেই জাতীয় বটে। সংস্কৃত

‡ *Asclepias acida*.

বিদ্যাবিশারদ হৌগ সাহেব এই সত্যর
আম্বাদ অতীত তিষ্ঠ, তুর্গকবৃত্ত এবং
মন্ত্যাকারক লিখিয়াছেন + কিন্তু বেদে
ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া
থাকে। তাহাতে লিখিত আছে সোম-
লতার রস স্মিট, মাদক ও অত্যন্ত
হর্ষজনক যথা ঋগেদ—“যৎসালোঃ সালু
মাক্ষহংতুর্থা স্পষ্ট কত্বং। তদিক্সোহর্থ
চেতন্তি যুথেন বৃষ্টি বেজতি।”

যৎকালে যজমান সকল সোমবল্লী
আহরণের নিমিত্ত এক পর্ত্তশিখর হই-
তে শিখরান্তরে আরোহণ করেন, তখনই
তাহাদিগেব সোম-যাগ আবৃত্ত কবা হয়।
ইঙ্গ তৎকালে গজমানেব প্রয়োজন বৃষ্টি-
য়া তাঁহাদেব যজ্ঞস্থলে আগমন করেন।
“প্রবো মিয়ন্ত ইদং বোমৎসয়া মাদ-

স্মিফবঃ।

দ্রুপা মধশচ মৃবদঃ।” (১ম, ১৬ ব, ৪
অম্বুবাক ১৪ হুক্ত)

হে ইঙ্গ আদি দেবগণ! আপনাদেব
নিমিত্ত উৎকৃষ্টরূপে সোম সম্পাদন করা
হইতেছে, ইহা অত্যন্ত তৃপ্তিকর, হর্ষের
হেতু, বিম্বু করিয়া নিকাসিত, অতি
মধুর এবং চমৎ অর্থাৎ পাত্রবিশেষে অব-
স্থিত আছে। পুনশ্চ “অশ্বিনৌ পিততঃ
মধু” অর্থাৎ হে অশ্বিনী কুমার মধু-মাধুর্য্য
গুণবিশিষ্ট সোম পান কব। এইরূপ
সর্বজাই বেদে সোমের মিষ্টতা বর্ণনা
আছে, বিশেষ ১৯ বর্গ সোমস্বক্ত নামক
ঋক্ সম্বন্ধে, সোমের মিষ্টাস্বাদ বর্ণনা করা

† Ait. Br. vol. II, p. 439.

হইয়াছে। সোমের রস দুগ্ধের ন্যায় ও
গাঢ় যথা “সন্তে পর্যাংসি সমুচক্স বাজা”
অর্থাৎ হে সোম! তোমার পূর্ক্কোক্ত গুণ
যুক্ত পর অর্থাৎ ক্ষীর সকল তোমাকেই
প্রাপ্ত হউক। ইহাব বর্গ সম্বন্ধে এই
মাত্র উক্ত হইয়াছে “রাজোহুতে বরুণস্ত
ব্রতানি বৃহস্পাতনং তব সোম ধাম—”
অর্থাৎ হে সোম! তুমি রাজমান বরুণের
ন্যায়, তোমার তেজ অতি বিস্তীর্ণ এবং
গান্ধীর্ঘ্যযুক্ত। ইহাতে এই মাত্র অনুভব
হইতেছে যে সোমের বর্ণ জলের ন্যায়
শুদ্ধ। সোমলতার আকার পুতিকা +
(পুই শাকের মত) লতার সদৃশ হইবার
সম্ভাবনা, কেন না সোমলতার অভাবে
পুতিকা লতার বিধান আছে—“সাদৃশ্তে
প্রতিনিধিঃ” শাস্ত্রকাবেবা কোন বস্তুর
অভাব হইলে তৎসদৃশ বস্তুস্তরের গ্রহণ
বিধান করিয়াছেন। সোমাত্তাবে পুতিকা
বিদি যথা—

“সোমাত্তাবে পুতিকানভিযুহুয়াৎ”

(শ্রুতিঃ)

ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে
সোমাত্তাব স্থলে পুতিকা বিধানের অনেক
বাক্য আছে।

সোমতত্ত্ব অর্থাৎ অভ্যস্তরে আঁশযুক্ত লতা
বর্ণা—

আপ্যার স্বমলিতম সোম বিখেতিবংগুভিঃ।
ভরানঃ স্ত্রুশ বস্তমঃ সখাবুধে।

(১৪ অ. ১৯ হুক্ত)

† Guilandina Bonduc.

অর্থাৎ অতিশয় মদযুক্ত সোম! তুমি তোমার সমুদায় তত্ত্ব দ্বারা আমাদেরকে আপ্যায়িত কর।

সোমরসের বিবিধ গুণের মধ্যে পুষ্টি-কারিতা ও রোগ নাশকত্ব গুণ আছে যথা—

“গয়ঙ্কানো অমিহা বস্ত্রবিংপুষ্টিবর্দ্ধনঃ”

(১৪ অ, ২১ হৃ)

অর্থাৎ হে সোম! তুমি ধনের বৃদ্ধি করী, রোগ সমূহের নাশক, শরীর ও মনের পুষ্টিকারক।

আর্য কালের ঋষিগণই সোমলতা প্রকাশ করেন যথা—

“হং সোম প্রচিকিতো মনীষতঃ বজ্রিষা
মহুনেষি পথাং”

অর্থাৎ হে সোম! তুমি আমাদের বৃদ্ধি দ্বারা পবিজ্ঞাত হইয়াছ।

সোমরস কণ্ডন দ্বারা অর্থাৎ কুটিয়া অভিস্রব অর্থাৎ নিষ্কাশন করা হইত। ইহা রাশিবার পাত্রকে চমু করে। এই পাত্র কাষ্ঠ বা গোচর্ম্ম নিশ্চিত হইত। উহার বস উঠাইবার পাত্র পৃথক, তাহার নাম গ্রহ।

ঋগ্বেদে পুরুষা যযাতি প্রভৃতি রাজা-দিগের নাম পাওয়া যায় যথা “মহুযা দগ্নে ঋত্নিরশ্বদাঙ্গিযো যযাতি বৎসদনে পূর্ব্ববচ্ছুভে।”

বেদের সংহিতা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে অনেক রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের আখ্যায়িকা আছে, তাহাকে পুরাণ বলা

যায়; * ইহা ভিন্ন বৈদিক কালে অন্য পুরাণ ছিল না। তবে মহাভারত, রামায়ণ অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি বেদভ্রষ্টারী অর্থাৎ অনেকাংশের অবলম্বন পীঠ বেদ। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সচিব কাশীর পণ্ডিতগণের তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলো তিনি বৈদিক আখ্যায়িকাই পুরাণ বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি স্বতন্ত্র পুরাণ মান্য করেন নাই।

ভাষা পার্থিব অবস্থা, মহুযাগণের প্রকৃতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমুদায় পরিবর্তনশীল। সুতরাং সহ-জেই এটরূপ উপলব্ধি হয় যে, এখন আমবা যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, অতি পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। কিরূপ ছিল, তাহাও নিরূপণ করা যায় না। তবে কি না পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলে অনির্কটনীর আয়োদ উপস্থিত হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ নিরূপণ করিতে ইচ্ছা হয়।

অমুসংস্কৃত বিষয় বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ ৪টি বিভাগ স্থির করা গেল। ভাষা (১) পার্থিব অবস্থা (২) জীবপ্রকৃতি (৩) তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতি (৪) ইহার স্পষ্টতার জন্য ৪টি কালেরও উল্লেখ হউক—বৈদিক কাল (১) আর্যকাল (২) আচাৰ্য্যকাল (৩) পরাভূত কাল (৪) যে কালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল প্রচারিত হয়, তাহাই বৈদিককালের লক্ষ্য।

* “ঋচঃ সামানি চন্দ্রাংসি পুশাণং বজ্রযা সহ” অথর্ক বেদ।

আৰ্ধকালের লক্ষ্য মধ্যকাল, (অর্থাৎ যে সময় স্মৃতি ও নানাবিধ পুরাণ প্রকটিত হয়।) এই আৰ্ধকাল ও পরাভূত কাল এতদুভয়ের অন্তরাল কালকে আচার্য্য কাল বলিয়া জানিতে হইবে। পরাভূত-কাল, বর্তমান কাল ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা গেল। এই ৪টা কালের সহিত উপরোক্ত ৪টা বিষয়ের প্রত্যেক সম্বন্ধ থাকিবে।

এক্কেণে বৈদিক কালের ভাষাসম্বন্ধে লেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা সংস্কৃত। তন্নিম্ন অন্য ভাষাও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আদিমকালেও ছিল কিনা? অমু-সন্ধান করিলে ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। সংস্কৃতের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য ভাষা কিরূপ আকারে ছিল, তাহা বুঝা যায় না। বৈদিক গ্রন্থ সকল পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভিন্ন ভাষান্তরেরও প্রচার ছিল, এবং তাহা এক্কেণকার ন্যায় শ্রেণীবিশেষে বিভিন্ন আকারে ছিল। দেবতার। কিম্বা আর্ধ্যের। যাহাকে “গৌ” বলিতেন; তৎকালে অমুরের। তাহাকে “গাবী” “গোনী” “গোপোংলী” ইত্যাদি বলিত। তাহার। শব্দদিগকে “হে অরয়!” বলিয়া সম্বোধন করিতেন, অমুরের। “হে লয়” বলিয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিত। যাহারা আদিমকালের অমুর, তাহারাই মধ্য কালের স্নেহ। কেন না, মহর্ষি জৈমিনি

“চোদিতত্ত্ব প্রতীয়েত অবিরোধাৎ প্রমা-
ণেন” ইত্যাদি সূত্রদ্বারা স্নেহ সাংকে-
তিক পদার্থকেও যজ্ঞ কার্য্যে গ্রহণ করিতে
উপদেশ দিয়া পুরোক্ত আঙ্গুরিক বাক্যকে
স্নেহ বাক্য বলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন।
“পিক” “নেম” “সত” “তামবম”
প্রভৃতি অনেক গুলি শব্দ এক্কেণে সংস্কৃত
ভাষামধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ
সকল শব্দ সংস্কৃতই নহে। ঐ সকল
শব্দ ততৎ অর্থে পূর্বকালের অমুরের।
বা স্নেহর।ই ব্যবহার করিত। তাহার।
কোকিলকে “পিক,” নামকে ও অর্ধ
ভাগকে “নেম,” পদকে “তাম রস”
বলিত। সংহিতা গ্রন্থে যাহাদিগকে
অমুর বলা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহা-
দিগকে স্নেহ বলা হয়, তদুপে স্নেহ ও
অমুর একপ্রকার অবস্থায়িত বলিতে
হইবে। তবে “স্নেহ” এই নামান্তর
হইবার অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।
পুরাকালেও এক্কেণকার ন্যায় সাধারণ
ব্যবহার্য্য ভাষান্তর ছিল, তাহার আর
সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, “তেহমুরা-
হেলয় হেলয় ইতি, কুর্কুঃ পরাবভুব তস্মা-
ব্রাহ্মণেন ন স্নেহিত বৈ নাগভাষিত
বৈ স্নেছোহবা যদেব অপশব্দঃ” ইত্যাদি
ব্রাহ্মণ বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়,
যাহারা অমুর, তাহারাই স্নেহ এবং
সংস্কৃত ভিন্ন নানাপ্রকার অপশব্দ ছিল।
“না যজ্জিয়াং বাচং বদেৎ” ইত্যাদি মন্ত্র
কাণ্ডে ও যজ্ঞকালে অপশব্দ বলিতে
নিষেধ থাকাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ী-

ভূত হইতেছে। অতএব সংস্কৃত ভিন্ন অন্য প্রকার ভাবাও ছিল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদের অথবা তৎসমজাতীয় গ্রন্থের সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পারি না। তাহার কয়েকটা নিগূঢ় কারণ আছে। প্রথমতঃ বর্তমান কালের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন বেদের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন নয়। (ব্যাকরণই বেদবাক্য অমুসারে রচিত যেহেতু ব্যাকরণ বেদের অনেক পরে) দ্বিতীয়তঃ বাক্যের আকার সংস্থান একক কার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। তৃতীয়তঃ পূর্বে যে সকল শব্দ দ্বারা যে সকল বস্তুকে বুঝাইবার প্রথা ছিল, এক্ষণে আর সেই সকল শব্দদ্বারা সেই সকল বস্তু বুঝান হয় না এবং শব্দ সকলের সম্বন্ধ ঘটনা একক কার রীতি বহির্ভূত। মনে করুন—“সত্যং তেষা অমবস্ত ধ্বক্ষিদা রুদ্রিয়াসঃ। মিহ কুবন্ত বাতাঃ।” (ঋগ্বেদের ১ অং, ১ম অষ্টক, ১ম, ২৮ শ্লোক, ৭ শব্দ) এই শব্দ পাঠ মাত্রে বোধ হয় কেহই বুঝিবেন না, না বুঝিবার অন্য কিছু কারণ নাই, কেবল ঐ সকল শব্দ ও ঐকপ রীতি আমরা কখন অমুভব করি নাই। “সত্যং” এই শব্দটা আমরা ব্যবহার করি—উহা বুঝা গেল। তৎপরে “তেষা” বুঝিলাম না। আমাদের বুদ্ধি—এবা এইরূপ গ্রহণ করিতেই প্রথমতঃ ধাবিত হইবে, কিন্তু তাহা নহে। আমরা যেরূপ স্থলে “ভিব্” শব্দের ব্যবহার করি—তেমনি স্থলে “তেষা” শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। “তেষা”

ঐ ভিব্, শব্দই। “অমবস্তঃ” অম শব্দে বল বুঝায়। “অম” এটী বনের একটা নাম, তাহা আমবা আবু শুনিতে পাই না সুতরাং বুঝিতেও পারি না। “ধ্ব-ক্ষিদা” “ধ্বব্” মক্ষ্ভূমি “চিৎ” প্রায়শঃ। ইহা বুঝিলেও বুঝা যায় বটে কিন্তু “চিদা” এই চিৎ শব্দের পরে আকার থাকিতেই গোলযোগ। ঐ আকারটির সহিত “অবাতাং” শব্দের সম্বন্ধ। আ অবাতাং। আ সমস্তাং। এইরূপ অর্থ হইবে। ইত্যাদি পূর্বে ব্যাকরণে ছিল না।

“বৃহস্পতি রিদ্ভায় দিবাং বর্ষসহস্রং প্রতি পদোক্তানি শব্দানাং শব্দ পারায়ণং প্রোবাচনাস্তং জগাম।” এই বেদবাক্য দ্বারা প্রতীতি হয় যে, পূর্বকালে চীম দেশীয় বর্ণমালার ন্যায় একটা একটা করিয়া শব্দরাশি শিখিয়া গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে হইত। কিছুকাল পরে কিঞ্চিৎ কৌশল সম্পন্ন প্রণালী নিবদ্ধ হইল—অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাতন, এই ৪ জাতি শব্দ। “চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো-২ম্য পাদা দে শীর্ষে সপ্ত হস্তা সোহসা। ত্রিধা বক্ষো বৃষভো বার বীতি মহো দেবো মর্ত্যাং আবিবেশ।” শব্দ সমূহের পার প্রাপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি স্থনিয়ম সংস্থাপিত হইলে উক্ত রূপক বাক্যটা লোকে আনন্দের সহিত পাঠ করিয়া-ছিল। বৈয়াকরণিক বস্তুগুলিকে উহাতে বৃষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, এই ৪ প্রকার

পদসমূহ ঐ বৃষের শব্দ। ৩টি কাল তাহার পদ। সুপ ও তিঙ তাহার মস্তক। ৭টি বিভক্তি তাহার হস্ত। উরঃ কর্ণ ও মূৰ্দ্ধা এই তিন স্থানে ঐ সমুদয় গ্রথিত। এই বৃষ জগতে আবির্ভাব হইবামাত্র শব্দ কার্য্য রব কবিয়া উঠিল। যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহা নানা প্রকার নামে খ্যাত হইল। কিছু কাল পবেই ব্যাকবণ জন্মে। ব্যাকবণ বলিলে যে পানিনি ব্যাকবণ বুঝিব তাহা নহে, কেন না, পানিনি পূৰ্ব পূৰ্ব আচার্য্যাদিগের মত প্রকাশ কবিয়াছেন, এবং “ব্যাকরণ” এষ্ট নামও পানিনি ব্যাকবণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বর্তমান ব্যাকবণ, বর্তমান নিরুক্ত গ্রন্থ, বর্তমান কোষ গ্রন্থ, এ সকলের পূৰ্বেও ঐ ঐ জাতীয় গ্রন্থ ছিল। পানিনি যেমন পূৰ্ব ব্যাকরণের উল্লেখ কবিয়াছেন, নিরুক্তকার যাক্ষ মুনিও অন্য নিরুক্তের উল্লেখ কবিয়াছেন। মেদিনী প্রভৃতি কোষ গ্রন্থের পক্ষে “বৃহৎপলিনী” “উৎপলিনী” প্রভৃতি কোষ গ্রন্থ ছিল, ঐ সকল এখন আর পাওয়া যায় না। “ব্রাহ্মণ সৰ্বস্ব” প্রভৃতি বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থে ঐ সকল প্রাচীন কোষ চর্চাত শব্দ পর্য্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব পানিনিাদি সম্পূর্ণ আদিম আচার্য্য নাহন। বৈদিকগ্রন্থে বলের নাম ২৮ সংগ্রামের নাম ৪৬ অপত্যের নাম ১৫, বাক্যের নাম ৫৭ ধনের নাম ২৮ ইত্যাদি দেখা যায়। সে সকল নাম এক্ষণে আর

বাবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না। আদিম কালের কোন বস্তুর নাম ১০ ছিল, এক্ষণে তাহার ২০০ নাম দেখা যায়। আবার কোন বস্তুর নাম ৫০টি ছিল এখন ৫টীও নাট, এতদূর বিপর্য্য ঘটয়াছে। কতকগুলি শব্দ আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান চলিয়া আসিতেছে। যথা—গো, অশ্ব ইত্যাদি। কতকগুলি স্লেচ্ছ শব্দ সাধারণে চলিত আছে। স্লেচ্ছ শব্দ শুনিলে সাধারণে মনে কবে পাবসী কি ইংরাজী, বস্তৃতঃ তাহা নহে। যুধিষ্ঠিরকে বিহুর স্লেচ্ছ ভাষায় গুপ্ত জতুগৃহেব কথা বলিয়াছিলেন, এই কথার সাধারণে মনে করে বিহুর ও যুধিষ্ঠির পাবসী জানিতেন, উহা ভ্রম।

ফল স্লেচ্ছভাষা সম্বন্ধে যেকপ আৰ্য্য শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে এই কপ অর্থ দাঁড়ায় যে স্লেচ্ছভাষা আব কিছু নহে, কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বৈষা-কবণিক সম্বন্ধহীন ভাষাই স্লেচ্ছ ভাষা। স্লেচ্ছ ভাষাসম্বন্ধে এইকপ নির্ণয় আছে।

শুদ্ধ ভাষা তিন প্রকারে রূপান্তর হইয়া স্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন স্থলে বর্ণাধিক্য বশতঃ কোথাও বর্ণবিপর্য্য বশতঃ কোথাও বা বর্ণলোপ বশতঃ—স্থল বিশেষে বর্ণ স্বরাদি বিকৃত হইয়া স্লেচ্ছ ভাষা নামে প্রচলিত হইয়া যায়। কাশ্মীর পথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থে উক্তপ্রকার ভাষার ভূরি২ প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকাদিতে যেমন ভদ্র ও ইতর লোকের কথাবার্তা বিভিন্ন,

তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থেও দেবতাদিগের ও
অন্য মন্ত্রদিগের কথাবার্তা বিভিন্ন।
কায় শত পথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্র অন্তরদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন “ইমাং চিত্রাখ্যাঃ
মদীরা মিষ্টকামুপধাস্যে”—তোমাদিগের
নিমিত্ত আমি এই আমাব টিষ্টকা অগ্নিতে
নিক্ষেপ করি। অন্তরের উত্তর করিল
“উপহি” এটা উপধেহি হইলে শুদ্ধ
হইত কিন্তু বর্ণ লোপ হওয়াতে তাহা না
হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে।
এইরূপ “তেহস্রবা হেলয় ইতি বদন্তঃ
পর্যবভূবঃ” এস্থলে “হেলয়” এই শব্দেব
স্থানে দেবতাবা বা আর্যেরা “তেহস্রবঃ”
প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে বর্ণ বিপ-
র্যাসানুসারী ম্লেচ্ছভাষা জানিতে হইবেক।

এইরূপ বৈদিক ভাষার আলোচনা
কবিলেও বৈদিককাল নিরূপণ করা সহজ
ব্যাপার নহে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ
এক সময়ে রচিত হয় নাই। বিভিন্ন
সময়ে বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছে।
পণ্ডিতবর হৌগ সাহেব অনুমান করেন
বেদের সংহিতা ২৪০০ হইতে ২০০০ খৃষ্ট
জন্মগ্রহণের পূর্বেও ব্রাহ্মণ ভাগ ১২০০
খৃঃ পূঃ রচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দে পূর্বে বৈদিক-
মন্ত্রের বক্তা বুঝাইত, এক্ষণে সূত্রধারী
ব্রাহ্মণ যেমন এক জাতি হইয়াছে, পূর্বে
সে রূপ ছিল না। যাহারা যজ্ঞন যাজ্ঞন
অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ব্যবসারে নিযুক্ত
থাকিতেন, এবং ধর্মের প্রচার করিতেন,
তাহারাই ব্রাহ্মণ নামে বাচ্য হইতেন, পরে

ক্রমে উহা পুত্র পৌত্রাদির একটি ব্যবসা
অনুসারে ব্রাহ্মণ এক জাতি হইয়া উঠি
যাছে। ব্রাহ্মণগণের বৈদিককাল হইতেই
শিখা রাখা প্রসিদ্ধ কিন্তু সে সময় “তর-
মুজ্জিব বোটা সম টাকিশোভে শিরে”
ছিল না, তাহা শাস্ত্রানুসারে মন্তকের
অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া থাকিত, এট
শাস্ত্রীয় টাকির নাম “বেড়ী।” ইহা ভিন্ন
বংশ অনুসারে ভিন্ন প্রকার শিখা বাগার
পদ্ধতি ছিল যথা—

দক্ষিণ কপর্দা বাশিষ্ঠা আত্রেয়াদি

কপর্দিনঃ।

আঙ্গিবসঃ পঞ্চচূড়া মুণ্ডা ভগবঃ

শিখিনোহন্যে ॥

এইরূপ শিখা রাখা কেবল টুপী বা
পাগড়ীর প্রতিনিধি। বৈদিককালে টুপী
বা পাগড়ী বন্ধন করিতে হইত, তাহা না
করিলে লোকসমাজে নিন্দা কবিত যথা
—মহর্ষি আপস্তম্ব কহিয়াছেন “নসমা
বৃত্তাবপেষু বন্যএ বীহারাদিতোকে।
অথাপি ব্রাহ্মণঃ এষ রিক্তোবাণপিত্তস্ত-
স্যেব তদেব পিধানং যচ্ছিমোঃ” অর্থাৎ
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মন্তক মুণ্ডন কবিবে না,
কেন না গৃহস্থ ব্যক্তি মন্তক আবরণ শূন্য
হইলে, সে লোকের নিকট তুচ্ছ হয়।
এজন্য যে ব্যক্তি শিখা রাখে তাহার
শিখাই ঐ আবরণ স্থানীয়।

বৈদিককালের আর্যোবা কৃষিকারী
ছিলেন, তাহারা কৃষিকার্যেই বিশেষ মূখ
অনুভব কবিতেন। বেদের মধ্যে গ্রাম
ও চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরের উল্লেখ

আছে। ত্রাঙ্গপগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যজ্ঞবেদী
ঠেঠকে নির্মিত হইত, ইহাতে বোধ হয়
গহাদিও ঠেঠকুদ্বারা নির্মিত হইত; আদিম
কালে অল্পবয়সী অসভ্যজাতি দৌরাভ্যা
করিত এবং আর্ঘ্যগণ তাহাদিগকে দমন
করিবার জন্য সর্ষদা যুদ্ধ করিতেন, আব
কোনও সময়ে কোন উপায় না দেখিয়া
দেবতাদিগের নিকট তাহাদের দমনের
জন্ম প্রার্থনা করিতেন। বাজাব দ্বারা
গ্রামাদি শাসিত হইত, ভাব্য প্রভৃতি
বাজাব উল্লেখ আছে। সে সময়
আর্ঘ্যজাতির বীহি (ধ'গ্র) যব, মাষকলাই
তিল, ওষধি (শস্য) বীজ (লতা) কবন্ত
(ফল) (“বীহি মথো যব মথো মাস
মথোস্তিলঃ”) প্রধান আহারের দ্রব্য ছিল
সময়েও তাঁহা অপূর্ণ অর্থাৎ পিষ্টক
এবং যজ্ঞকার্য্য ভিন্নও মেঘ, মহিষ, গো
প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিতেন।

সোম রস এবং বিবিধ প্রকার সুরার
সে সময় অত্যন্ত ব্যবহার ছিল এবং সুরা
বিক্রেতাবও অভাব ছিল না। অথেষ

মধ্যে আর্ঘ্যজাতির মান্য প্রকার ব্যব-
সার উল্লেখ আছে। অধিকাংশ লো-
কেই ব্যবসা কার্য্য দ্বারা জীবন যাত্রা
নির্ব্বাহ করিত। আদিম কালে মহুঘোর
আয়ু ১০০ বৎসরের অধিক ছিল না।
মহু বলেন সত্য যুগে মহুঘোর আয়ু ৫০০
বৎসব, ত্রেতার ৩০০ বৎসর, দ্বাপর ২০০
বৎসর কলিতে ১০০ বৎসর; এমতল
কল্পনা যাত্র; কেন না বেদে দেখা যায়
পুরুষের আয়ু শত বৎসর—“যন্তে শতা-
ক্ষবা ভবন্তি শতায়ুঃ পুরুষঃ—” পুনশ্চ
ঋক মন্ত্রে—দেখা যায় আর্ঘ্যগণ প্রার্থনা
করিতেন “জীবেমঃ শরদঃ শতম্, অ-
র্থ্যং আমি যেন শত বৎসর জীবিত
থাকি এবং আশীর্বাদ করিবার সময়েও
বলিতেন “দাতা শতং জীবতু,—দাতা
শত বর্ষ জীবিত থাকুন। ইত্যাদি। আর্ঘ্য
জাতির আচাব ব্যবহার সম্বন্ধে পুনরায়
লেখনী ধারণ করিবার ইচ্ছা আছে,
এজন্য তৎসম্বন্ধে এস্থলে বাচল্য আলো-
চনা কবিলাম না।

শ্রীবাম দাস সেন।—

গঙ্গা স্তব ।

ভাগীরথী উপকূলে,আছি গো সকল ভুলো,
ছাড়ি দেও মোরে কলিকাতা।
তোমার স্মরণ হ'লে,অঙ্গ মোর জাব জলে,
গঙ্গে তুমি নিস্তারিণী মাতা ॥
পরমা প্রকৃতি ভূমি,তোমা-কূল পূণ্য ভূমি,
পাপ যায় তোমা দরশনে।

তাজিব বখন শ্রোণ, পাঁদপদ্মে দিও স্থান,
তোমা কূলে কি ভয় করণে ॥
লক্ষী ত্যজিয়াছে বদে,তুমি ত্যজ নাই গঙ্গে
তুমি মাতঃ অগতির গতি।
সন্তান স্নেহের লাগি, দারুণ দুঃখের ভাগী,
বন্দি কৈল কলির ভূপতি ॥

মোখারি তোমার কুলে, তরুরাজি হেলে ছলে,
 দেবালয় শোভে জরাজীর্ণ।
 ঘাটে ঘাটে বিজগণ, তপ জপে নিমগন,
 হুই সন্ধ্যা লোকে লোকাকীর্ণ ॥
 কীরেক পশ্চাৎ ফিরি, ঘাটে নামে ধীরি ধীরি,
 কুলবালা সলজ্জ বদনে।
 কাম করি কেশ খাড়ে, হেলায় কদম্ব কাড়ে,
 আড়ে আড়ে চাহে কত জনে ॥
 চরণে কদম্ব সলি, যুবতী গেল ত চলি,
 পদচিহ্ন রছিল বা পড়ি।
 পশত শত মনো আলি, বিরহ অনলে জলি,
 জ্বাছে যাক্ষ ধ্বংসে গড়াগড়ি ॥
 ক্রিকাক্ষ হতেছে পিছু, জানিতে যদি গোকিছু
 কোন্ প্রাণে না চাহিতে ফিরি।
 ভূকরও ভক্তিমাটি, মরণ বাঁচন কাটি,
 হুই হাসি বিষের মিছরি ॥
 এসব থাকে না আর, কলে কলে একাকার,
 হুইরাছে গঙ্গাব ধ্বংস।
 গজ্জানি ফৌসানি আর, কালো ধূম উদগার,
 দশদিক্ কবিল আঁধার ॥
 এই ত গঙ্গার কুলে, মহোচ্চ পাদপমূলে,
 বসিয়াছি পূর্ণে এক কালে।
 ও পারে জলিল দীপ, যেন কনকের টিপ,
 ঠৈলজার ভূক অন্তরালে ॥
 সন্ধ্যা ঘুনাইয়া এল, নীল অম্বরের তেলো,
 ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল।
 কুটির যতেক তরী, সট্ সট্ সট্ করি,
 জ্বলি চলিতে আরম্ভিল ॥
 সে যে শনিবার রাজি, যত কুটিরাল যাত্রী,
 ছয় দিনে যাপে ছয় বর্ষ।
 পাইরে স্বপ্নের রাতি, বেড়েছে বুকেন্দ্র ছাতি,
 ধরার ধরে না আর স্বর্ষ ॥

দিব্য তাম্রমান ছাড়ি, সুখে যাইতেছে বাড়ি,
 দাঁড় পড়ে রপাস্ রপাস্।
 মনের বেগের কাছে, নৌকাবেগ কোথা আছে,
 হাঁকে মাঝি “সাবাস সাবাস ॥”
 যাত্রীর গীত।
 ওই যে দাঁড়ারে রাই তোমার স্ত্রাম
 চাঁদ। ওই সে অধরে হাসি মদন ব্যাধের
 ফাঁদ ॥ আমাপানে কেন ফেরো, আপন
 সম্মুখে হের, প্রেমের বরিষা-নদে সাজে না
 লাজের বাঁধ ॥ এমন নহে ত কাঁলা,
 হাতে লয়ে ফুল-মালা আসিতেছে দেখ
 অই ঘটাইতে পরমাদ ॥
 ওদিকে মেঘের ঘটা, এ দিকে বিজলি
 ছটা মিলনে কি হয় শোভা দেখিতে
 গিয়াছে সাধ ॥
 এসকল গীত গানে, আর শুনিবনা কানে,
 ফুরায়েছে সুখের বসন্ত।
 জিনিষে করাল কাল, এসেছে কলের কাল,
 গীত-স্বরে পড়েছে হসন্ত ॥
 অমিত্র অক্ষর ছন্দ, রসের কপাট বন্ধ,
 করিয়াছে কবিত্ব-কাননে।
 অমিত্রের কবাস্বাভে, গেল দেশ অধঃপাতে,
 হাসি নাই ভাবের আননে ॥
 এতক হুশিস্তা যত, সকল করিব হত,
 হুই বেলা গঙ্গামান করি।
 সেবিলে তোমার গঙ্গে, বল পাই ক্ষীণ অঙ্গে,
 যনোহুৎ সকল পাসরি ॥
 তোমার সলিলে নাবি, পৃথিবীকে স্বর্গ ভাবি,
 এমন শীতল কর দেহ।
 তোমার কুলেতে আমি, পোহাই দিবসবাসী
 নীন বিজে এই ভিক্ষা দেহ ॥

ভারতমহিলা ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে হই শ্রেণীর জীলোকের উল্লেখ করা গিয়াছে। যাহারা কোনরূপ প্রলোভনে না পড়িয়া উত্তম রূপে আপনাদিগের কর্তব্যাকর্মে সমাধা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের চরিত্র প্রথমতঃ বর্ণনীয়। আর যাহারা নানারূপ প্রলোভনে পড়িয়াও আপন কর্তব্যাকর্মে অহুমান্য অনাস্তা প্রদর্শন করেন নাই তাঁহাবাই সর্বপ্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদের চরিত্র অপব এক অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে স্ত্রীচরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। সেটা প্রধানতঃ স্মৃতিশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে তাদৃশ নারীচরিত্রের কয়েকটা উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে। স্মৃতি মধ্যে ঋষিবা উদাহরণ স্বরূপে একটিও জীলোকের নামোল্লেখ করেন নাই। স্মৃতির প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ, প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত এবং পুরাণাবলি হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষি রাক্ষসীকি ও বেদব্যাস;— পরাশর, অত্রি প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের সমকালবর্তী। সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রন্থেই স্মৃতিসম্মত উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়।

পুরাণ অনেক পনের লেখা; পুরাণ রচনা সময়ে আখ্যগণের সে তেজস্বিতা ও লেখক চরিত্রের ঔন্মত্য ছিল না। পুরাণ স্বল্প আচার ব্যবহার প্রকাশেই অধিক পটু। ঋষিরা যেখানে বলিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্য করিবে, পুরাণ সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের যত নিয়ম পাইলেন তাহা ত দিলেনই, তাহার পর আবার কতকগুলি লৌকিক আচারও তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। শুদ্ধ তাহাতেই তৃপ্ত নহেন কঠোর ব্রতধারী ব্রহ্মচারীর বৈশেষিক চরিত্র (Idiosyncrasy) ও তাহার মধ্যে দিয়া ভয়ানক করিয়া তুলিলেন। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের টীকা করিতে গিয়া স্বল্পপুরাণে বৈধব্য আচরণ যে কিরূপ শোচনীয় ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, যাহারা সে পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। পতিসেবা ঋষিদিগের ব্যবস্থা, পুরাণ তাহার বিশেষ করিতে গিয়া, যে কত আগুড়ম বাগুড়ম লিখিয়াছেন তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক এস্থলে আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ নারীগণের চরিত্র নির্ণয়ে আবৃত্ত হইলাম। ইহাদিগের মধ্যে প্রাচীন পুরুষী (মেট্রন) অধিক। কয়েকটা পতিপ্রাণা যুবতীও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা আছেন। পুরাণমতে জীলোক, প্রকৃতির অংশ, সদ্গুণাধিকা প্রকৃতি হইতে সাক্ষী

দিগের উৎপত্তি । রজোগুণাঙ্গিকা হইতে ভোগ্যাদিগের এবং তমোগুণাঙ্গিকা হইতে কুলটাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে । *শেষোক্ত দুই শ্রেণীর দ্বীলোক আমাদের বর্ণনীয় নহে । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে কতকগুলি প্রধান প্রকৃতির* নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । যথা সৃষ্টি ক্ষমা প্রকৃতি অদ্বিতি প্রভৃতির নামোন্মেষের পর নারায়ণ বলিতেছেন—

উপযুক্তঃ সৃষ্টিবিধৌ এতাস্ত প্রকৃতেঃ

কলাঃ ।

কলাচান্যাঃ সন্তি বহ্বাঃ তান্ কশ্চি

দিশাময় ॥

- ১ । রোহিণী চতুর্পদীচ
- ২ । সংজ্ঞা সূর্য্যাস্য কামিনী ।
- ৩ । শতরূপা মনোভার্যা
- ৪ । বলিষ্ঠতাপ্যরুদ্রতী ॥
- ৫ । অহল্যা গৌতমস্তী চা
- ৬ । প্যমুহুয়াজিকামিনী ।
- ৭ । দেবহুতি কর্দমস্ত
- ৮ । প্রসুতী দক্ষকামিনী ॥
- ৯ । পিতৃণাং মানসী কৃষ্ণা মেনকা

সান্বিকাপ্রসূঃ ।

- ১০ । লোপামুদ্রা তথাহুতী ১১
- ১২ । কুবেরকামিনী তথা ॥
- ১৩ । বরুণানী যমদ্বীচ ১৪
- ১৫ । বলেবিকাবলীতিচ ।
- ১৬ । কুন্তী চ দময়ন্তী চ ১৭

* ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড—
১ম ও ২য় অধ্যায় ।

(১) কালিকাপুরাণ (২) বিষ্ণুপুরাণ (৩) শ্রীমদ্ভাগবত (৪) কালিকাপুরাণ ও রামায়ণ (৫) (৬) রামায়ণ (৭) ভাগবত (৮) (৯) কালিকাপুরাণ (১০) কাশীখণ্ড (১১)

১৮ । যশোদা দেবকী তথা ॥ ১৯

২০ । গান্ধারী দ্রৌপদী শোভা

২১ । সাবিত্রী সত্যবৎপ্রিয়া ২২

২৩ । বৃকতাহুপ্রিয়া সান্বী

২৪ । রাধামাতা কলাবতী ॥

২৫ । মন্দোদরী চ কৌশল্যা ২৬

২৭ । সূতদ্রা কৈটভী তথা ২৮

২৯ । রেবতী সত্যভামা চ ৩০

৩১ । কালিন্দী লক্ষ্মণা তথা ॥ ৩২

৩৩ । জাম্ববতী বায়জিতী ৩৪

৩৫ । মিত্রাবিন্দা তথাপরা ।

৩৬ । লক্ষ্মাচ কল্মশী ৩৭ সীতা

৩৮ । বরং লক্ষ্মী প্রকীর্ণিতা ॥

৩৯ । কলা বোজন গন্ধাচ

৪০ । ব্যাসমাতা মহাসতী ।

৪১ । বাণপুত্রী তথোষাচ

৪২ । চিত্রলেখা চ তৎসখী ॥

৪৩ । প্রভাবতী ভাহুমতী ৪৪

৪৫ । তথা মায়াবতী সতী ।

৪৬ । রেণুকা চ ভৃগোম্মাতা

৪৭ । হলিমাতাচ রোহিণী ॥

উপরি উক্ত গণনায় সকল সান্বী দিগেব নামোন্মেষ নাই কারণ শ্রীবৎস পত্নী চিত্রা, শকুন্তলা, ও বালীরাজমহিষী তারা প্রভৃতি অনেকের নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না । আর উহাতে দেবতা ও মানুষীর কোন ইতর বিশেষ নাই । এবং প্রকৃতিখণ্ডে ইহাদের সক-

মহাভারত (১২) রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড

* (১৫) ভাগবত ও রামায়ণ (১৬) (১৭) মহাভারত ।

লের চরিত্র বর্ণনাও নাই। এ প্রস্তাবে ইহাদের কয়েক জনের মাত্র জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইবে এবং তিন বা চারি জনের বিস্তৃত জীবনী সংগৃহীত হইবে।

অহল্যা। পোস্তমের পত্নী অহল্যা। তিনি পতিপ্রাণা ও সকল বিষয়ে পতি নিদেশানুগামিনী ছিলেন। ইনি যেক্রমে ইন্দ্রের প্রলোভনে পতিত হইলেন তাহা আমাদের দেশে আবলবুদ্ধবণিতা সকলেই অবগত আছেন। গৌতম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আত্মপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থ বর্ণনা করিলেন। গৌতম বহুকাল উঁহাকে কষ্ট দিয়া পরে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ কারের পর উঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি উঁহার নাম প্রাতঃ-স্মরণীয়াদিগের মধ্যে প্রথম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেকে বলেন কি আশ্চর্য্য প্রাতঃকালে যে কয়েকটা স্ত্রী লোকের নাম করিতে হয় সকল কয়েকটিই ব্যভিচারিণী। কিন্তু তাঁহাদিগের বৃথিব্য ভুল। পুরাণ কর্তাদিগের ভ্রায় বাধা বাধি করিতে গেলে সব আল্গা হইয়া পড়ে। মনুষ্য-স্বভাব দুর্ব্বল, প্রলোভন হইতে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। একবার এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া একেবারে তাঁহার রাশীকৃত সদগুণ বিস্মৃত হওয়া কি ন্যায়ানুগত কার্য্য? বিশেষতঃ অহল্যাদির সোমোদ্ধারের পর তাঁহারা অতি সাধু আচারে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম করিলে এইমাত্র বোধ

হয় যে যদি মন বিচলিত থাকে কোন কারণ বশতঃ পাপে পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধার সম্ভাবনা আছে। কেহ বৃথিতে না পারিয়া অথবা হঠাৎ কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করা করিয়া উৎপীড়ন করিলে তাহার পাপ প্রবৃত্তি দৃঢ়ীভূত করা হয় মাত্র।

লোপামুদ্রা। পৌরাণিক ঋষিরা স্ত্রী লোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে কাশীখণ্ডীয় লোপামুদ্রা চরিত্র পাঠ করা কর্তব্য। এজন্য আমরা এই উপাখ্যানটী সন্নিবৃত্ত অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ঋষিরা নৈমিষারণ্যে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মাত্র অন্যান্য ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন “হে মুনে তোমার তপোলক্ষ্মী আছে—তোমার ব্রহ্মতত্ত্ব আছে, তোমার পুণ্যলক্ষ্মী আছে এবং তোমার মনের গুদার্য্য আছে। এই পতিব্রতা কল্যাণী সুধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা তোমার অঙ্গচ্ছায়া তুল্যা। ইহার কথা অন্যকে পবিত্র করে। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনুশুয়া, মাণ্ডিত্য, সতী, খ্যাতরূপা, লক্ষ্মী, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা প্রভৃতির ন্যায় ইনিও অতীব পতিপ্রাণা। কিন্তু ইহাকে যেমন শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা আছে এমন আর কাহারও নাই। তুমি ভোজন করিলে ইনি ভোজন করেন, বসিলে উপবেশন করেন, নিদ্রা-

গত হইলে নিজাগতা হইলেন এবং তোমার
অগ্রে শয্যা ত্যাগ করেন। পাছে
তোমার আয়ু হ্রাস হয় এই ভয়ে কখন
তোমার নাম তিনি গ্রহণ করেন না;
পুরুষান্তরের নামও কখন মুখে আনেন
না। তুমি তাঁহাকে আকর্ষণ করিলে তিনি
চীৎকার করেন না। তাড়না করিলে
বরং প্রেরণা হন। এই কর্ম কর বলিলে
শুৎকণাং তাক্স সম্পাদন করিয়া, স্বামিন্
ক্ষমা কর বলিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করেন।
তুমি আহ্বান করিলে গৃহকার্য্য ত্যাগ
করিয়া সত্বর গমন করেন এবং বলেন,
মাথ! কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন।
দ্বারদেশে অধিকক্ষণ থাকেন না। সর্বদা
দ্বারে গমন করেন না তুমি আজ্ঞা না
করিলে কাহাকেও কিছু দেন না, তুমি
বলিবার অগ্রে সমস্ত পূজার উপকরণ
সংগ্রহ করেন। অসুস্থিভাবে অতি হুট
হইয়া বথাসময়ে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া
সমস্ত সামগ্রী তোমার নিকট উপস্থিত
করেন। স্বামীর উচ্ছিষ্ট ফলমূলাদি
ভোজন কবেন। পতিদত্ত সামগ্রী মহা-
প্রসাদ বলিয়া হুটচিতে গ্রহণ করেন।
দেবতা অতিথি পবিবারবর্গ গো ও
ভিক্ষুগণকে না দিয়া কিছুই ভক্ষণ করেন
না। সর্বদা তৈজস পাত্রে পরিষ্কার
রাখেন। সকল কর্ম্মেই দক্ষা। সর্বদা
হুটচিত্তা ও ব্যয়পরাক্রমী। তোমাকে
না বলিয়া ইনি কখন উপবাসাদি ব্রতা-
চরণ করেন না। তোমার অসুজ্ঞাব্যতীত

সমাজ ও উৎসব দর্শন ইনি দূর হইতে
পরিত্যাগ করেন। বিবাহ প্রেক্ষণাদি
এবং তীর্থ যাত্রাদিতে তোমার অনুমতি
বিনা প্রবৃত্ত হইলেন না। তুমি যখন
সুখে নিদ্রা যাও বা সুখে উপবেশন
করিয়া থাক বা ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া কর
তখন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও তিনি
তোমাকে কিছু বলেন না। স্ত্রীধর্ম্মিণী
হইয়া জিরাঞ্জি স্বামীকে আপন মুখ দেখান
না এবং যাবৎ স্নান করিয়া না শুদ্ধ
হইলেন তাবৎ আপনার বাক্যও শ্রবণ
করান না। (মূলে অনেক ক্ষণ হইতে
আব লটের ব্যবহার নাই এক্ষণে বিধি-
লিঙেব ব্যবহার উঠিয়াছে। ক্রমে লোপা-
মূত্রার সকল কথাই লোপ হইয়া যাইবে
ক্ৰীচরিত্রের নিয়ম উঠিবে। সহস্রবর্ষের
প্রশংসা উঠিবে। এইরূপে এক কথা
কহিতে অন্য কথা উত্থাপন করা পুরাণ
রচনার এক মহদোষ। কবি গায়কেরাও
এইরূপ এক কথা কহিতে অন্য কথা
পাড়িয়া ফেলে।) স্নান করিবাব পর ভর্তৃ-
বদন মাত্র দর্শন করিবে আর কাহারও
মুখ দেখিবে না। যদি স্বামী নিকটে
না থাকেন মনে তঁাহারই ধ্যান করিবে।
পতিব্রতা নারী হরিদ্রা কুঙ্কুম সিন্দুরাদি
মাল্য আভরণ কখন ত্যাগ করিবে
না করিলে স্বামীর আয়ু হ্রাস হইবে।
রজকী হেতুকী আশ্রমত্যাগিনীর সহিত
সাক্ষী কখন বহুতা করিবে না। যে
স্বামীর দ্বেষ করে তাহার মুখদর্শন করিতে
নাই। কোন স্থানে একাকিনী থাকিতে

নাই। নয় হইয়া কোথাও স্নান করিতে নাই। উদ্ধখল খুসল বর্ষণী প্রসূরদেহলী যন্ত্রক প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ যে যে স্থলে অনেক ছুটী স্ত্রীলোক সংগ্রহ হইবার সম্ভা বনা সে সকল স্থলে সাম্রী উপবেশন করিতে নাই। স্বামীর সহিত প্রগলভতা করিতে নাই। যে যে দ্রব্যে স্বামীর অভি রুচি সেই সেই দ্রব্যেই সর্বদা প্রেমবতী হইবেন। স্ত্রীলোকদিগের এই এক যজ্ঞ এই এক ব্রত এবং এই এক দেবপূজা যে স্বামীর বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী স্ত্রী হউন ছরবহু হউন ব্যাধিত হউন বৃদ্ধ হউন সুস্থিত হউন বা দুঃস্থিত হউন তাঁহার বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী হুট হইলে জুট হইবেন বিষয় হইলে বিষয় হইবেন। সম্পৎ ও বিপদ উভয় সময়েই একরূপ হইবেন। ঘৃত, লবণ তৈলাদি ফুরাইয়া গেলেও স্বামীকে নাই একরূপ বলিবে না। এবং তাঁহাকে আয়াসকর কার্যে নিযুক্ত করিবে না। তীর্থ স্নানের ইচ্ছা হইলে স্বামীর পাদোদক পান করিবেন। স্ত্রীর পক্ষে স্বামী শঙ্কর বা বিষ্ণু সকল হইতেই অধিক। যিনি স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন ব্রতোপবাসাদি করেন তিনি স্বামীর আশু ণাশ করেন এবং মরিয়া নবক গমন করেন। ডাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধান্বিতা হইয়া উত্তর দেয় সে যদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে তবে কুকুরী হয় এবং বনে জন্মগ্রহণ করে তবে শূণ্যনী হয়। স্ত্রীলোকের এই ধর্ম যে স্বামীর চরণ সেবা করিয়া আহা

করিবে। কখন উচ্চ আসনে বসিবে না পরের বাটী যাইবে না লজ্জাকর বাক্য ব্যবহার করিবে না। কাহারও অপবাদ করিবে না। দূর হইতে কলহ ত্যাগ করিবে। যে আপন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গোপনে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে সে বৃক্ষকোটর বাসিনী উলুকা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে তাড়িত হইয়া স্বয়ং তাড়ন করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যাভী হয়।” এইরূপ নানা প্রকার শাস্তি ও রূপান্তর বর্ণনা করিয়া পরে যিনি আবার আরম্ভ করিতেছেন, “দূর হইতে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া যে নারী ভরিত গমনে জল, খাদ্য, আসন তাহুল ব্যঞ্জন পাদসং- বাহনা ও চাটু বচন দ্বারা প্রিয়ের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে সেই স্ত্রীলোকা জয় করিয়াছে। পিতা অন্ন পরিমাণে দেন দ্রাতাও অন্ন পরিমাণে দেন পুত্রও অন্ন পরিমাণে দেন স্বামী যাহা দেন তাহার পরিমাণ নাই, অতএব এমন স্বামীকে কে না পূজা করিবে? স্বামী দেবতা, গুরু, তীর্থ, ধর্ম ও ক্রিয়া। অতএব সকল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবা করিবে। জীবহীন দেহ যেমন অণুটি হয় স্বামি- হীন স্ত্রীও সেইরূপ অণুটি। সকল অমঙ্গল অপেক্ষা বিধবা অধিক অমঙ্গল। বিধবাকে দেখিলে কখন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। মাতা ভিন্ন অন্য বিধবার আশীর্ব্বাদ আশীর্ব্বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।” ইহা পর বিধবার নিম্ন সহস্রণের প্রাঙ্গ সা ও হৃদয় বিদারিণী বৈধব্য যন্ত্রণার

বর্ণনা। তাহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। পুনশ্চ “গৃহে কি রূপলাবণ্যসম্পন্ন গর্ভিতা রমণী নাই? তথাপি কেবল বিশ্ব্বয়ে ভক্তি থাকিলেই পতিব্রতা নারী লাভ হয় যাহার গৃহে পতিব্রতা রমণী আছে সেই গৃহস্থ।” ইত্যাদি।

লোপামুদ্রার চরিত্র অতি বিস্তৃত ও নির্মূল এবং তাঁহাকে এই শ্রেণীর কামিনী গণের আদর্শ স্বরূপ বলিয়া গণনা করা যায়। তাঁহা অপেক্ষা অনেক গুণবতী রমণী এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্প গুণবিশিষ্টাও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু তিনিই আদর্শ (Type) তাঁহার চরিত্র রামায়ণেও আছে। যেমন পুণ্যশ্লোক শকটী যুধিষ্ঠিরাদি কয়েকটি ভাগ্যবানের বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে সেইরূপ যশস্বিনী লোপামুদ্রার বিশেষণ।

এস্থলে পুরাণ ও স্মৃতিকথিত জীলোকের চরিত্রগত ভেদ প্রদর্শন করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্মৃতি, যত পারেন, অধিক গুণ থাকিলেই প্রশংসা করিয়াছেন, পুরাণ গুণ অধিক চান না। একটা বা দুইটা গুণ সম্পূর্ণরূপে থাকিলেই প্রশংসা করেন। স্মৃতি অনেক দূর ক্ষমা করেন। পুরাণ চূর্নসা য়নি, তাঁহার ক্ষমা নাই। যদি একটুকু ব্যত্যয় হইল, যদি একদিন রাগ করিয়া স্বামীকে মুখ করিলেন অমনি তাঁহার সহস্র গুণ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। পুণ্যের বলে যদি

গ্রামে জন্মিলেন কুকুরী হইলেন। না হয় ত শূণালী হইলেন। পুরাণের বাধাবোধ অনেক অধিক। সামাজিক অবস্থাগত যে কত প্রতীক তাহা এই কয় পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অধীনতা বৃদ্ধি হইয়াছে। অবরোধ প্রায়ই মুসলমানদিগের ভায় হইয়া উঠিয়াছে। জীলোকের স্বামীর সখিত্ব আর নাই এখন কেবল মাত্র দাসীত্ব হইয়াছে।

মহাভারতীয় শকুন্তলা।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান তৎকালীন জীচরিত্রের একটি উদাহরণ। ঋষিপালিতা শকুন্তলা রাজার দর্শনাবধি তাঁহার প্রণয় পাশে বদ্ধ হইলেন। রাজাও গাজকর্ষ বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। রাজার গুণসে তাঁহার এক পুত্র হইল। রাজা কিন্তু রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুন্তলার কোন সংবাদ লইলেন না। শকুন্তলা পাঁচবৎসর সহ্য করিয়া তাহার পর সম্ভান ক্রোড়ে রাজার বাটাতে উপস্থিত হইলেন। রাজা শকুন্তলাকে চিনিলেন কিন্তু ছুটুতা করিয়া কহিলেন তুই কুলটা আমি তোকে কখন চিনি না। শকুন্তলা তখন রাজাকে আত্মপূর্ব্বিক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিলেন। যে প্রত্যারণা করিতে বসিয়াছে তাহাতে তাহার স্মরণ কেন হইবে! শকুন্তলা তখন রাজাকে মিথ্যা কথা কহার কতক গুলি দোষ দেখাইয়া দিলেন এবং একরূপ সাহসের সহিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে

সভাহু তাবৎ লোকেই তাঁহার কথার বিশ্বাস করিল। রাজাও শেষ তাঁহাকে আপন ধর্মপত্নী বলিয়া স্বীকার করিলেন। আর প্রতারণা করিতে পারিলেন না। মহাভারত ও রামায়ণে সাধবীকীগণের এরূপ অপূর্ণ সাহস দেখা যায় যে তাহা পাঠকরিলে তৎকালীন রমণীকুলের চরিত্র অতি উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। শকুন্তলা, দেবযানী, দ্রৌপদী, সীতা সকলেই সাহস সহকারে স্বামীর সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন এবং ছুঁ লোক দিগকে ভৎসনা করিয়াছেন। এরূপ সাহস দৃষণ্য নহে বরং ইহাকে একটা গুণের মধ্যে গণনা করা উচিত। আমার চক্ষিতে পাশ স্পর্শ নাই এবং পাশে আমার মন নাই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই ও রূপ সাহস জন্মে। মহাভারতে পাতি ত্রতোপাখ্যান বলিয়া একটী অধ্যায় আছে। ক্রীলোকের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাহার যে কিরূপ সাহস হইত উহাতে তাহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। পতিত্রতোপাখ্যান দেখ।

সারিজী। প্রসঙ্গে আমরা এই শ্রেণীর সর্বপ্রধান রমণীর চরিত্রবর্ণনা করিব। তাঁহার নাম সারিজী। ইনি অশ্বপতি রাজার কন্যা। মহারাজা অশ্বপতি কন্যাকে বিবাহের উপযুক্তবয়স্ক দেখিয়া বলিলেন, সারিজী! তোমার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে অতএব তুমি আমার এই বিশ্বস্ত সারথির সহিত গমন কর। তুমি

যাহাকে আপন পতিদে বরণ করিলে তাহারই সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি ইহাতে লজ্জিত হইও না, ইহাই অগম্যোক্ত বিধি, এবং এই রূপেই অনেক রমণী অতিলাভিত পতিলাভ করিয়াছে। সারিজী সেই সারথির সহিত নানাদেশ পরিভ্রমণ করতঃ রাজ্যভ্রষ্ট হ্যামৎসেনের পুত্র সত্যবান্কে তপোবন মধ্যে দেখিতে পাইলেন। হ্যামৎসেনের শত্রুরা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার চক্ষুঃ উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। সত্যবানের শুল্লের পরিচয় পাইয়া সারিজী তাঁহাকে গমনে স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ আসিয়া অশ্বপতি রাজাকে কহিলেন তোমার কন্যা সত্যবান্কে বিবাহ করিবার জন্ত মনন করিয়াছে। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই উহার মৃত্যু হইবে। শুনিয়া অশ্বপতি কন্যাকে বিস্তর বুঝাইলেন যে তুমি সত্যবান্কে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত পতি অন্বেষণ কর। ভগ্নম স্থিরপ্রতিজ্ঞা সারিজী বলিলেন।

দীর্ঘাবুরথবায়ুঃ সঙ্কণোমিঞ্চ গোহথবা।
সকৃদতোমরাতর্তা ন দ্বিতীয়ং যুগোমাহং॥
সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎসকৃৎ॥

তখন রাজা কন্যার মন ঈঙ্গিতার্থে স্থিরনিশ্চয় জানিয়া সত্যবানের সহিত বিবাহ দিলেন। সারিজী কামমোহাবাক্যে এক বৎসরের ও তপোবনগত গুরুজনের সেবায় তৎপর হইলেন। এবং নিরন্তর

স্বপ্নেবায় নিযুক্ত রহিলেন। সর্বদা প্রার্থনা হয় সত্যবানের মৃত্যু না হউক, না হয় স্বয়ং উহার অনুমৃত্যু হউন। ক্রমে মৃত্যুর তিথি উপস্থিত। পতিপ্রাণা সাবিত্রীর মন আকুল হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া স্বামীর সহিত ফল মূল্যহরণার্থ বনগমনে রুতনিশ্চয়া হইলেন। স্বপ্ন ও স্বপ্নের অনুমতি লইয়া সত্যবানের বাধা অতিক্রম করতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত দিন নিবিড় বনমধ্যে পথচলন করিলেন। সায়াংকালে সত্যবান ফলভার মস্তকে করিয়া গৃহাভিমুখ হইলেন। কিয়দূর আসিয়া প্রবল শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি এই স্থানে উপবেশন করিয়া ফলরক্ষা কর। আমি তোমার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করি। শিরঃপীড়ায় আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। তখন সাবিত্রী অন্তরে বুঝিলেন সেই নিদারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন স্বামীর অঙ্গ ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিল। তখন একাকিনী সেই শব ক্রোড়ে করিয়া কত যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তাহা কে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে। ক্রমে রজনী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সাধ্বীর ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ আনয়ন করা যমদূত দিগের কার্য্য নহে। যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন সাবিত্রি তোমার স্বামীর দেহে এক্ষণে আমার অধিকার হইয়াছে।

তুমি আমার কর্তব্যকর্ম্মে কেন বাধা দিতেছ। তোমার ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিতে আমারও সাধ্য নাই। তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। সাবিত্রী তাহাই করিলেন। যমরাজ মৃতদেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ লিঙ্গ শরীর সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী নিভীকচিত্তে তাঁহার পশ্চাদ্ধর্ত্তিনী হইলেন। কিয়দূর গমন করিলে যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবিত্রি, তুমি কেন আমার অনুবর্ত্তন করিতেছ ঠাহাতে তোমার কিছুমাত্র লাভ নাই। বৃথা পরিশ্রম হইতেছে মাত্র। তখন সাবিত্রী কহিলেন।

“শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো মে
যতো হি ভর্ত্তা মম সাগতিঃ ৷
যতঃ পতিং নেম্যতি তত্র মে গতিঃ সুরেশ”

কিয়দূরে যমরাজ বলিলেন তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন কি প্রার্থনা কর। যদি কোন পৌরানিক সাবিত্রী চরিত্র লিখিতে বসিতেন তিনি বলিতেন আমার আর কোন প্রার্থনা নাই। এবং সাবিত্রীকে আর খানিক কাদাইতেন কিন্তু সাবিত্রী পৌরানিকদিগের বর্ণনার অতীত পদার্থ। তিনি বলিলেন যাহাতে আমার স্বপ্নের ব অঙ্কুর মোচন হয় করুন। যমরাজ তথাস্ত বলিলে সাবিত্রী পুনরায় তাঁহার পশ্চাদ্ধর্ত্তিনী হইলেন। যমরাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বরে তাঁহার স্বপ্নের রাজ্য প্রাপ্তি ও পিতার শত পুত্র হইবে বলিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিলেন।

সাবিত্রী তথাপি আসিতেছেন দেখিয়া যমরাজ কহিলেন তুমি বাটী ফিরিয়া যাও সেখানে তুমি রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। তুমি কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছ। সাবিত্রী তখন পুনরায় কহিলেন স্বামীর সহিত গমনে আমার শ্রম কোথায় আর আপনি যে রাজ্যভোগের কথা কহিতেছেন আমার স্থিরপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন।

ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃত্য স্মৃৎ
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃত্য শ্রিয়ং
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃত্য দিবং
ন ভর্তৃহীনং ব্যবসামি জীবিতং ॥

তখন যমরাজ জানিলেন সাবিত্রী সামান্য রমণী নহেন। তিনি সাবিত্রীর পতিপরায়ণতার বিস্তর প্রশংসা করিয়া উহার স্বামীর জীবন উহাকে অর্পণ করিলেন (ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ কর্ত্তা এই স্মরণে সাবিত্রীকে ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রীর অবতার বলিয়া লইয়াছেন এবং বিষ্ণুমন্ত্র প্রচারের পথ করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া সাবিত্রীকে সাবিত্রীর অবতার জানিয়া উহাকে মুক্তির প্রধান উপায় বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করেন।) সাবিত্রী পতিদেহে তাঁহার আত্মা সংযোগ করিয়া দিলে সত্যবান জীবনপ্রাপ্ত হইলেন, এবং কহিলেন উঃ অনেক রাত্রি হইয়াছে। পিতামাতা আহারাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। এই বলিয়া সন্ধর পদে তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও পূর্ণমনোরথ হইয়া

হর্ষদিশ্ণিত বেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষিঃ বেদব্যাস এই উপাখ্যানটী মহাত্মারতীর বনপার্শ্বে বর্ণনা করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সমুদ্র প্রবন্ধটী অনুবাদ করিলাম না। সংক্ষেপে সংগ্রহ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত রছিলাম। কিন্তু যে কেহ মহর্ষির গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তিনিই জানেন উহা অনুবাদ করিতে পারা যায় না এবং সংগ্রহ করিতে গেলে উহার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। যে সকল স্থানে হৃদয়ের গভীর ভাব ব্যক্ত হইতেছে তাহা অনুবাদ করিতে পারিলাম না মহর্ষির বাক্যই উদ্ধার করিয়া দিলাম।

এক্ষণে দেখা যাউক সাবিত্রী প্রাচীন কালেব রমণীচরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র কি না। সাবিত্রী বাল্যকালে পিতার বশীভূতা হইলেন। পরে পিতার আদেশানুসারে অভিমত পতিলাভ করিবার জন্য পিতার এক জন সঙ্গীতের সহিত বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে বর মনোনীত করেন তিনি সর্ব্বশুণ-সম্পন্ন। ইহাতে সাবিত্রী লোকবৃত্তান্ত বিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শী ছিলেন বোধ হয়। তিনি শুদ্ধ ঐশ্বর্য্য রূপ বা বল দেখিয়া বর মনোনীত কবেন নাই। সত্যবান তখন একজন অন্ধ মূনির পুত্র, নিজে বন হইতে ফলমূলগ্রহণ করিয়া পিতামাতার ভরণ পোষণ করেন। তাঁহার অবস্থায় এমন কিছুই ছিলনা যাহাতে রমণীর মন আকর্ষণ করে। কিন্তু

সাবিত্রী এন্ জেলিনার ন্যায় পবিত্র-
স্বভাবা ছিলেন এন্ জেলিনা বলিয়াছেন,

"In humble simplest habits clad
No wealth or power had he;
Wisdom and worth were all he had
And these were *all* to me."

একবার সত্যবান্কে মনঃ প্রাণ সমর্পণ
করিয়া সাবিত্রী তাহাকে চিরদিনের জন্য
পতিরূপে বরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ
ও মহারাজ অশ্বপতি কত বুঝাইলেন
শুনিলেন না। বলিলেন এসকল কাজ
একবার ছাড়া ছুই বাব হয় না। বিবাহের
পর অশ্বপালয়ে গমন করিয়া অশ্ব
অশ্বরের সেবায় ও গৃহকার্য্যে ব্যাপ্তা
হইলেন। তিনি যে স্বামীর মৃত্যুতিথি
জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা এক দিনের
তরেও কাহাকে জানিতে দিলেন না।
কিন্তু সর্ষদাই ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে
লাগিলেন এবং নানাবিধ কঠোর নিয়ম
ও ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুব
দিবস উপস্থিত জানিয়া কাহারও কথা না
শুনিয়া স্বামীর সহিত বনে গেলেন। সে
খানে যাহাং ঘটিল পূর্বে উক্ত হইয়াছে।
যমরাজকে শব দিয়া অবধি তাঁহার অনু-
গমন করিতে লাগিলেন। যমরাজবর
দিতে আসিলে চতুরা সাবিত্রী এই সু-
যোগে পিতা ও অশ্বরের শুভ বর প্রার্থনা
করিলেন। তিনি স্বামিবিয়োগে অধীর
হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল।
ওকণ ভয়ানক সময়ে বর দিতে আসিলে
প্রাকৃত রমণীরা কখনই সাবিত্রীর ভ্রায়

দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন
না। স্বামী তাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহার জন্ত
প্রাণ দিতে প্রস্তুত। *কিন্তু তাহা বলিয়া
পিতামাতার প্রতি কর্তব্য কৰ্ম্ম তিনি
এক বারও বিস্মৃত হয়েন নাই (পূরণ
মতে পরলোকেরও উপায় করিয়া লইয়া-
ছিলেন) তিনি যদি শুদ্ধ পতিব্রতা হইতেন
সেই ঘোর রজনীতে স্বামীর মৃতদেহের
উপর অশ্রুও প্রাণত্যাগ করিতেন তাহা
হইলেও তিনি রমণীকূলের শিরোভূষণ
বলিয়া গণ্য হইতেন না। কত শত
পতিপরায়ণা রমণী স্বামীর জলন্ত চিতায়
আত্মসমর্পণ করিয়াছেন কিন্তু সাবিত্রীর
ন্যায় কেহই জগতীতলে মাননীয় হয়েন
নাই। সাবিত্রী পতিপ্রাণা ছিলেন
তাহার সন্দেহই নাই। কিন্তু তাঁহার
অনন্যনারীসাধারণ অনেক গুণও ছিল।
এবং সেই জন্যই এতদেখীয় রমণীরা
জ্যৈষ্ঠ মাসে সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন।
কোন রমণী একবৎসরের মধ্যে পতির
মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে তাহাকে
বিবাহ করেন! কোন রমণী ১২সরাবধি
সেই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিতে
পারেন? কেই বা তাদৃশ ঘোর বিপৎ-
পাত সময়ে হতচেতনা না হইয়া অভিল-
ষিত সিদ্ধিতে দৃঢ় নিশ্চয়া হইতে পারেন
এবং কেই বা তাদৃশ সময়ে আপনার
সকল কর্তব্য কন্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া
চলিতে পারেন?

স্বহি সংহিতাদিতে যত গুণ থাকা
প্রয়োজন বলে সাবিত্রীর তাহা সকলি।

ছিল। তাহার উপর, উহার পুরুষের ন্যায় নির্ভীকতা সত্যনিষ্ঠতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি নানা গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সাবিত্রীর অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সত্য বটে তাঁহাকে সীতা দ্রোপদী প্রভৃতির ন্যায় নানা প্রলোভনে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্র দৃষ্টে বোধ হয় সেরূপ প্রলোভনে পড়িলে তিনি তাঁহাদিগের অপেক্ষায়ও অধিক যশস্বিনী হইতে পারিতেন। তিনি এই শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাব তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। দময়ন্তী সীতা প্রভৃতি রমণীগণাপেক্ষাও অনেক বিষয়ে তাঁহাকে উন্নতচরিত্রা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা তাদৃশ উৎকৃষ্ট স্বভাব কামিনীগণের মধ্যে কে প্রথম ও কে দ্বিতীয় তাহা বলিয়া দিতে পারি না। মেকলে তাদৃশ কার্য্যকে জঘন্য কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Invidious office.) আমরাও তাহাই বলি। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিলাম প্রথম শ্রেণীরও একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিব। কিন্তু ইহাদেব মধ্যে ছোট বড় বাছিয়া উঠা নিতান্ত কঠিন।

সাবিত্রী চরিত্র বোধ হয় মহর্ষি বেদব্যাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না। সীতা দ্রোপদী দময়ন্তী লইয়া কত কাব্য কত নাটক লেখা হইয়া গেল কিন্তু কেহই সাবিত্রী চরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন নাই। বাঙ্গালী কবি পর সীতার চরিত্র বর্ণনে কেহই

সম্যক কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন নাই বলিলে বোধ হয় অত্যাক্তি হইবে না ইহা সীতা চরিত্রের প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সাবিত্রী-চরিত্র আরো অধিক প্রশংসনীয় হইবে। যে হেতুক কোন কবিই এ পর্য্যন্ত সাবিত্রীচরিত্র অমুকরণে আপনাকে সমর্থ বিবেচনা করেন নাই।

পঞ্চম অধ্যায় ।

তৃতীয় শ্রেণীতে শ্রেণীর কামিনীগণের মধ্যে দ্রোপদী দময়ন্তী ও সীতা সর্বপ্রধান। শ্রীবৎস মহিষী চিন্তা ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী প্রভৃতি নারীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের চরিত্রের মধ্যে পতিপরায়ণতাই বিশেষ গুণ। গান্ধারীর স্বামী অন্ধ হইলেও তিনি যাবজ্জীবন স্বামিসুশ্রা করিয়াছেন এবং তিনি চিরদিন সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার শাপে কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি পুত্রাদির মৃত্যুর পর তাহাদিগের রমণীবর্গকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তাহাদের সকলেই সহগমন করিল। শোকজর্জরিত হইয়াও স্বামীর সেবার জন্য জীবিত রহিলেন। এবং পরিশেষে আশ্রমে যাইয়া পতির সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী স্বয়ংবরে দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নলকে বিবাহ করিলেন

এবং বনমধ্যে তিনি নানাবিধ কষ্ট পাইলেন এই দুই কারণেই তিনি আমাদিগের দেশে আদরণীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে কলি স্পর্শ করিতে পারে না। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে প্রিয়বাদিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার অন্য কোন গুণের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু উপরি উক্ত দুইটা কার্য দ্বারাই তাঁহার চরিত্রের ঔন্নত্য বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হইতেছে। অহল্যা বিবাহিতা এবং পুত্রবতী হইয়াও, যে প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া নানা কষ্ট পাইলেন, দময়ন্তী অবিবাহিতা বালিকা হইয়াও সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করিলেন।

শ্রীবৎস রাজার স্ত্রী চিন্তার চরিত্র অনেক অংশে দময়ন্তীর মত। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে শনির দশা হয় না।

দ্রৌপদী সংস্কৃত গ্রন্থাবলীমধ্যে একটি প্রশংসনীয় কামিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যাহাদিগকে বিবাহ করিলেন তাহাদের রাজ্য নাই। তাহারা অতি দুঃখী, ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট। বিবাহের পর এক কুস্তকারের গৃহে উপস্থিত। এই তাঁহার শ্বশুরালয়। শেষে তাঁহার স্বামীরা রাজ্য পাইল। তিনি রাজমহিষী হইলেন। রাজপুত্র যজ্ঞ হইল ইহাতে তিনি লোকের সহিত একরূপ বাবহার করিলেন যে সকলেই তাঁহাকে, সুখ্যাতি করিতে লাগিল। শেষে যুধিষ্টি-

রের দোষে রাজ্য গেল, ধন গেল। যুধিষ্টির দ্রৌপদী পর্যাস্ত হারিলেন। সভার মধ্যে হরাস্বামী তাঁহার যাত্রাপর নাই অবমাননা করিল। এমন কি কেশাকর্ষণ করিল বস্ত্রহরণ করিল শেষে কুরুবৃদ্ধেরা তাঁহাকে ছাড়াইয়া লইলেন। পরে তিনি স্বামীদিগের সহিত বনগামিনী হইলেন। অর্জুনের আরও ভাৰ্যা ছিল, ভীমের ছিল, সকলেই আপন-বাটা রহিল কেবল দ্রৌপদীই স্বামিভাগ্যে আপন ভাগ্য মিশাইলেন। বনেও তাঁহার কষ্টের একশেষ। তিনি স্বামীদিগের সেবা করিতেন। যুধিষ্টির সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন ও অনেক রাত্রিতে স্বয়ং ভোজন করিতেন। সর্বদা নীতিশাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। তিনিই পরামর্শ দিয়া অর্জুনকে ইন্দ্রসন্ধিধানে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবসৌভাগ্যের সূত্র-পাত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। দ্রৌপদী সর্বদা ধর্ম্যকথা শ্রবণ করিতেন। এক দিন যুধিষ্টির মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দ্রৌপদীর জ্ঞান ধর্ম্যপারায়ণা ও সর্বগুণসম্পন্না কামিনী কি আর আছে? যদিও কোনকপে অসম্ভব বনবাস যন্ত্রণা সহ করিলেন তাহার পর আবার দাসত্ব। বনে যেমন জয়দ্রথ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে বিরাটবাজ্রবনে কীচকও সেইরূপ অত্যাচার করিল। দুই বারই ভীম তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তাহার পর যুদ্ধের উদ্যোগের সময় তিনি একজন

প্রথম উদ্যোগী। সুতরাং পর আর তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বক্র বাহন হস্তে অর্জুনের বিনাশ হইলে তিনি অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং ত্রিকুণ্ডকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। পরে স্বামীদিগের সহিত মহা প্রস্থানে গমন করিয়া সর্ব প্রথমেই স্বামীদিগের সমক্ষে দেহত্যাগ করিলেন।

“দ্রৌপদী সতীশ্রী ছিলেন। মাতৃ আজায় তাঁহার পঞ্চ স্বামী হইয়াছিল। তিনি সেই পঞ্চস্বামীবই মনোরমা হইয়া সতীর মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি অতি ধর্মপরায়ণা পতি-ব্রতা দয়াশীলা ছিলেন এবং অধীনগণকে মাতার স্থার পালন করিতেন। রাজকন্যা ও রাজভাৰ্যা হইয়াও তিনি পতিগণের সঙ্গে বনে ব্রমণ করিয়াছিলেন এই সকল গুণে তাঁহার নাম প্রাচ্যঃস্বরগীয় হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর কি আবশ্যক।”

সীতা। বাস্তবিক সীতা একটি সুশীলা ও শাস্ত্রস্বভাবা বালিকা—তিনি বিবাহের পূর্ব সর্বদা স্বামিগুণবশে ব্যাপৃত থাকিতেন। রামচন্দ্র এই সময়ে সীতার সহবাসে গুরুপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তিনি সর্বদাই সেইরূপ বিগুণ আমোদ লাভের জন্য উৎসুক থাকিতেন। রাম কেকয়ীর গৃহহইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সীতাকে বনগমনের কথা বলিলেন তখন সীতাও তাঁহার সহগামিনী হইতে

উৎসুক হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের যে কথাবার্তা হয় তাহা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয় করুণরসে আগ্নত হয়। সীতা বনবাসে যাইবেন রাম তাহাকে বাধা দিবেন। রাম কত বুঝাইলেন বনগমনের নানা কষ্ট বর্ণনা করিলেন; গৃহবাসের সুখ বর্ণনা করিলেন; গৃহবাস করিলে নানাবিধ ধর্ম কর্ম করিতে পারা যায় এবং তাহাচারার স্বামীর নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিতে পারা যায়। সীতা অনেক বাদাম্বাদের পর বলিলেন,

“স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থিতু মর্হসি।

তপোবা যদিবারণ্য স্বর্গোবা স্তাভয়াসহ ॥

নচ মে ভবিতা কশ্চিৎকথ পথি পরিশ্রমঃ।

পৃষ্ঠত স্তব গচ্ছন্ত্য বিহারশয়নেষিব ॥

কুশকাশ শরেষীকা যেচ কঠকিনো দ্রুমাঃ।

তুলাজিন সমস্পর্শা মার্গে যম সহ ভয়া ॥

এই বলিয়া তিনি রামের গলদেশ ধারণ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না তিনি উহাকে বনে লইয়া যাইব বলিয়া অস্বীকার করিলেন এবং নানা প্রকারে সাধনা করিতে লাগিলেন।

রামের সহিত স্বশ্রুৎখণ্ডদিগকে প্রণাম করিয়া সীতা বসন ভূষণ পরিত্যাগ করতঃ জটা ও বকল ধারণ করিতে গেলেন। তিনি নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা বকল কিরূপে ধারণ করিতে হয় জানেন না। তিনি একখানি চীরবস্ত্র হস্তে ধারণ ও অপর খানি স্বন্ধে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং

অপ্রতিভস্থে সাক্ষনরনে রামকে কহিলেম, স্বামিন! চীরধারণ কিরূপে করিতে হয়? রাম তখন সীতার কোষের বস্ত্রের উপরি চীরবস্ত্র সংযোগ করিয়া দিলেন, তাহাব পর সীতা স্বামীর সহিত বনে নানা কষ্ট পাঠিয়াছেন। পথগমনে তিনি সর্বদাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। কদর্য বনফল মাত্র তাঁহার আহার ছিল। পর্ণ-শয্যায় শয়ন ছিল। কিন্তু সে সকল কষ্ট কেবল রামমুখাবলোকন করিয়া দূর হইত। চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটীগমন সময়ে সীতা রামকে অকাবণ বৈর করিতে নিবেদন করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

যখন রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, সে রথের উপরে তাঁহাকে কত বুকাইতে লাগিল। সীতে, আমিই তোমার সদৃশ পতি। তুমি আমার স্ত্রী হও। দেবতারাও তোমার অধীন হইবে। আমার পাটরাঙ্গীরাও তোমার দাসী হইবে। পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে। সীতা তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তাহাকে বলিলেন, রামের সহিত তুলনায় তুমি শূণ্য স্বরূপ দাঁড়কা স্বরূপ। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তুমি আমায় হরণ করিতেছ ইহার জন্ত তোমায় সবংশে মরিতে হইবে।

যখন রাবণের অন্তঃপুরে তিনি বন্দী, রাবণ প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করে তাঁহার পায়ে পড়িয়া তোষামোদ করে তাঁহার

স্বীতি উৎপাদনের জন্ত চেষ্টা করে, সীতা কেবল বলেন,

রামো নাম সধর্ম্মায়া ত্রিষু লোকেষু বিস্তৃতঃ।
দীর্ঘবাহু বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্মম ॥

অনেক দিন এইরূপে গেলে একদিন রাবণ বলিল তুমি যদি আব বার মাসের মধ্যে আমায় স্বামী বলিয়া স্বীকার না কর তোমার মাংস ভোজন করিয়া মন-স্বামনা পূর্ণ করিব। তখন পতিপরায়ণা সীতা অণুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং রক্ষ বা যাতয়স্ব বা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতঞ্চাপি

রাক্ষস ॥

হনুমান্ আসিয়া অশোকবন মধ্যে সীতাকে দেখিলেন। সীতা মজ্জনোন্মুখ নৌকার ন্যায় শোকভারে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত অশ্রুপাত করিতেছেন, রাবণ তাহার নিকট বহুসংখ্যক রাক্ষসী রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা দিনরাত ধরিয়া তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছে ভয় দেখাইতেছে কখন বা তাঁহাকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। কিন্তু তিনি আপন গুণে সেই ভয়ানক রাক্ষস পুরী মধ্যেও জিভটা ও শরমা নানী ছই রাক্ষসীকে সখী পাইয়াছেন। তাহারা অবসর পাইলেই তাঁহাকে সাধনা করে। হনুমান্কে দেখিয়া সীতা অনেক দিনের পর আনন্দ প্রকাশ করিলেন তিনি হনুমানকে আশীর্বাদ করিলেন রামকে আপন মনের কথা বলিলেন।

তখন তাঁহার ভরসা হইল রাম তাঁহাকে
অবশ্য উদ্ধার করিবেন ।

রাবণবধের পর বিভীষণকে রাজ্যে
অভিষেক করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে আন-
য়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন ।
সীতা উপস্থিত হইলে বলিলেন সীতে
আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিয়াছি
শক্রনাশ করিয়াছি এবং কলঙ্ক অপনয়ন
করিয়াছি । আজি বিভীষণাদির শ্রম
সফল হইল । এই সকল কথা শুনিয়া
সীতার মুখ বিকসিত হইল ; আনন্দা-
শ্রুতে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গেল । তখন
রাম কর্কশ স্বরে কহিলেন জানকি !
আমার কৰ্ম্ম আমি করিয়াছি । কিন্তু
তোমাকে আমি গ্রহণ করিতে পারি
না । তুমি পরগৃহে অনেক দিন বাস
করিয়াছ । আমি সংকুলপ্রভৃত হইয়া
তোমাকে গ্রহণ করিলে কেবল নিন্দাভাগী
হইব মাত্র । অতএব তোমায় অমুমতি
দিতেছি তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয়
আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা কর । সীতা
এই পুরুষ বাক্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া
বাস্পমোচন করিতে লাগিলেন এবং কহি-
লেন স্বামিন্ আপনি আমাকে প্রাকৃত
রমণীর ভাষ্য ভাবিলেন । আমি লঙ্কা
পুরীর মধ্যে কি অবস্থায় বাস করিয়াছি
তোমার দূত হনুমান্ সম্পূর্ণ রূপে অবগত
আছে । অতএব এক্ষণে আমাকে এক্ষণে
পরিত্যাগ করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে ।
নশ্রীমানীকৃতঃ পানি বাল্যে মম নিপীড়িতঃ ।
মম ভক্তিক শীলক সর্বস্ত্রে পৃষ্ঠতঃ কৃতং ॥

এই বলিয়া লক্ষ্মণকে চিতাসজ্জা করিতে
কহিলেন এবং সর্বসমক্ষে বহু মধো
প্রবেশ করিলেন বহুপ্রবেশ সময়ে দে-
বতা ব্রাহ্মণ দিগকে প্রণাম করিয়া কুস্তা-
ঞ্জলি পুটে বলিলেন,
যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাং
তথা লোকস্ত সাক্ষীমাং সর্বতঃপাতু পাবকঃ ।
যথামাং শুদ্ধচারিত্রাং দৃষ্ট । জানাতি রাঘবঃ
তথালোকস্ত সাক্ষীমাং সর্বতঃপাতু পাবকঃ ।
কৰ্ম্মণামনসা বাচা যথানাভিচারামাহং
রাঘবং সর্বধর্মজ্ঞং যথামাং পাতু পাবকঃ ।
অগ্নি প্রবেশ করিলে তাঁহার কিছুমাত্র
ক্ষতি হইল না । সকলে ধন্য বলিয়া
তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল ।

সীতা বহুকাল রামগৃহে অবস্থান করিলে
পরভদ্রক নামে একজন লোক প্রসঙ্গ
ক্রমে সভামধ্যে বলিল রাবণগৃহে বহুকাল
থাকিলেও রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন
বলিয়া প্রজারা অনেকে তাঁহার নিন্দা
কবে । রাম ক্ষত্রিয়পুরুষ তাঁহার ধর্মনীতে
বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়শোণিত প্রধাবিত, তিনি
তৎক্ষণাৎ সীতা পরিত্যাগে সংকল্প করিয়া
লক্ষ্মণকে বলিলেন “তুমি আশ্রম গমন
ব্যপদেশে সীতাকে ভাগীরথীতীরে পরি-
ত্যাগ করিয়া আইস । লক্ষ্মণও সীতাকে
লইয়া গেলেন । সীতা নিদারুণ পরি-
ত্যাগ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হত-
চেতনা হইয়া রহিলেন পরে লক্ষ্মণকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস, নিতান্ত
নিরস্তর হুঃখভোগের জন্তই আমার দেহ-
স্থিতি হইয়াছিল আমি পূর্বজন্মে যে কি

পাপ করিয়াছিলাম, কোন পতিপরায়ণা নারীকে অসহ্য পতিবিরহ যন্ত্রণা দিয়া-
ছিলাম বলিতে পারি না নচেৎ নৃপতি
আমায় কেন পরিত্যাগ করিবেন।”

পুনশ্চ বলিলেন, লক্ষণ তুমি অর্ঘ্য-
পুত্রকে বলিও যে তিনি আমার প্রতি যেরূপ
বাবহারই করুন না কেন তিনিই আমার
পরম গতি। তাঁহাকে সর্বদা আপন
কর্মে অবহিত হইতে বলিও। এক্রপ
সময়েও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পতি-
কল্যাণ কামনা কবা প্রাকৃত রমণীর কার্য
নহে। সীতার বাক্যের প্রত্যেক অক্ষ-
রেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাব এবং
হ্রদয়নের অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ
পাইতেছে।

অমাগিনী সীতা আবার দ্বাদশ বৎসর
বনবাস করিলেন এবং ঋষিরা আবার
রামকে তাঁহার পুনর্গ্রহণের জন্য অনুরোধ
করিলেন। রামও আবার সর্বসমক্ষে
সীতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন।
এবার অগ্নিপরীক্ষা নহে—এবার শপথ।
সীতা যখন সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন
তাঁহার নয়ন স্বপদে অর্পিত। তাঁহার
মনের ভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা করা
দুর্লভ। তাঁহার অলৌকিক অনির্বচনীয়
প্রণয় পূর্ববৎই আছে কিন্তু সভামধ্যে
পুনঃ পরীক্ষা দেওয়ায় তাঁহার আত্মগ্লানি
উপস্থিত হইয়াছে; প্রাচীন রমণীমূলভ
তেজও বিলক্ষণ আছে। তিনি সভামধ্যে
প্রবেশ করিয়া কোনদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ
করিলেন না কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থা-

কিয়া করুণস্বরে স্বীয় জননী মাধবীদেবীর
নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার
তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে এবং
তাঁহার শোক দীন বচনাবলী পাঠ করিলে
পাষণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং সহৃদয়
হৃদয়ে গভীর শোকসাগরের উদগূরণ
হয়। তিনি বলিতে লাগিলেন,
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্বিরামাৎপরং নচ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥

সভাস্থল লোক নিস্তব্ধ হইল। ঋষিগণ
অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন
রামচন্দ্র মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন।
ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সহসা প্রদীপ্ত-
জ্যোতিঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া
ধরণীদেবী আবিভূত হইলেন এবং
সীতাকে সম্মুখে আলিঙ্গন করিয়া পাতাল
মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

শেষোক্ত শ্রেণীস্থ কামিনীগণের মধ্যে
জনকতনয়া সীতা সর্বপ্রধান। সীতা
সর্বগুণসম্পন্না ছিলেন; তাঁহার ন্যায় পতি
পরায়ণা আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ।
তাঁহাকে যাদৃশ প্রলোভনে পড়িতে হইয়া
ছিল কোনকালে কোন নারী তাদৃশ-
প্রলোভনে পড়িয়াছিল ছিল কি না সন্দেহ।
অদৃষ্টের দোষে তাঁহাকে নানা কষ্ট পাইতে
হইয়াছিল। তিনি রাজনন্দিনী ও সমাগরা
ধরণীপতির মহিষী হইয়াও একপ্রকার

জন্মদুঃখিনী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বামীর সহিত বনে গেলেন। তথায় রাবণ তাঁহাকে হরণ করিল। তিনি অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তাহার পর স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দায়ে কোনরূপে উদ্ধার পাইলেন। আবার মিথ্যাবাদভীত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবার তিনি বনে একাকিনী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রায় যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল কিন্তু শেষ কালে তিনি সশরীরে ভগবতী পৃথিবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

তুলনা।

সীতা ও সাবিত্রী দুইজনই অদ্বিতীয় রমণী। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবিতা স্বীয় কল্পনাশক্তি বলে উঁহাদের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সীতার স্নেহ-প্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখদুঃখ বিপদ সম্পং সকল সময়েই স্বামীব প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার সমান স্নেহ। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিলেন তথাপি উঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পরিচয়

দিয়াছেন। কিন্তু সীতা অপেক্ষা সাবিত্রী কর্মক্ষমতার অনেক উৎকৃষ্ট। বঙ্গীক কোন স্থানেই সীতার কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। তিনি উঁহাকে শাস্ত সুশীলা ও একান্ত সুধীস্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাবিত্রীও ধীরস্বভাবা সন্দেহ নাই কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে তিনি কোন শ্রমকেই শ্রম জ্ঞান করেন না এবং এমন কষ্ট নাই যে সীতা সহ কবিত্তে পারেন না। তাঁহাদের দুইজনেরই মনের তেজস্বিতা আছে। যমরাজও সাবিত্রীর তেজস্বিতা স্বীকার করিয়াছেন। সীতাও দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় উহার পরিচয় দিয়াছেন। কর্মক্ষমতা বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সমাক্ষ প্রকাশিত হয় নাই। সীতা ও সাবিত্রীকে সর্বাপেক্ষা উন্নত চরিত্রা বলিবার কাবণ এই যে তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিভ্রমের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি সমুদয়ই রামায়ণ প্রভৃতি আর্ষ গ্রন্থাবলী হইতে। কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ প্রণীত গ্রন্থাবলী হইতে কতক গুলি উদাহরণ সংগ্রহ না করিলে, এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কখনই বোধ হইবে না। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ ঋষিদিগের অনেক পুরের লোক। তাঁহাদিগের সময়ে ভার-

ভবর্ষের অবস্থাগত নানা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে প্রচার হইয়াছে ও বিনাশ হইয়াছে। বেদ ও স্মৃতিপ্রতিপাদিত ধর্মের লোপ হইয়াছে পৌরাণিক দিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। আর্ধ্যাগণ বিলাসী হইয়াছেন কুসংস্কারাপন্ন হইয়াছেন এবং অনেকাংশে হীনবীৰ্য্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা আর ব্রহ্মচর্যাাদি চারি আশ্রম পালন করেন না তাঁহারাও বাণিজ্যাদি নানাবিধ সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন। একরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরও চরিত্রগত অনেক ভেদ দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের জন্ম জেনানা মহল সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতীয় বমণীগণের ন্যায় তাঁহাদের সে নির্ভীকতা নাই। স্বামীর আর তাঁহারা সখী নহেন কেবল দাসী মাত্র। রাজারা পূর্বে নিমিত্তাধীনমাত্র বহুবিবাহ কবিত্তে পাবিত্তেন এক্ষণে তাঁহারা ইচ্ছামত অসংখ্য বিবাহ করিতে পারেন। কতকগুলি ভোগ্য স্ত্রী তাঁহাদিগেব অন্তঃপুরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। দশকুমার চরিত পাঠ করিলে খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে আমাদের দেশের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীগণের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে।

কবিগণ যে সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা দুই প্রকার; হয়, তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত নহয় মহাভারত বা রামা

য়ণ অথবা কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। যে সকল গুলি তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে তাঁহাদিগের সমসাময়িক সমাজের অবস্থা বিষয়ক অনেক কথা পাওয়া যায়। এই রূপ নাটকের মধ্যে রত্নাবলী মালবিকাগ্নিমিত্র, মুচ্চকটিক ও মালতীমাধব প্রধান। দশকুমার চরিত এবং কাদম্ববীও কোন শাস্ত্রের উপাখ্যান নহে। যে গুলি তাঁহাদের নিজের নহে তাহাতেও তাঁহাদের আপন সময়ের ভাবই অধিক। বাল্মীকিব সীতা ও ভবভূতির সীতা ভিন্ন সময়ের লোক। বেদব্যাসের শকুন্তলা ও কালিদাসেব শকুন্তলায় অনেক অন্তর। ঋষিপ্রণীত এবং কবিপ্রণীত গ্রন্থের বচনাগত কিরূপ প্রভেদ তাহা একজন সাহেব এইরূপে প্রকাশ করিয়াছে।

*** The Mahabharata tells the story in simple but vigorous and noble language. It is full of powerful description of passion. The poet no where pays any undue attention to mere forms of words. His chief exertion is devoted to attract our sympathy to the qualities and passions which he describes. Refer for example to the deep pathos in the description of the grief of Damayanti when abandoned by her husband in the solitude of the forest.

Instead of ennobling the affec-

tions and appealing to the tenderest and most sacred feelings of man the love which the poet describes (poet, one like shreeharasa) is earth born in a degree far exceeding the lasciviousness of some of the Roman poets.

যাহা হউক আমরা কাব্যগ্রন্থ হইতে কতকগুলি সাধুশীলা রমণীর চবিত্র বর্ণনা করিব। প্রথমতঃ মুচ্ছকটিক অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে একটি বেশ্যা ও একটি পতিপ্রাণা রমণীর চবিত্র বর্ণনা আছে। উভয়েই চারুদত্তের প্রতি সমান প্রণয়বতী—উভয়ের চরিত্রই বিশুদ্ধ নির্মল এবং উন্নত। বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া অবধি কত অত্যাচার সহ করিলেন কত প্রলোভন হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন এবং শেষ একটানরাধমের হস্তে তাঁহার জীবন পর্যন্ত গেল। তথাপি তাঁহাব প্রণয় অবিচলিত। তিনি শুদ্ধ নিজেই প্রণয়বতী এমন নহেন যেখানে বিশুদ্ধ প্রণয় সেইখানেই তাঁহার প্রীতি। তিনি শর্কিনকের প্রণয়িনী আপন দাসীর দাসত্ব মোচন করিয়াছিলেন। আপনার কণ্টক স্বরূপ চারুদত্তের মহিষীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভূরিং প্রশংসা করিলেন। বেশ্যালোকের ওরূপ অবস্থা হইলে প্রায়ই তাহারা অত্যাচারী ও উদ্ধত হইয়া উঠে, কিন্তু বসন্তসেনা বরাবর আপনাকে বেশ্যা বলিয়া জানিতেন এবং ঘৃণা করিতেন, তিনি সাহসপূর্বক চারুদত্তের

বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন না বলিলেন সেখানে প্রণয়বতী ধর্মপত্নীর অধিকার। চারুদত্তের ব্রাহ্মণীও স্বামীকে অত্যাশঙ্ক জানিয়াও তাহাতে অনুমাত্র দুঃখিত হইলেন না বরং যখন শুনিলেন চোরে বসন্তসেনার অলঙ্কার চারুদত্তের গৃহহইতে অপহরণ করিয়া লইয়াছে এবং চারুদত্ত “কথংন্যাসঃ” বলিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন আপনার সমস্ত অলঙ্কার বসন্তসেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এবং স্বামী যখন মিথ্যা হত্যা-পরাদে বধ্যস্থানে নীত হইলেন, তখন তাঁহার সহগামিনী হইলেন। তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধস্বভাবা কামিনী অতি বিরল।

মালবিকা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিগণের অতিশয় প্রিয়পাত্রী। তাঁহার চরিত্র অপবিত্র নহে। তিনি রাজনন্দিনী, একজন সেনাপতি তাঁহাকে দম্বাহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া রাজপরিবারে প্রেরণ করেন। তিনি রাজার সংসারে থাকেন এবং নৃত্যগীত শিক্ষা করেন। তৎকালের লোক অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়। সুতরাং বিলাসপ্রিয় রাজা বা রাজকর্মচারীকে প্রীত করিতে হইলে যে সকল শিক্ষা আবশ্যক তিনি তাহাতেই নিপুণ। পরে তিনি রাজার প্রণয়িনী হইলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তরেই রহিল। রাজাও যে তাঁহার প্রতি আসক্ত তাহা তিনি জানেন না। পরে কোন দিন বিদুষকের কৌশলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। সে আবার সন্তামধ্যে। মালবিকা গীতিচ্ছলে

এবং অল্পভঙ্গির দ্বারা আপন মনের ভাব রাজাকে জানাইলেন। পরে গান্ধীর্ষ বিধানে উভয়ের বিবাহ হইল। মালবিকা কবিগণের প্রিয়পাত্রী; কেন না তিনি সুলক্ষী নৃত্যগীতাদি কলাভিজ্ঞা। নৃত্য করিতে পারেন গান করিতে পারেন অভিনয় করিতে পারেন কৌশল পূর্বক হাবভাব প্রকাশ করিতে পারেন। তিনি চতুরা ও প্রণয়িনী—তিনি অভিলষিত লাভের জন্য কত কষ্ট পাইলেন সমুদ্রগৃহে বন্দী রহিলেন মহারাণীর বিবাগভাগিনী হইলেন তথাপি তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইল না। আধুনিক কবিরা হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশে তাঁদৃশ সক্ষম নহেন তাঁহারা মালবিকার ন্যায় চরিত্র বর্ণনে বিলক্ষণ পটু। মালবিকার চরিত্র, নারীগণের উৎকৃষ্ট চরিত্র বর্ণনাস্থলে উল্লিখিত হওয়া অন্যায্য কিন্তু তিনি একটি শ্রেণীর আদর্শ এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এখানে উল্লেখ করিলাম। যেমন পুরাণকর্তাদিগেব লোপামুদ্রা ঋষিদিগের সীতা ও সাবিত্রী সেইরূপ কবিদিগের মালবিকা অত্যন্ত আদরণীয়া। যেমন পুরাণদিগের লোপা মুদ্রা বালিকাদিগের শিলা যুবতীদিগেব সাবিত্রী এবং সর্কাবস্থা নারীদিগের সীতা আদর্শস্বরূপ সেইরূপ মালবিকাও এক সময়ে ও এক অবস্থার নারীগণের আদর্শ এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এ স্থলে বর্ণিত হইল।

ধারিণী রাজার মহিষী। তিনি যতক্ষণ পারিলেন ততক্ষণ মালবিকার সহিত

রাজার বাহাতে, সাক্ষাৎ না হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন কিন্তু বিদূষকের ষড়যন্ত্রে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তিনি যখন দেখিলেন রাজার মন টলিবার নহে তখন তাঁহার মনে হইল পতিকে কষ্ট দেওয়ার অপেক্ষা নিজে কষ্ট পাওয়া ভাল। জঘন্যসভাবা ইরাবতীর অনু-রোধে মালবিকাকে কষ্ট দিলেন কিন্তু অল্প দিন পরেই স্বয়ং বিবাহে উদ্যোগী। বঙ্কিম বাবুর স্ব্যামুখীর সহিত ধারিণীর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

মালতী ভবভূতির কল্পনাশক্তির প্রথম অঙ্কুর। ভবভূতি তাঁহার চরিত্র অথবা তাঁহার প্রণয় বর্ণনায় অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এমন কিছুই নাই যাহাতে তিনি সীতা সাবিত্রী শকুন্তলার সহিত একত্রে স্থানপ্রাপ্ত হন। মালবিকার শ্রেণীর মধ্যে তিনিও এক জন। মালতী মাধবের মধ্যে আর একটি অদ্ভুত স্বভাবের স্ত্রীলোক আছেন। ইহার নাম কামন্দকী—ইহার সংসার কার্যচাতুর্য্য বুদ্ধিকৌশল শাস্ত্রজ্ঞান কর্তব্য কর্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা স্রজদর্গের প্রতি অহুরাগ মালতী ও মাধবের প্রতি মেহ অলৌকিক। ইহার সাহস পুরুষের ন্যায় মনের জোর পুরুষের ন্যায়। ইনি দুই জন মন্ত্রীর সহায়্যায়িনী বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে তাহাদের সমতুল্যা। দুইজনেই তাঁহাকে সম্মান করেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি সংসারে

বিরাগিনী বৃদ্ধমঠ আশ্রয় করিয়াছেন । মালবিকাগ্নিমিত্রের পণ্ডিত কোষিকী এবং মালতী মাধবের 'কামন্দকী কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে । পণ্ডিত কোষিকীও সংসার ত্যাগ করিয়া কাষায় ধারণ করিয়াছেন । তিনিও একজন অমাত্যের ভগিনী—তাহার মানসিক বল পুরুষের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি পুরুষের ন্যায় । রাজা ও ধার্মণী সর্বদা তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন । তিনি গণদাস ও হবদত্তের বিবাহে মধ্যস্থ । তিনি, যতদিন আপনাদিগের ছরবস্তা ছিল, কাহাকেও আপন পরিচয় দেন নাই । তাহার পর যখন শুনিলেন, তাহার জাতার শত্রুগণ পরাভূত হইয়াছে এবং তাহারই রাজকন্তা রাজ্যে প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন তখন আপন পরিচয় প্রদান কবিলেন । পণ্ডিত কোষিকী হিন্দু ও কামন্দকী বৌদ্ধ পণ্ডিত কোষিকীচরিত্র বিশুদ্ধ কামন্দকী তাহাতেও আবার কর্মকুশল । তিনি আপন কার্যে অমুমাত্র অনাস্থা করেন না এবং প্রাণপণে কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্নবতী । কোষিকী কেবল দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন । কামন্দকী সাহস সহকারে কাল কাপালিক অঘোরঘণ্টের সহিত বিবাদ করিয়া তাহার ছরভিসন্ধি নিফল করিলেন । কোষিকী দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া রাজবাটী আশ্রয় করিলেন সমভিব্যাহারিণী রাজকুমারীর কোনরূপ

উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন না । কিন্তু ইহারা দুইজনেই একশ্রেণীর জীলোকদিগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সে শ্রেণীর জীলোক এখন নাই ঋষিদিগের সময়েও ছিল না । বৌদ্ধেরা মঠ সংস্থাপন করিলে তাঁহাদিগের উৎপত্তি হয় । বৌদ্ধধর্ম ভারতভূমি হইতে তাড়িত হইয়া যখন চীন ও সিংহল আশ্রয় করিল তখন হিন্দুরাও মঠ করিতে শিখিয়াছেন এবং তথায়ও দুইএকটা ঐন্দ্রশী সংসারবিরাগিনী রমণী দেখা যাইত কিন্তু এক্ষণে মঠও বিরল পণ্ডিত কোষিকীও বিরল ।

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী—শৈব্যা যথার্থ পতিপ্রাণা ও রমণী কুলের বিভূষণ স্বরূপ । যখন বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাহে রাজার সর্বস্ব গেল তিনি দক্ষিণার জন্ত আত্মদেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত তখনও শৈব্যা তাহার সহায় । রাজা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন শৈব্যা উত্তর করিতেছেন, “অজ্ঞ উত্তো মকথু অন্তঃসর্বো হোহি । তা পদীদ মংজ্জব্ব ইমথিং কজ্জ আরোবেহি । অবচ্ছিমো দেদানিং পণয়ো ।” এই বলিয়া স্বামীর মুখ প্রতীক্ষা করিলেন হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুজল নির্গত হইল । শৈব্যা তখন বলিয়া উঠিলেন “কিনব কিনবমং অজ্জা পরপুঁরিস পজ্জু পাসনং পরচ্ছিঁটু ভোজ্জ অস্বাবিহরিয় সব্ব কস্ম কারিনীত্তি ।” যখন এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্রয় করিল তখন শৈব্যা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বলিলেন, “দিট্টিয়া অদ্দাবশিটু পডিনাভারো দানিং

অজ্ঞউত্তো কিদমস্মি।” আৰ্যাপুত্রের স্বপ্নের অর্ধেক প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন বলিয়া তাঁহার হর্ষ হইল। চিরকালের জ্ঞান যে দাসী হইলেন সেটী তাঁহার মনেও হইল না। কিন্তু ইহাতেও বিধাতার তৃপ্তি হইল না। শৈব্যার এক মাত্র সন্তানও কিছুদিনপরে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। শৈব্যা উদ্বন্ধনে দেহ-তাগের উদ্যোগ করিতেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন সে স্বর শ্রবণও বিদীর্ণ করিতে পারে। বিধাতা সদয় হইয়া তাঁহাকে স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিলেন।

পার্কী—ইনিই পূর্বজন্মে স্বামীর নিন্দা শ্রবণে আপনার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এজন্মেও সেই মহাদেবের প্রতি অমুরাগবতী হইয়াছেন। মহাদেব মনুষ্য নহেন দেবতা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তপস্তা আবশ্যক করে ও পূজা আবশ্যক করে। পার্কী প্রথমতঃ পূজা আরম্ভ করিলেন। নিত্যই মহাদেবকে স্বহস্তপ্রথিত পুষ্পমালা প্রদান করেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার পরিচর্যা করেন। পার্কী বিদ্যাবতী পিতার প্রিয়পাত্রী এবং রাজার কন্যা; বয়সও অল্প কিন্তু তখন হইতেই তাঁহার প্রণয় প্রগাঢ়। তাঁহার প্রণয় তারামৈত্রিক বা চক্ষুরাগ নহে উহার আবাসভূমি হৃদয়ে। একজন প্রধান সমালোচক বলিয়াছেন কালিদাসাদি কবিগণ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন বটে কিন্তু সে প্রণয় বাস্তবিকর ছায়

নহে; কালিদাসের প্রণয়ে ঐহিকতাই অধিক। কিন্তু যে কবি পার্কীতীর প্রণয় বর্ণনা করিয়াছেন তিনি যে বিপুল প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন না একরূপ বলা অসম্ভব। পার্কী মহাদেবের প্রণয়বতী; মহাদেব যোগী; তিনি অপব উপাসকের যেরূপ পরিচর্যা গ্রহণ কবেন, পার্কীতীর পূজাও সেইরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহার মন টলিবার নহে। তাঁহার চিত্তচাক্ষুশ্য বিধানের জন্য স্বয়ং কাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনও চঞ্চল হইল কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তিনি তখন সে ভাব নিগ্রহ করিয়া কোপ কটাক্ষে মদনকেই ভঙ্গসাং করিয়া ফেলিলেন। এবং ক্রীসন্নিকট পরিহারের জন্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্কী ভগ্নমনোরথ হইয়া আপন পিতার নিকট তপঃসমাধি কবিবার অমুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং ষোরতর তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি কঠিন শরীর ধ্বিগণ আধ্মা পরিশ্রম করিয়াও যেসকল নিয়ম পালন করিতে অক্ষম পার্কীতী সেই সকল নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। একদিন মহাদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণ বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে মহাদেবের বিস্তর নিন্দা করিলেন। যিনি একবার পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে একরূপ নিন্দা অসম্ভব। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছেন এমন সময়ে মহাদেব নিজদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে!!!

তখন কোপ প্রণয় বিশ্বয় প্রভৃতি নানা বৃত্তি যুগপৎ সমুদগত হইয়া তাঁহার যেক্ষণ চিন্তাবিকার জন্মাটকী দিল তাহা কালিদাস ভিন্ন আর কেইই বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন কি না সন্দেহ। সেক্ষণের মিরন্দা যেমন সরলস্বভাবা পার্শ্বতীও সেইরূপ। তিনিও মিরন্দার ন্যায় পিতাব নিকট আপন প্রণয় ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মিরন্দা সামাজিক অবস্থা জানে না পার্শ্বতী জানিয়াও ভাবিলেন বিগুহ প্রণয় প্রথ্যাপনে দোষ কি? তিনি বিদ্যাবতী গৃহকর্ম্য চতুরা, নানা বলি কর্ম্মে তাঁহার নিত্য আমোদ। তিনি আতিথ্যেয়ী। তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইবার নহে মন টলিবার নহে। মেনকা কত বুঝাইলেন, বলিলেন তোমার পিতা দেবতাদের দেশেব অধিপতি যদি দেবতা তোমার কামনা হয় বল। পার্শ্বতী মৌনভাবেই তাহাব উত্তর দিলেন। ব্রহ্মচাৰী জিজ্ঞাসা করিলেন মহাদেবেই কি তোমাব প্রণয়? পার্শ্বতী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার স্বাব দিলেন পিতার নিকট যখন বিবাহের কথা উঠিল তখন লীলাকমলপত্রের গণনায় তৎপর হইলেন। তিনি কুলোকেব সংসর্গ ভাল বাসেন না গুরুজনেব নিন্দা তাঁহার বিষ। সকল ভূতেই তাঁহার সমান দয়া। যে সকল গুণে রমণীর চরিত্র উৎকৃষ্ট হয় সে সকলই তাঁহাতে আছে। রমণীকুলের তিনিই গর্ভহেতুভূতা। তিনি যেখানে তপস্তা করিয়াছেন তাহা এখনও

তীর্থ। তাহাব নিকট সিত শ্রুশ্র ঋষি-গণও ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। তাঁহার চরিত্র তপস্বীদিগেরও উদাহরণস্থল। তাঁহার চরিত্র প্রনিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে বিশ্বয়মিশ্রিত অন্তর রসের আবির্ভাব হয়। কুমারসম্ভব গ্রন্থ হইতে আমরা তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত জানি। ইহার মধ্যে ঐহিকতার লেশ মাত্রও নাই। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মে ভক্তি দেবতায় ভক্তি মনু প্রভৃতি মুনিগণের বচনে আস্থা বিশেষতঃ তাঁহার সরলতা পিতৃভক্তি স্বামিভক্তি সখীগণের প্রতি ব্যবহার আশ্রমের উন্নতি চেষ্টা লৌকিক নারীগণেব মধ্যে অতি বিরল। নারীচরিত্র বিষয়ে কবিবা কতদূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন পার্শ্বতী চরিত্রে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গদর্শনকার স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন বাম্বীকির রামায়ণ হইতে আখ্যায়িকা লইয়া যে সকল কাব্য ও নাটক রচনা করা হইয়াছে তাহাতে রাম ও সীতাব চরিত্র উত্তমরূপে বর্ণিত হয় নাই। ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু কালিদাসের রাম ও সীতা বাম্বীকির রাম ও সীতা হইতে উৎকৃষ্ট না হউক তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই নূন নহে। বাম্বীকির ন্যায় কালিদাসও সীতার বালাকালের কোন কথাই লিখেন নাই। কালিদাস স্পষ্ট জানিতেন যে, বাম্বীকির সঙ্গে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে পরাভূত হইতে হইবে। এই জন্যই

তিনি অযোধ্যাকাণ্ড বনকাণ্ড কিঙ্কিকাণ্ড
কাণ্ড সুন্দরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড এক
সর্গের মধ্যে সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন।
ঐ সর্গও নীরস কিন্তু তাহার বিদ্যাব্রিত
গতি বর্ণনা উহার একটি আশ্চর্য্য শোভা
হইয়াছে। তিনি চতুর্দশে সীতাচরিত্র
বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর
মহাশয় এই সর্গ হইতে তাঁহার সীতার বন-
বাসের অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন।
যখন লক্ষণ বনমধ্যে রাজার ভয়ঙ্কর আ-
দেশ সীতাকে অবগত করাইলেন তখন
সীতা মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎ-
ক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনঃ স্তির
দুঃখভাগী আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে
লাগিলেন। লক্ষণ বিদায় হইবার জন্য
প্রণাম করিলে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া
কহিলেন, বৎস! তুমি সেই রাজাকে
বলিও “যদি অন্তঃস্বতা না হইতাম
তোমার সমক্ষে এই মুহূর্ত্তেই জাহ্নবীজলে
প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি
তাঁহাকে বলিও,

“সাহংতপঃ সূর্য্য নিবিষ্ট দৃষ্টি কর্দ্ধং প্রসূতে
শরিতুং যতিষ্যে
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেপি স্বমেব ভর্ত্তা-
নচ বিপ্রয়োগঃ।

তিনি আবার বলিলেন “তাঁহাকে
বিশেষ করিয়া বলিবে যদিও ভাষ্যাভাবে
আমায় পরিভাগ করিয়াছেন কিন্তু যেন
সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য হই। তিনি
সাগরীয়া পৃথিবীর ঈশ্বর। যেখানে বাই-
তাঁহার অধিকারের বহির্ভূত নহি।”

মহর্ষি বায়ীকি যখন তাঁহাকে আপন
আশ্রমে লইয়া রাখিলেন তখন তিনি
অতিথি সেবা নিরন্তর দ্বান্দ্বাদি ধর্ম্মকার্য্য
করিয়া সময়োচিত করিতে লাগিলেন।
তাঁহার যে নিদারুণ কষ্ট হইয়াছিল যখন
শুনিলেন আজিও রাম তাঁহা ভিন্ন আর
কাহাকেও জানেননা এবং তিনি হিরন্ময়ী
সীতা প্রতিকৃতি লইয়া যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন তাঁহার অনেক শমতা হইল।

একদিন রামচন্দ্র যজ্ঞ সমাপনান্তে
পৌরবর্গকে একত্রিত করিয়া সীতা পরী-
ক্ষাব কথা উত্থাপন করিলেন। সীতাও
আচমন করিয়া কহিলেন,
বান্ধনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো

যথা ন মে।

তথা বিশ্বস্তরে দেবি মামস্তর্দ্ধাকু মর্হসি ॥

ভগবতী বিশ্বস্তরা সীতার কথা শুনি-
লেন এবং তাঁহাকে লইয়া ভূগর্ভে অন্ত-
র্হিতা হইলেন। প্রধান কবিরা পুঙ্খানু-
পুঙ্খরূপে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়েন না।
কালিদাস সীতা চরিত্রের দুই একটি
অতি বিশুদ্ধ নির্ম্মল ও ভাব পূর্ণ অংশের
পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

সংস্কৃতে কাব্য ও নাটকের সংখ্যা
অনেক। সেই সমুদয় হইতে ক্রীচরিত্র
সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রন্থ বিস্তার হইয়া
পড়ে। সূতরাং অগত্যা নাগানন্দ রত্না-
বলী বাসবদত্তা প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি গ্রন্থের
নামোল্লেখমাত্র করিয়া সংস্কৃত কবিকুল-
চূড়ামণি কালিদাস ও ভবভূতির সর্ব্বস্ব-
ভূত অভিজ্ঞান শকুন্তল ও উত্তররাম

চরিত হইতে শকুন্তলা ও সীতাচরিত্র সং-
গ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইবে। এই দুইটী রম-
ণীর চরিত্র বর্ণন করিয়া আপন২ কল্পনা-
শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কবিয়াছেন।
এই দুইটী রমণীর অবস্থাগত অনেক
প্রভেদ। সীতার বিরহ, শকুন্তলাব পূর্ব-
রাগ, সীতা যুবতী, শকুন্তলা বালিকা।
সীতা রাজনন্দিনী, শকুন্তলা তপোবন
প্রতিপালিতা, কিন্তু উভয়েই প্রত্যাখ্যান
প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েই নানাবিধ মনঃ-
পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েই চরিত্র
জীচবিত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। দেবতা
ও ঋষিবা উভয়েই দুঃখেব সময়ে
সাহসনা কবিয়াছেন এবং স্বামীর সহিত
মিলন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা
পাইয়াছেন। উভয়েই অনেক কাল
বনে বাস করিয়াছেন। বনতরু বনলতা
বনময়ূর বনমৃগ উভয়েই প্রিয়পাত্র উভ-
য়েই হৃদয় সযল ও প্রণয়প্রগাঢ় বনবাস-
সখী দিগের সহিত উভয়েই সমান
সখ্যতাব। সীতা রাবণকর্তৃক পীড়িতা
হইয়া এক্ষণে পুনরায় বাজধানীতে প্রত্যা-
গত হইয়াছেন, বাজবাণী হইয়াছেন কিন্তু
তাঁহার মুগ্ধস্বভাব পূর্ববৎই আছে।
চিত্রদর্শন প্রস্তাবে তাঁহার সকলভাবই
ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বিবাহ সময়ে
সুখের চিত্র দেখিয়া হর্ষিত হইলেন।
শূর্ণনথাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত
হইল আর্ঘ্যপুত্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার
অশ্রুপাত হইল তপোবন দেখিয়া পুনর্বার
তথায় ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি

রামকে বলিলেন তোমাকেও আমার
সহিত যাইতে হইবে। রাম কহিলেন
অরি মুর্খে একথাও কি বলিতে হয়।
তিনি রামবাহু আশ্রয় করিয়া শয়ন
করিলেন কিন্তু তাঁহার কোমল অন্তঃকরণে
চিত্র দর্শন জনিত নানা উদ্বেগ এখনও
শান্ত হয় নাই। তিনি স্বপ্নে বলিয়া
উঠিলেন “আর্ঘ্য পুত্র এই তোমার সহিত
শেষ সাক্ষাৎ। রামচন্দ্র দেখান হইতে
চলিয়া গেলে নিদ্রা ভঙ্গানন্তর উঠিয়া
বলিলেন, “ভোদুর্কবিশ্ময়,” তাহার পরই
বলিলেন “যই অন্তনো পতবিশ্ময়” লক্ষণ
বথ আনয়ন করিলে আর্ঘ্যপুত্রের ভ্রূয়সী
প্রশংসা করিতে২ তাহাতে আরোহণ
করিলেন। যখন লক্ষণ প্রস্তরবৃষ্টির জ্বায
রাজসন্ধেশ অবগত করাইলেন তখন
সীতা অসহ্য শোকাবেগ সহ্য করিতে না
পারিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার
পুত্রদ্বয়কে পৃথী ও ভাগীরথী বাল্মীকির
আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন এবং তিনি
ভাগীরথীর সহিত পাতাল পুৰীতে বাস
করিতে লাগিলেন।

এক দিন ভাগীরথী ছল কবিয়া তম-
সার সহিত সীতাকে পঞ্চবটীর বনে পাঠা-
ইয়া দিলেন। যেখানে আর্ঘ্যপুত্রের
সহিত নানা সুখভোগ করিয়া ছিলেন
যেখানে “সরসী আরসী” ভে আর্ঘ্য-
পুত্রের সহিত আপন মুখাবলোকন করি-
তেন আবার সেই স্থানে। রামচন্দ্রও
‘কার্যোপলক্ষে পুনরায় পঞ্চবটী আসিয়া-
ছেন সজে কেহই নাই। সীতা রামের

গভীর স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাহার পর যখন জানিলেন সতাই তাঁহার আর্ঘ্য পুত্র পঞ্চবটী আসিয়াছেন তখন সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন এবং একতানমনে তাঁহারই কথা শুনিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন রামচন্দ্র তাঁহারই জ্ঞাত শোক করিতেছেন তখন বলিলেন অজ্ঞ উত্তমসরিসং কথু এদং ইমম্ব বৃত্তস্তম্ব। তাহার পর বলিলেন আর্ঘ্যপুত্র তুমি আজিও সেইই আছ। রামচন্দ্র মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে সীতা, পাছে তিনি স্পর্শ করিলে রামচন্দ্র কুপিত হন এই ভয়েই অস্থির হইলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন যা হবার হউক আমি উঁহাকে স্পর্শ করিব। যখন রামচন্দ্রকে বাসন্তী তিরস্কার করিতে লাগিলেন তখন তিনি কহিলেন “সখি তুমি ভালর জন্য বলিতেছ বটে কিন্তু দেখিতেছনাকি উঁহাতে বিষময় ফল ফলিতেছে।” সখি তুমি বিরত হও। তাঁহার প্রিয় হস্তী বিপদগ্রস্ত হইয়াছে শুনিয়া সীতার মন চঞ্চল হইল উঁহাকে দৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধ তাহার হর্ষ হইল এমন নহে তাঁহার কুশ ও লবকে মনে পড়িয়া গেল। রামচন্দ্র বিদ্বায় হইলে যতক্ষণ তাঁহার রথচক্র দেখা যাইতে লাগিল ততক্ষণ কাহার সাধ্য সেদিক্ হইতে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি অনাত্র নিক্ষেপ করে। তাহার পর নমো নমো অজ্ঞউত্তা চরণ কমলাণং নমো

অপূর্ব পুত্র জগিত দংশনানং বলিয়া কষ্টে স্থষ্টে বিনিবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় যখন সীতা সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন তাঁহার নয়ন স্বামীর চরণে অর্পিত। হৃদয়ে নানা উদ্বেগ। তাঁহার আকৃতিতে স্পষ্টই অনুভব হইতে লাগিল তিনি বিগুহ চরিত্র। রামচন্দ্র পৌরজানপদবর্ণের মত লইয়া পুনর্বার তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

সীতার চরিত্র। সীতা নিতান্ত স্নানী ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন। তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কাহারও দৃষ্টি-বিষয়ে বা ক্রটিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিগুহ চরিতে পতিপরায়ণতা গুণের একরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে বোধ হয় বিধাতা মানব জাতিকে পতিব্রতা ধর্ম্মে উপদেশ দিবার জন্যই সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্না কামিনী কোন কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পদ্মিনী কবিয়া তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন একরূপ বোধ হয় না।

শকুন্তলাও সীতার ত্রায় মুগ্ধবতাবা। মুনি তাঁহাকে বনমধ্যে কুড়াইয়া পান এবং সন্তানের ন্যায় তাঁহার প্রতিপালন করেন। তিনি অল্প বয়সেই গৃহ কার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছেন এবং লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন তপোবন তরুদণ্ডের পাটী করিতে তিনি বড় ভাল বাসেন। তাঁহার পিতা সোমতীর্থ গমন কালীন

বৃদ্ধা গৌতমীকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারই হস্তে অতিথিসেবার ভার দিয়া গিয়াছেন। তপোবনবাসী আবালবৃদ্ধ বণিতা তাঁহাকে ভাল বাসে। তাঁহার সখীদিগের তিনিই সর্কস্ব। তাহারা তাঁহার সেবা করিতেছে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে পুষ্পবৃক্ষের আলবাল পূরণ করিতেছে এবং তাঁহার ভাবিবিবাহ আশঙ্কায় কাঁদিতেছে। তাঁহার অদৃষ্টের জন্য তাঁহার অমুমাংস চিন্তা নাই তিনি একমনে রাজাকেই ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সখীদিগের ভাবনা তাঁহারই জন্য। তাঁহারা দুর্কাসার শাপ মোচন করিল তাঁহার আশঙ্কিত প্রত্যাখ্যান নিরাকরণের উপায় করিয়া দিল এবং কত যে দুঃখ প্রকাশ করিল তাহা বলা যায় না। শকুন্তলাও যাইবার সময় পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন সখীরাও আমার সমভিব্যাহারে চলুক। তিনি তাহাদিগকে আপনার ভাবিতেন, আপন মনের ভাব তাহাদিগকেই বলিতেন এবং তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিতেন। সরল হৃদয়া গৌতমীও তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি পিতৃ সেবায় তৎপর ছিলেন বলিয়া পিতাও তাঁহার জন্য কাতর। রাজার প্রথম দর্শনদিনাবধি শকুন্তলা তাঁহার জন্য ব্যাকুল। তিনি তপোবনবাসিনী, প্রণয় তপোবনবিরোধী ভাব; এবং তাঁহার পক্ষে অনুচিত ইহাও তিনি জানেন। তিনি নানা প্রকারে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা

পাইলেন কিন্তু তিনি সে বিদ্যা শিখেন নাই। যতই গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন ততই আরও প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে অপার চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিল তিনি ত্রিসমানা হইলেন। তাঁহার প্রিয় সখীরা তাঁহার জন্য রাজাকে জানাইতে উদ্যোগ করিল। রাজা তাঁহাকে গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিলেন এবং অতি সত্ত্বরই রাজধানী প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার শকুন্তলার প্রতি বাস্তবিক প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু অলৌকিক দৈব দুর্কিপাকে শকুন্তলা তাঁহার হৃদয়হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। শকুন্তলার কথা তাঁহার আর মনে রহিল না। কল্পমুনি শকুন্তলার গান্ধর্ব বিবাহে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এবং সত্ত্বর তাঁহাকে দুইজন শিষ্য ও সরলস্বভাবা গৌতমীর সহিত রাজবাটা প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা আসিবার কালীন আপন হরিণ শিশুটিকেও বিস্মৃত হইলেন না। সকলের নিকট বিদায় লইয়া অন্ততক্ষেণে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।

(বেদব্যাস সাক্ষী নারীদিগের যেরূপ সাহস বর্ণনা করিয়াছেন কালিদাসেরূপ পারেন নাই। তাঁহার সময়ে সেরূপ সাহস লোকে ভাল বাসিত না। শকুন্তলা মহাভারতে রাজার সহিত যে সকল কথা কহিয়াছিলেন কালিদাস ঠিক সেই সকল কহাইবার জন্য তাহার সহিত দুইজন লোক পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন।)

রাজা দুর্কাসার শাপে সমস্ত বিস্মৃত

হইয়াছেন। শকুন্তলা আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু তিনি চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং শকুন্তলার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন। শকুন্তলা যে সকল অভিজ্ঞানের কথা कहিলেন তাঁহার ন্যায় সরলস্বভাবার উপযুক্ত বটে। কিন্তু তাহাতে কি হইবে। তিনি রাজাকে হরিণশিশু স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের মিথঃ সংলাপ মনে করাইয়া দিলেন। কিছুতেই রাজার স্মরণ হইল না। তাহার পর শার্ঙ্গবর তিরস্কার করিয়া উঠিলে শকুন্তলা ভীতা হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; গোঁতমী তাঁহার হৃৎপে কাতরা হইলেন। সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ হইল তিনি পুরোহিতের গৃহে প্রসবকাল পর্য্যন্ত বাস করিবেন। তিনি পুরোহিত গৃহ গমন কালীন কেবল আপন ভাগ্যক্ষেই নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে স্ত্রী আকারধারী জ্যোতিঃ তাঁহাকে লইয়া তিরোভূত হইল। তিনি তাহার পর বহুকাল হিমালয়শৈলে কশ্যপ ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিলেন। তথায় প্রোষিতভর্ষুকাবেশে ধর্ম্ম কন্ম করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রবণ করিয়া এবং নিজ শিশুর লালনপালন করিয়া সময়োচিত করিতে লাগিলেন। দৈবাক্সগৃহে যখন রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজার শকুন্তলাবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে—শাপ মোচন হইয়াছে। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা

করিলেন। তখনও শকুন্তলা বলিলেন “নুনং মে স্মচরিতং পতিবন্ধ অং পূর্ক্ব কিদং তেহু দিয়সেহু পিণিণাম্ হুং আসী যেন সাহুক্কোশেবি অজ্জ উত্তো মহ বিবলোসংবৃত্তো।” রাজা যখন পুনরায় তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয়ক সংযোগ করিতে গেলেন তখন ভীক্সস্বভাবা শকুন্তলা कहিলেন “নসেবিস্মিসি” এবং যখন শুনিলেন শাপ প্রযুক্তই রাজা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না তাঁহার আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন “দিট্টিয়া অআবণ পচ্চদেসীন অজ্জউত্তো।” আর্ধ্যপুত্রের নির্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়ায় তাঁহার আনন্দ হইল। তাহার পর ঋষিদিগকে নমস্কার করিয়া আর্ধ্যপুত্র সমভিবাছারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

কালিদাসের শকুন্তলা ও পার্ক্ণতী এবং ভবভূতির সীতা বেদব্যাসের সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র পাঠ করিলেই প্রাচীনকালের স্ত্রীচরিত্রবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা কতদূর উন্নতিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যাইবে। এই সকল বমণীই নারীকুলের রত্ন। ইহার সকলেই চিরদিন ভারতবর্ষীয়দিগের দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া থাকিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন সীতা পতিপরায়ণতা গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী পার্ক্ণতী শকুন্তলা প্রভৃতি কামি-

নীরাও তাহাই করিয়াছেন। ইহাদের মানসিকবৃত্তি 'প্রায়' সকলেরই সমান। কেবল ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। দয়া দাক্ষিণ্য সৌন্দর্য্য প্রভৃতি যেসকল গুণ সকল সময়ে সকল জাতীয় মহুৎকার অলঙ্কার সেই গুণ ইহাদের সকলেরই অধিকপরিমাণে ছিল। যে প্রণয় মহুৎকারদের মহাই রত্ন ইহারা সেট প্রণয়ের আধার ভূমি। স্মৃতি শাস্ত্রকারেরা জীলোকের যেসকল কর্তব্য নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন কবিতা সে নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু জীলোকের তাঁহার। যে সকল গুণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন সেই সকল গুণ তাঁহার। স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করাইয়াছেন। কোন নারীরই প্রমাদ, উন্মাদ কোপ ঈর্ষ্যা বঞ্চন, অভিমান খলতা, হিংসা বিদ্বেষ অহঙ্কার ধূর্ততা ছিল না। সীতা একবার মনে করিলেন “ভদ্ কুবিন্দ” তাহার পর-ক্ষণেই বলিলেন “যদি অন্তনোপহবিন্দ” মাধু রমণীর ঈর্ষ্যা থাকে না। কাশী রাজহুঁহিতা তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। ধারিনী কোশল্যা চাক্রদত্তবনিতা ইহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। স্বামী ত্যাগ করিলেন বলিয়া সীতা বা শকুন্তলা কাহারও অভিমান হয় নাই। উভয়েই আপন ভাগোর নিন্দা করিতে লাগিলেন। যখন আবার স্বামী উপস্থিত হইলেন শকুন্তলা একেবারেই তাঁহাকে আপনার করিয়া লইলেন। সীতা পাছে স্বামী রাগ করেন এই ভয়েই ব্যাকুলা হইলেন। দক্ষ

প্রজাপতি বলিয়াছেন সাক্ষী রমণী পাইলে পৃথিবীই স্বর্গ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক সৌভাগ্য না থাকিলে সারিজী বা শকুন্তলার ন্যায় ভাৰ্য্যা লাভ হয় না।

উপসংহার ।

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি অত্যন্ত স্নেহপ্রবৃত্তির সহিত যথা পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতার প্রকাশ থাকিলেই নারীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest ideal হইবে। এবং আরো বলিয়াছি যে সামাজিক অবস্থা জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাব এই তিনটি প্রতি-দ্বন্দ্বী কারণবশতঃ কেহই ঈদৃশ উন্নত চরিত্রা রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার পর ঋষিদিগের পৌরানিক দিগের ও কবিদিগের সময়ে ভারতবর্ষীয় জীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। এই সমুদয় বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিলে বোধ হইবে বাস্তবিক প্রভৃতি কবিগণ আপন২ অদ্ভুত কল্পনাসক্তি বলে যেসকল রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন পুর্কোন্নিখিত সামাজিক অবস্থার তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র মনে ধারণা করাও যায় না। সেই সকল নারীগণের মধ্যে সীতা সারিজী পার্শ্বতী ও শকুন্তলা সর্বপ্রধান। শকুন্তলা স্নেহপ্রবৃত্তির মুষ্টিমতী প্রতিকৃতি। ইহার স্নেহপ্রবৃত্তি সর্বতোমুখী

সমুন্নতিলাভ করিয়াছে। শকুন্তলা ও পার্শ্ব-
তীর যেমন সর্বভূতে সমান স্নেহ একরূপ
বোধ হয় জগতের আর কত্য়পি দেখা
যায় না—কি পশু কি পক্ষী কি চক্রবাক
দম্পতী, কি মহুষা, কি সখী, কি স্বামী,
কি পুত্র সকলের প্রতি ইহাদের স্নেহ
যেন উৎলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু পার্শ্বতীর
অপেক্ষাও শকুন্তলার স্নেহপ্রবৃত্তি অধিক-
তর বলবতী—কালিদাস তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি
ও কর্মক্ষমতা উত্তেজিত করিতে তাদৃশ
বস্ত্র করেন নাই। তাঁহার হৃদয় স্বরূপ
নন্দনকাননে যত কিছু অমৃতময় ফল বা
পুষ্প ছিল সমুদয়ই শকুন্তলার অঙ্গশোভা
সম্পাদনের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। ভব-
ভূতির সীতা শকুন্তলার ছায়া মাত্র।
যদিও শকুন্তলার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতা
তাদৃশ প্রকাশ পায় নাই কিন্তু তাঁহার
কোমলতর বৃত্তিসকল এত স্নন্দররূপে
অঙ্কিত হইয়াছে যে আমরা পূর্বেই
অভাবহয় অনুভবই করিতে পারি না।
তাঁহার সরলতা-মিশ্রিত-সহিষ্ণুতাই আমা-
দের হৃদয়ে আনন্দ সমুৎপাদন করে।

সীতার বুদ্ধিবৃত্তি ও স্নেহপ্রবৃত্তি দুই
টাই বলবতী, তাঁহার কর্মক্ষমতা তাদৃশ
প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার সহিষ্ণুতা
আমাদিগের মমোরঞ্জন করে। কিন্তু
তাঁহার পতিপরায়ণতা সকলের অপেক্ষাই
অধিক। সীতা যে আমাদের দেশে
আবলবুদ্ধিবৃত্তি সকলের প্রিয়পাত্রী
তাঁহার কারণ কেবল তাঁহার সরলতা,
এবং তাঁহার স্বভাবের গুণ। তিনি

নির্দোষী হইয়াও এবং সর্বগুণসম্পন্ন
হইয়াও নানাবিধ কষ্টভোগ করিয়াছেন
এই জন্যই তাঁহার চরিত্র পাঠে আমাদের
সহানুভূতি উদ্ভিক্ত হয়।

সাধিত্রীচরিত্রে বৃত্তিভয়েরই উচিত যত
সমুন্নতি দেখা যায়। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যেমন
স্নেহ প্রবৃত্তি এবং কর্মক্ষমতাও তেমনি:
কিন্তু স্নেহপ্রবৃত্তির যেরূপ প্রাধান্য থাকে
আবশ্যক, তাঁহার চরিত্রে তাহা নাই।
আমরা পূর্বেই তাঁহার চরিত্র সমালোচনা
করিয়াছি।

পার্শ্বতীরে স্নেহপ্রবৃত্তিই প্রধান।
মহাদেব তাঁহার অবিচলিত প্রণয়ের
অধিকারী। হিমালয় ও মেনকা ভক্তির
অধিকারী। আশ্রয় বৃক্ষ যুগ রথান্দম্পতী
—জয়া বিজয়া এমন কি স্থাবর জঙ্গমা-
শ্রক সমস্ত জগৎই তাঁহার স্নেহের অধি-
কারী। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি-
বার পাত্র নহেন। তাঁহার ন্যায় অবস্থায়
শকুন্তলা, অনশ্রুয়া ও প্রিয়মদার মুখ
চাহিয়া থাকিতেন। কিন্তু পার্শ্বতীর অমনি
বুদ্ধি স্থির করিলেন যে তপস্যা করিবেন,
এবং কালবিলম্ব না করিয়া কঠোর তপ-
স্ত্রায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি
ও কর্মক্ষমতা বিলক্ষণ তেজস্বিনী।
প্রায়ই দেখা যায় আর্ষ গ্রন্থাবলী হইতে
প্রবন্ধ লইয়া কাব্য রচনা করা হইলে
ক্ট্রীচরিত্র বর্ণনা মন্দ হইয়া পড়ে কিন্তু
আশ্চর্যের বিষয় এই যে কালিদাস বরং
পার্শ্বতীরে বর্ণনা করিয়া উহার অধিক-
তর মৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

পার্বতীর চরিত্র পাঠে আমাদের যেরূপ বিষয়মিশ্রিত অকৃত সসের+ আবির্ভাব হয় সংকৃত কবিদিগের আর কোন নারী চরিত্র পাঠে তাদৃশ হয় না ।

এই চারিজন রমণীই আৰ্য্য কবিগণের কল্পনাবৃক্ষের অন্ততম ফল । ইহাদের চরিত্রগত যদিও কিছু ইতর বিশেষ দেখা যায় তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি নাই । আৰ্য্য কবিকল্পিত নারীচরিত্রের ইহারাই প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest ideal । ইহাদের চরিত্র পাঠে যে কেবল কাব্য পাঠজনিত আনন্দ লাভ মাত্র এরূপ নহে—উহাতে হৃদয়ের প্রশস্ততা হয়, ধর্মে মতি হয়, হৃৎথের সময় সহিষ্ণুতা জন্মে এবং নানা সময়ে নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয় ।

প্রাচীন কালের নারীদিগের চরিত্র বর্ণনা শেষ হইল । স্মৃতিকারেয়া যেরূপ জীচরিত্রের চিত্র দিয়াছেন তাহার অপেক্ষা সুন্দর চিত্র জগন্মধ্যে পাওয়া সুকঠিন । কোন দেশীয় স্মৃতিকারেয়াই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চরিত্র লিখিতে পারেন ও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নিয়মাবলী প্রচার করিতে পারেন এরূপ বোধ হয় না । স্মৃতিকারেয়া যাহাই করুন কবিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ভাণ্ডারে সেরূপ নারীচরিত্র অতি বিরল । আমরা হয় ত দময়ন্তী শকুন্তলা হৃৎকটি পাইতে পারি কিন্তু সীতা পার্শ্বতী ও সাবিত্রী মিলিয়া উঠা ভার । বোধ হয়

† Sublimity.

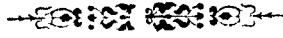
বান্মীকি ও বেদব্যাস ভিন্ন আর কোন দেশীয় কোন কবিই এরূপ বর্ণনা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন না ।

যখন আমরা কল্পনারাচ্য ত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই তখনও আমরা এতদেশীয় রমণীগণের সময়েই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিতে পাই । আমরা দেখিতে পাই হৃৎকজন রমণী পণ্ডিত মণ্ডলীর রত্ন স্বরূপ । হৃৎকজন সংগ্রাম কার্য্যেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন । এবং হৃৎ চারিজন রাজনীতিতে সম্যক দক্ষ ছিলেন । কণাটী রাজমহিষী, বিশ্বদেবী লক্ষ্মীদেবী থনা, লীলাবতী, প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত । দুর্গাবতী লক্ষ্মীবাই বশোবন্ত বায়ের বমণী—স্বয়ং যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । তারাবাই অহল্যা বাই সাবিত্রীবাই তুলসীবাই অনেক দিবস ধরিয়া মহারাজ্যীয় রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে অহল্যা বাই সর্বগুণবিভূষিতা ছিলেন । তাঁহার দয়া দানশক্তি রাজনীতিচাতুর্য্য ভারতবর্ষের ইতিহাস মাজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে । আমাদের দেশে রাণী ভবানীও বিখ্যাত রমণীগণের মধ্যে এক জন । এবং এখনও আমরা সর্বদা সংবাদ পত্রে নানা গুণবতী বমণীর নাম শুনিতে পাই ।

মধ্যকালে ভারতবর্ষের যেরূপ ছরবস্থা ইহা ছিল তাহাতে জীলোকদিগের সামাজিক অবস্থাগত অনেক ক্ষতি হইয়াছিল । এক্ষণে সেই ক্ষতি পূরণের জন্য নানা

বিধ চেষ্টা হইতেছে। বোধ হয় এক শতাব্দী মধ্যে আমরাও আমাদের দেশে আরো অনেক উৎকৃষ্ট চরিত্রা নারীর নাম শুনিতে পাইব। জীলোক যদি পুরুষের সহিত মিলিয়া দেশের উন্নতি প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত হয় তাহা হইলে অনেক উপকাব হয়। মহাত্মা মিল বলিয়াছেন তিনি পলিটিকাল ইকোনমি প্রণয়নের সময় তাঁহাব স্ত্রী নিকট অনেক সাহায্য

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরাও ভবমা করি অতি অল্প দিনের মধ্যে আমাদের দেশেও অনেক ওরুণ গুণবতী দেখিতে পাইব। সমাজের জী অর্দ্ধেক ও পুরুষ অর্দ্ধেক। যদি অর্দ্ধেক অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে তবে অপর অর্দ্ধেকের দ্বারা সমাজের সমস্ত হিতসাধন হইবে একরূপ কামনা কখনই করিতে পাবা যায় না।



নীতি কুসুমাজলি।

৫৫

সতের সংসর্গে প্রায় অসত দুর্জন।
পবিত্র কবে দুষ্ট স্বভাব আপন ॥
দেখহ প্রথবতব দিনকব কব।
অমৃত ধারায় ক্ষবে প্রাপ্তে নিশাকব ॥

৫৬

কালক্রমে পরিণামে সব ভাবাস্তব।
পূর্বতন বুদ্ধি প্রতি জন্মে অনাদব ॥
পূর্বে বাবিরে যেই ছিল জলকণা।
শুভিগন্তে মুক্তা হলো, বংশেতে বোচনা ॥

৫৭

ঋণ-শেষ অগ্নি শেষ, আর রোগশেষ।
বিচক্ষণ গণ কভু না বাথেন লেশ ॥
থাকিলেই পুনর্ব্বার সংবদ্ধিত হয়।
অতএব শেষরাখা সমুচিত নয় ॥

৫৮

পর পরিবাদ, পরদ্রব্য, পরদার।
গুরু স্থানে পরিহাস কর পরিহার ॥

৫৯

যার বশে থাকে দাবা, সূত্র, ভ্রতাবর্গ।
অভাবে সম্ভাব্যতাব ধরাইলে স্বর্গ ॥

৬০

এক পদে রাখি ভব, অল্প পদে অগ্রসর,
করেন যাঁহারা বুদ্ধিমান।
যদবধি পরস্থান, নাহি ত্য দৃশ্যমান,
পরিত্যজ্য নহে পূর্বস্থান ॥

৬১

দানকর্তা দাতাগণ ভূতলে বিরল।
যবে ঘরে পূর্ণ কিন্তু ভিখারীর দল ॥
চিন্তামণি আছে কি না বিবাদ বিষয়।
পথে পথে ধূলার ত সংখ্যা নাহি হয়।

৬২

জাতি যায় রসাতল, গুণগণ সুবিমল,
একেবারে অধোগত হয়।
চূর্ণ শৈলতটে পড়ি, শীল যায় গড়াগড়ি,
হতাশনে দগ্ধ বজ্রচয় ॥

শূরত্ব বীরত্ব যত, বৈরিকৃত সব হত,
আশু প্রগতিত বজ্রানলে।
একা ধনাভাব জন্য, তৃণসম হৃষ গণা,
সব গুণ বিগত বিফলে ॥

৬৩

বিষ-দন্ত ভগ্ন হেতু নাহি তেজ মাত্র।
সাপুড়ের সাপুড়ীতে স্থপীড়িত গাত্র ॥
ক্ষুধায় মলিন তাহে ইন্দ্রিয় নিকব।
জীবিতে মৃতের প্রায় ছিল বিষধব ॥
হেন কালে দেখ দেখি কি দৈবের গতি।
রজনীতে এলো তথা ইন্দ্রুব দুর্গতি ॥
ক্ষুধানলে প্রজলিত তাহার শরীর।
সাপুড়ীতে আছে খাদ্য ইহা করি স্থির ॥
কাটুব কুটুর রবে গর্ত কাটি তলে।
একেবারে প্রবেশিল ফণীব কবলে ॥
আহার পাইল ফণী প্রাপ্ত হলো পথ।
একেবারে সিদ্ধ তাব দুই মনোবথ।
অতএব শুন ভাই কথা সাবধানে।
শুভাশুভ সকলই বিধির বিধানে ॥

৬৪

কন্দুকে* আচ্ছাড়ি মাঝ ভূমিব উপবে।
তখনি লাফায়ে সেই উঠিবে অধবে ॥
সেকূপ জানিবে যত মহতেব ধাবা।
বিপদে পড়িবামাত্র সমুখিত তাঁবা ॥

৬৫

কন্দুকের প্রায় সব মহৎ দীমান্ !
যেমন গতন-প্রাপ্ত, অমনি উত্থান ॥
মাটিতে মিশায় মাটি, ঢেলা যদি পাড়।
ইতব বিপদে পড়ি নাহি নড়ে চড়ে ॥

৬৬

বিস্তবেতে মহতের মানস কমল।
উৎপলের অমুরূপ বিহিত কোমল ॥
আপদ সময়ে কিন্তু সেই তামরস।
মহাশৈল-শিলা সম ধিবম কর্কশ ॥

৬৭

পূর্ক হৃদয় রূপাধান, উদকেরে দিল স্থান,
দুই তনু এক তনু তায় !
তাপে তপ্ত দেখি ক্ষীরে, সহ নাহি হয় নীবে
অনল প্রবেশে দ্রুত ধায় ॥
দেখি নীরে ক্ষিপ্ত-প্রায়, হৃদয় নাহি ছাড়ে তায়,
উভয়েতে প্রবেশে অনলে।
এইরূপ সদাচার, যদি হয় সুসঞ্চাব,
সেই ত মিত্রতা ভূমণ্ডলে ॥

৬৮

একটুকু পচা নাড়ী বশাতে মলিন।
কিন্ধা একখানি অস্থি মজ্জা মাংস হীন ॥
প্রাপ্ত হয়ে কুক্কবেব পরিতোষ কত।
ফলে তাব ক্ষুধার সুধার নহে গত ॥
কিন্তু দেখ কেশবী বরীতি ভিন্ন মত।
যদ্যপি জম্বুক তার হয় অঙ্গগত ॥
কুঞ্জরে দেখিবামাত্র তাবে পরিহরি।
কুন্ত বিদারিয়ে রক্তধাবা পিয়ে হরি ॥
অতএব স্বীয় সন্ত অমুরূপ ফল।
কষ্টমুহুর্তে অবৈষিয়া লয় জীবদল ॥

৬৯

মৃগ মীন আর সাধু সজ্জন নিকরে।
তৃণ, জল, সন্তোষেতে, জীবিকা নির্ভরে ॥
নিষাদ, ধীবর, আর পিশুন দুর্জ্জন।
অকাবণে ইহাদেব বৈব-পরায়ণ ॥

* বজ্র বা চর্ম্মাদি নির্ম্মিত গোলা (Bull)

৭০

সস্তাপে বিকৃত বারি প্রথর অনলে ।
মুক্তাকারে শোভা পায় নলিনীর দলে ॥
সাগরের স্তুতি মধ্যে পতনে তাহার ।
অপরূপ মুক্তারূপ ফল অবতার ॥
কেবল সংসর্গগুণে জানিবে নিশ্চয় ।
অধম মধ্যমোত্তম গুণজাত হয় ॥

৭১

নীরবে থাকিলে পরে বোবা কহে তায় ।
বাচাল বাতুল বলে বাক্ পটুতায় ॥
ক্ষমাগুণ যদি থাকে ভীক নাম হয় ।
সহ গুণ না থাকিলে ছোট লোক কয় ॥
ধৃষ্ট থ্যাতি যদ্যপি নিকটে সদা রয় ।

অন্তবে থাকিলে পরে জড় স্ননিশ্চয় ॥
অতএব সেবা ধর্ম পরম দুর্গম ।
যোগীরাও না জানেন তাহাব মরম ॥

৭২

লোভ যদি হৃদয়স্থ গুণে কিবা হয় ।
ক্রবতা থাকিলে সেই পাতক নিশ্চয় ॥
সত্য যদি থাকে তপে কিবা প্রয়োজন ।
শুচিমনে কিবা কাজ তীর্থ পর্য্যটন ॥

৭৩

ভজ এক দেব বিষু, কিম্বা পশুপতি ।
মিত্রতা ভূপতি কিম্বা যতির সংহতি ॥
হয় বাস নগরেতে, কিম্বা বাস বনে ।
বিবাহ স্নন্দরী সনে, কিম্বা দরী* সনে ॥

৭৪

তুষা ত্যজ, ভজ ক্ষমা, মদ পরিহর ।
পাপে রতি ছাড়, সত্যকথা সার কর ॥

* পর্তের গুহা।

সাধুর চরণচিহ্নে করহ পয়ান ।
সেব অপরিতগণে, মান্যে দেহ মান ॥
বিদেষীকে বশীভূত কর অহুনেয় ।
স্বমুখে করোনা বাক্ত নিজ গুণচয়ে ॥
হুংখিতেবে দয়া কর কীর্তির পালন ।
এই সব সূজন গণের আচরণ ॥

৭৫

বুদ্ধির জড়তা হরে, সত্যে দেয় মতি ।
সম্মানে-উন্নতি করে কলুষে বিরতি ॥
হৃদয় প্রসন্ন করে কীর্তির সঞ্চয় ।
সাধুসঙ্গে মাহুষের কি না লাভ হয় ॥

৭৬

মূকরে বিদ্বিত মুখ যথা ধৃত নয় ।
অনায়ত্ত সেইরূপ কুনারী হৃদয় ॥
পর্তের স্তম্ভ পথ যেকূপ বিষম ।
সেইরূপ হয় তার ভাব স্তম্ভগম ॥
চিন্তাটা তরল যেন পদ্মপত্র জল ।
যারে হেরি বিদ্বানেরো মানস বিকল ॥
কুনারী নতিকারূপ গরল-অঙ্কুর ।
দোষকূপ গন্ধে তার শ্রীবৃদ্ধি প্রচুর ।

৭৭

স্বার্থ পরিত্যাগ করি পবার্থ যোজন ।
বাহার দ্বারায় হয়, সাধু সেই জন ॥
আত্মলাভ প্রতিকূলে পরার্থে যোজন ।
সচেষ্ট যে নহে, সেই সামান্য গণনা ॥
স্বার্থ হেতু পরহিতে বিষকারী যেই ।
মাহুষ রাক্ষস দুই নরাদম সেই ॥
নিরর্থক পরহিতে যে জন সংহারে ।
মে মে কি পদার্থ আমি না জানি তাহারে ॥

৭৮

দোষগুণ সব কার্যে আছে বিদ্যমান ।
পরিণাম চিন্তি কার্য করেন ধীমান ॥
সম্পদে সহজে কৃতকার্য বহুতর ।
বিপদে হৃদয় দহে শেলের শোষর ॥

৭৯

বনে, রণে, শত্রুমাঝে, সলিলে অনলে ।
মহার্ণবে কিম্বা গিরি-মস্তক-মণ্ডলে ॥
প্রস্তুত প্রমত্ত তথা বিষম বিপদে ।
পূর্বকৃত পুণ্য রক্ষা করে পদে পদে ॥*

৮০

পূর্ব পুণ্যবল যার আচয়ে যথেষ্ট ।
তার পক্ষে ভীমবন হয় পুরশ্রেষ্ঠ ॥
হুর্জন সৃজন হয় যাহার সদন ।
নিধি রত্ন পূর্ণ ধরা সদা সর্বক্ষণ ॥

৮১

বরং ঘোর বনে ভ্রম বনচর সহ ।
সুরেন্দ্রভবনে মূর্থ সংসর্গ দুঃসহ ॥

৮২

ধনের তৃতয় গতি দান, ভোগ, নাশ ।
দান ভোগ হীন প্রাপ্ত তৃতীয় নির্যাস ॥

৮৩

ধন যার আছে স্কুলীন সেই নর ।
সেই বক্তা, সেই মনোহর রূপধর ॥
সেই স্থপতিত শ্রুতবান্ গুণালয় ।
স্বর্ণেতেই সব গুণ করয়ে আশ্রয় ॥

৮৪

ঈর্ষা, ঘৃণা, অসন্তুষ্টি, নিত্যা ভীত, রাগী ।
পরভাগ্য জীবী, এই ছয় দুঃখ ভাগী ॥

* এই নীতি সঙ্কলনকারীর অমুমোদ-
নীয় নহে ।

৮৫

যজ্ঞে, পরিণয়ে, রিপুক্ষেয়ে, কি বাসনে ।
যশস্কর কল্মষ আর মিত্র সংগ্রহণে ॥
প্রাণ প্রিয়া নারী তথা বাক্য কারণ ।
এই অষ্টে অতিব্যয় নাহি কদাচন ॥

৮৬

সর্বস্থ নাশে তৃষ্ণা, রূপ নাশে জরা ।
খলসেবা পুরুষের অভিমান হরা ॥
ভিক্ষায় গোরব, আত্মস্তুতিরিত্য গুণ ।
চিন্তা অরে বল, অদয়্য লক্ষ্মী, নূন ॥

৮৭

অহুদ্যোগী পুরুষের যশ হয় ক্ষয় ।
মৈত্রী কোথা যেখানেতে এক ভাব নয় ॥
ধনলুকে ধর্ম্যনাশ, কুকর্ম্মীর কুল ।
বাসনীর বিদ্যা ফল বাসনে নির্মূল ॥
রূপণ বিনষ্ট যদি করে ব্যবহাব ।
মাতাল মস্তুরী দোষে রাজ্য ছার খার ॥

৮৮

জলনিধি আবরণ হন ধরণীর ।
আবাসের আবরণ হয় ত প্রাচীর ॥
রাজা ভিন্ন দেশের কি আবরণ আব ।
সুচরিত্র আবরণ হয় ললনার ॥

৮৯

হস্তের প্রতিষ্ঠা যদি দানধর্ম্মে রত ।
মস্তকের শ্লাঘা যদি গুরুপদে নত ॥
মুখের প্রশংসা সত্যবাণী সুনিশ্চয় ।
ভুজের প্রতিষ্ঠা বীর্য্যবিভাত বিজয় ॥
হৃদয়ের শ্লাঘা ইচ্ছামত আচরণ ।
শ্রুতির গোরব সদা শ্রুতির শ্রবণ ॥
প্রকৃতি-মহৎ ঘাঁরা, সেই সব নরে ।
ধন বিনা এসকল ভূষা শোভা করে ॥

৯০

আমাতে তোমাতে অন্যো একই ঈশ্বর।
তবে বল মম প্রতি কেন ক্রোধ কর ॥
একেবারে পরিচাব কবি ভেদজ্ঞান।
সকলেই দেখ ভাই আপন সমান ॥

৯১

নূতন বসন, নূতন ভবন,
নবছত্র নবনাবী রতন।
সর্বত্র নূতন, হয় সুশোভন,
সেবকার পুণ্যতন ॥

৯২

কড় ভূমিশয়া, কড় পালঙ্কে শয়ন।
কড় শাকাহাব, কড় পরান্ন-ভোজন ॥
কড় ছেঁড়া কাঁথা, কড় বিনোদ বসন।
ইথে সুখ দুঃখ জ্ঞানী না করে গণন ॥

৯৩

তিন লোক দান করি, অচনা করিয়া হরি,
বনি গেল পাণ্ডা ভবন।
ছাত্তু শবা করি দান, কোন এক তপস্বান,
স্বর্গপুরে কবিল গমন ॥
আবালা অবধি যাব, কত কত হৈল জাব,
সে কুন্তীর স্বর্গেতে বসতি।
আহা পতিপ্রাণা সতী, শীতল পাণ্ডালে গতি,
মরি কি ধর্মের স্মরণ গতি ॥

৯৪

কানীন আপনি মুনি, পুন পুণ্যেতে শুনি,
ভ্রাতৃবধু বিধবাবরণ।
গোলক নন্দনগণ, তাঁর নাতি পাঁচজন,
কুণ্ডলি আছে বিঘোষণ ॥

সে পাণ্ডব অব্যাহত, এক রমণীতে রত,
পুণ্যবলে নাহি কিছু ক্ষতি।
তাহাদের গুণগ্রাম, গরিব লোক অবিদ্রাম,
মরি কি ধর্মের স্মরণ গতি ॥

৯৫

আহারেতে শুদ্ধাচার, বচন সূধার ধার,
গৃহাভাবে পরধরে বয়।
মমতা বিহীন মন, বনে বস আলাপন,
বাচালতা বসন্ত সময় ॥
এতগুণ সেই ধরে, তাজি হেন পিকবরে,
কি কারণ ভক্তি ভাবে অতি।
খঞ্জরীট কুমিভুজে, মানব মণ্ডলী পুজে,
মরি কি ধর্মের স্মরণ গতি ॥

৯৬

কপোতিনী সকাতে কান্তপ্রতি কর।
আজি নাথ অন্তকাল হইল উদয় ॥
ধনু শর কবে ব্যাধ ভ্রমে অধোভাগে।
উপরেতে শ্যেন পক্ষী কিবে তাগে তাগে ॥
হেনকালে বাধেরে দংশিল বিষধব।
শ্যোনেরে আহত করে নিষাদেব শর ॥
উভয়ে তখন গেল যমের বসতি।
দেখ দেবি অষ্টেব কি বিচিত্র গতি ॥

৯৭

পারীজ্যের পরাজয়ে, সুবতীর মাংস লয়ে,
বাড়াইল কুকুরের কায়।
দিলাম শাল্য দধি, পায়সান্ন নিরবধি,
ফুলিয়া উঠিল তরু তায় ॥
কিস্ত সিংহ বব শুনি, অতি ভয়াতুর শুনী,
গভীর গুহায় পলাইল।
হায় একি সর্বনাশ, হত বত অভিলাষ,
লাভ মাত্র গোবধ হইল ॥

৯৮	৯৯
চন্দন চম্পক বস, -হুসাল হুসাল গণ, কাটি কাটা করিয়া রক্ষণ। হিংসি হংস শিখাবল, কোকিল কোকিলা দল, কাকলয়ে ক্রীড়া আকুণ্ণন ॥ করি করি বিমিলয়, গর্জিত ক্রমিত হন, কার্পাস কপূরে এক দাম। ঔষিগন্ধে এ প্রকার, যথা তর অকিচর, সে দেশের পায়েরে প্রণাম ॥	পুরোভাগে রেবা পার, স্খোভিতেছে পরে তার হুরারোহ পর্কত-শিখর। পশ্চাতে সর্বর বর, ধুশুর যুক্তকর, ধাইতেছে অতি ক্রততর ॥ দক্ষিণেতে সর্বোবর, বামে দহে ভয়ঙ্কর, দাবাদাহ তাহে তপ্তকায়। পলাইয়া যেতে নারে, থাকিতেও নাহি পাবে, মৃগশিশু কঁদে হায হায ॥ ইতি দ্বিতীয় অঞ্জলি।
† কইক বৃক্ষ বিশেষ।	

বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ।

চাবি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ
আবস্ত হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত
হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ
উদ্দেশ্য ছিল। পত্রসূচনায় কতকগুলি
বাক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত
ছিল। যাহা বাক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা
অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই
সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন
রাখিবার প্রয়োজন নাই।

যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন
সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাম-
য়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ
সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব
পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়া-
ছিল, এক্ষণে বাক্তব, আর্গাদর্শন প্রভৃতির
দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব

বঙ্গদর্শন রাখিবার আব প্রয়োজন নাই।
আমাব অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই
ভার গ্রহণ কবিয়াছেন দেখিয়া, আমি
অত্যন্ত আনন্দিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্ম
আমি যে শ্রম স্বীকার কবিয়া ছলাম, তাহা
সার্থক বিবেচনা করি। তাঁহাদিগকে
ধন্যবাদ পূর্বক, আমি বিদায় গ্রহণ
করিতেছি।

এ সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ, কেহ ক্ষুব্ধ
হইতে পারেন। কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন
এ কথা বলায় আত্মপ্রাণের বিষয় কিছুই
নাই। কেন না এমত ব্যক্তি বা এমন
বস্তু জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না
কেহ অমুরক্ত নহেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শ-
নের এমত বন্ধ থাকেন, যে বঙ্গদর্শনের
লোপ তাহার কষ্টদায়ক হইবে, তাহার

প্রতি আমার এই নিবেদন যে যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমনতর সঙ্কল্প করি নাই, যে যতদিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রত-বিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন, তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী; এই অল্পকাল মধ্যে সকলকেই অনেক গুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়; এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহসংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপাব আছে বটে, যে তাহাতে এই জীবন মৃত্যু কাল পর্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপাব নহে, এবং আমিও তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য পাত্র নহি।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন, তাঁহাদের প্রতিই আমার এই নিবেদন। আব যাঁহারা ইহাতে আফ্লাদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সম্বাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জীবিত হইবে না এমন অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনর্জীবিত করিব ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গদর্শন সম্পাদন কালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গদর্শনেব প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি এক দিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এত দিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ। এ বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং সন ১২৮২ শালের বঙ্গদর্শন পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা দেখি নাই। ইহার জন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

তৎপরে, যেসকল কৃতবিদ্যা স্নলেখক দিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদর-নীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* প্রভৃ-

* বাহুল্য ভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল না। বিশেষ আমার ভ্রাতৃঘর, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অথবা ভ্রাতৃবৎ বন্ধু বাবু জগদীশ নাথ রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বাগাড়ম্বর মাত্র। বাবু

তির নিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ, এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ বান্ধিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প প্রাণের বিষয় নহে।

আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগী—তঁাহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তঁাহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তঁাহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধু জন্ম কাদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুখেরক—আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই এমনও আর কিছু বলিলাম না।

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আমার শতং ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটা স্পর্ধার কথা আছে। উচ্চ শ্রেণীর দেশী সম্বাদপত্র মাঝেই বঙ্গদর্শনের অনুরূপ ছিলেন, অধিকতর স্পর্ধার কথা এই যে নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপত্র মাঝেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের বড়

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

থবর রাপেন না; কিন্তু এক্ষণে গতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান অবজবর বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবজবর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট বেক্রপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবজবর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরেচ্ছায় বহুকাল তদ্রূপ মঙ্গল সাধন করিবেন; তঁাহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তঁাহার মতভেদ থাকাতোও তিনি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তঁাহার উদারতার সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা, এবং বল, আমি কেবল অবজবর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি এমনত নহে। দেশী সম্বাদ পত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত, এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সন্ধিদান্ এবং যথার্থবাদী ভারতসংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট, ও তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বশ্যবধ অনুকূল্যে জ্ঞা, আমি শতং ধন্যবাদ করি।

চারি বৎসব হইল বঙ্গদর্শনের পত্রস্থচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদু বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদু জলে গিয়াইল।

শ্রীবন্বিসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।